কেউ কেউ কথা রাখে
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন-এর জন্ম ঢাকায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইন্সটিটিউটে এক বছর পড়াশোনা করলেও পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন।

বিশ্বমানের অসংখ্য জনপ্রিয় থ্রিলার অনুবাদ করার পর অবশেষে তার পর পর আটটি মৌলিক থ্রিলার নেমেসিস, কন্ট্রাক্ট, নেক্সাস, কনফেশন, করাচি, জাল, ১৯৫২ এবং রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও খেতে আসেন নি প্রকাশিত হলে বিপুল পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে। সেই অনুপ্রেরণা থেকে বর্তমানে তিনি বেশ কয়েকটি মৌলিক থ্রিলার লেখার কাজ করে যাচ্ছেন।

তার পরবর্তী থ্রিলার উপন্যাস *নেক্সট*, কজিতো, পেন্ডুলাম, *দেওয়াল*, *পহেলা বৈশাখ*, *এলিভেটর*, *গুমি সানডে* এবং *ম্যাজিশিয়ান* প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে।

পরবর্তী ফ্ল্যাপে দেখুন...

সাড়া জাগানো উপন্যাস দ্য দা ভিঞ্চি কোড, লস্ট সিম্বল, গডফাদার, বর্ন আইডেন্টিটি, বর্ন আলটিমেটাম, দ্য ডে অব দি জ্যাকেল, দ্য সাইলেন্স অব দি ল্যাম্বস্, রেড ড্রাগন, ডিসেপশন পয়েন্ট, আইকন, মোনালিসা, পেলিকান বৃফ, এ্যাবসলিউট পাওয়ার, ওডেসা ফাইল, ডগস অব ওয়ার, অ্যাভেঞ্জার, দান্তে ক্লাব, দ্য কনফেসর, স্লামডগ মিলিয়নেয়ার, দ্য গার্ল উইথ দি ড্রাগন ট্যাটু, ফায়ারফক্স, দ্য এইট, নো ইজি ডে এবং ইনফার্নোসহ বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন তিনি।

e-mail:
naazims2006@yahoo.com
Facebook:
http://www.facebook.com/mohammad.n.uddin

কেউ কেউ কথা রাখে

কেউ কেউ কথা রাখে

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

বাতিঘর প্রকাশনী

কেউ কেউ কথা রাখে

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

Keu Keu Katha Rakhe

Copyright©2015 by Mohammad Nazim Uddin

স্বত্ব © ২০১৫ লেখক

Gronthogar.blogspot.com

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১৫

প্রচ্ছদ : ডিলান

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; কম্পোজ : লেখক

মূল্য : দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

লেখকের কথা :

দীর্ঘদিন ধরে অনুবাদ করলেও বিগত পাঁচ-ছয় বছর ধরে মূলত মৌলিক গল্প-উপন্যাসই লিখে যাচ্ছি, যদিও পাঠক নিয়মিত তাগাদা দিয়ে থাকে অনুবাদের জন্য। তারা যে আমার অনুবাদের 'অভাব বোধ' করে তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। তাই গত বছর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ভিন্নধর্মি কিছু অনুবাদ করবো।

অনেক আগেই স্ক্যান্ডিনেভিয়ান আর স্প্যানিশ থৃলার অনুবাদ করেছি, অন্যকে দিয়ে করিয়েওছি। আমার নিজের কাছে গল্পের গভীরতা আর ভিন্নধর্মি কনটেক্সটের কারণে নন-ইংলিশ ক্রাইম-থৃলারগুলো বেশি ভালো লাগে। ছাত্রজীবন থেকে লাতিন আমেরিকার সাহিত্যের খোঁজ-খবর রাখলেও ওখানকার ক্রাইম-থৃলারগুলো খুব একটা পড়া ছিলো না। কয়েক বছর আগে কিছু লাতিন ক্রাইম-থৃলার পড়তে শুরু করি। এরই ধারাবাহিকতায় আর্জেন্টিনার জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক এদুয়ার্দো সাচেরির *লা প্রেগুন্তা দে সুস ওহোস*-এর (*La pregunta de sus ojos*) ইংরেজি অনুবাদটি পড়ে ফেলি।

এ বইটি আমাকে ভীষণ মুগ্ধ করে। সিদ্ধান্ত নেই অনুবাদ করার জন্য, কিন্তু কাজ শুরু করতে গিয়ে বুঝতে পারলাম অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে! মৌলিক লিখতে লিখতে অনুবাদ করা ভুলে গেছি। মূল কাহিনী আর চরিত্রগুলো পাশ কাটিয়ে নিজের মতো করে চরিত্র আর কাহিনী লিখতে শুরু করে দিয়েছি! সম্ভবত এর কারণ, ঐ সময় আমার মাথায় সাচেরির গল্পটির মতোই একটি পিরিওডিক্যাল মার্ডার মিস্ট্রি ঘুরপাক খাচ্ছিলো। অন্যদিকে, মূল উপন্যাসের সময়কাল আর রাজনৈতিক আবহের সাথে আমাদের দেশের একটি সময়ের আশ্চর্য রকমের সাযুজ্যও খুঁজে পেয়েছিলাম।

Gronthagaar.blogspot.com

যাই হোক, লেখাটা যখন শেষ করলাম তখন সেটা আর অনুবাদ রইলো না, আবার পুরোপুরি মৌলিক বললেও এদুয়ার্দো সাচেরির প্রতি অবিচার করা হবে।

পাঠককে বলবো, 'কেউ কেউ কথা রাখে' পুরোপুরি নিরীক্ষাধর্মি একটি কাজ। গল্পটি আমার যেমন ভালো লেগেছে তেমনি তদেরও যদি ভালো লাগে তবে সার্থক মনে করবো।

– *মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন*

ঢাকা, ২৬/১২/২০১৫ ইং

মুখবন্ধ

প্রকাশকের কথা

এটি একটি অদ্ভুত বই। অদ্ভুত বলার কারণ বইটি অনেক আগে লেখা হলেও লেখক আমাকে অনুরোধের ছদ্মবেশে অনেকটা হুকুমই দিয়েছিলেন, আমি যেন নির্দিষ্ট একটি সময়ের পর এটি প্রকাশ করি, কোনোভাবেই তার আগে নয়। সাধারণত লেখকেরা চান তাদের লেখা দ্রুত প্রকাশ হোক–সেদিক থেকে দেখলে অনুরোধটি খুবই অদ্ভুত ছিলো। আবার প্রকাশ করার জন্য লেখক যে নির্দিষ্ট সময়ের কথা বলেছিলেন সেটাকেও ঠিক 'নির্দিষ্ট' বলা যায় না; সেই ক্ষণটি কখন আসবে তা কেউ জানতো না। এরজন্যে পুরোপুরি প্রকৃতির উপরেই নির্ভর করতে হয়েছে! ভাগ্যবিধাতার সরাসরি হস্তক্ষেপ ছাড়া সেই সময়ের আগমণও ঘটেনি!

লেখকেরা সাধারণত খামখেয়ালি স্বভাবের হয়ে থাকেন কিন্তু তারচেয়েও বেশি হয়ে থাকেন সুক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন আর সংবেদনশীল। সেই অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা না-রেখে আমার কোনো উপায় ছিলো না।

দীর্ঘদিন ধরে বইটির পাণ্ডুলিপি সযত্নে রাখা ছিলো। ভেবেছিলাম জীবদ্দশায় হয়তো এটি প্রকাশ করতে পারবো না। তাতে আমার কোনো আক্ষেপ ছিলো না–বইটির পাণ্ডুলিপি হাতে আসামাত্র পড়ে ফেলেছিলাম। মনেপ্রাণে চেয়েছিলাম পাঠক যেন কোনোভাবেই এই গল্পটি পড়া থেকে বঞ্চিত না-হয়। সে-উদ্দেশ্যে লেখকের অনুমতি নিয়ে আমার অবর্তমানেও যেন বইটি প্রকাশে বিঘ্ন না ঘটে তার জন্যে একটি বিকল্প ব্যবস্থাও করে রেখেছিলাম। তবে ২০০৮ সালের মে মাসে ভাগ্যবিধাতার সরাসরি হস্তক্ষেপের কারণে বইটি প্রকাশ করার সুবর্ণ সুযোগ এসে পড়ে।

এই বইয়ের গল্পটি সত্যি। আর ঘটনাটি লেখকসহ কিছু মানুষের জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিলো। তাদের জীবনটাই পাল্টে দিয়েছিলো চিরতরের জন্যে। তাই ঘটনার অনেক বছর পরও লেখক এটা লেখার তাড়না বোধ করেছেন। তিনি চেয়েছেন অসাধারণ গল্পটি বেঁচে থাকুক।

আগেই বলেছি, এটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা। এই কাহিনী

Granthagaar.blogspot.com

অতীতের এমন একটি সময়ে যখন অনেক কিছুই ছিলো না, ছিলো শুধু স্বপ্ন ভঙ্গের হাহাকার। অস্থির এক সময়ের কাহিনী এটি। বর্তমানে বাস করে ঐ সময়ের যন্ত্রণা, সত্যিকারের মর্মযাতনা আর সামাজিক চিত্র অনুধাবন করা একটু কষ্টসাধ্য হতে পারে। হয়তো অনেকে অনেক বিষয় সঠিকভাবে বুঝতেও পারবেন না। রাজনৈতিকভাবে ভুল বোঝার অবকাশও রয়েছে। এ সমস্ত ঝুঁকি নিয়েও লেখক বইটি লিখেছেন। আশা করি পাঠক নির্মোহচিত্তে বিষয়টি উপলব্ধি করার চেষ্টা করবেন।

– সালসাবিল আহ্‌মেদ
প্রকাশক, অবয়ব প্রকাশনী
ঢাকা

Gronthagaar.blogspot.com

অধ্যায় ১

দশ-পনেরো মিনিট পায়চারি করেও দরজাটা দিয়ে ঢুকতে পারিনি। ওখানে যাবার আগে বুঝতে পারিনি এরকম দ্বিধায় পড়ে যাবো, আর সেটা ঠিক দরজার সামনে এসেই। জানি না কেন, তবে নিশ্চিতভাবেই সময় এখানে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। সবাই বলে সময় সবকিছু সারিয়ে তোলে, কিন্তু ঐদিন মনে হচ্ছিলো সময় শুধু সারিয়েই তোলে না, জড়তা আর দ্বিধার স্তূপও বাড়িয়ে দেয়। ঐ মুহূর্তে আমি সেই স্তূপের তলে তলিয়ে গেছিলাম।

জ্ঞান হবার পর থেকেই জানি সাহসিদের মধ্যে আমি পড়ি না, কিন্তু সামান্য একটি খোলা দরজা দিয়ে ঢোকার মতো সাহস নিশ্চয় আমার আছে, তাই এরকম দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকার কোনো মানেই ছিলো না, তারপরও সেই খোলা দরজাটি কোনো দূর্গের বিশাল আর ভারি ফটকের মতোই পথরোধ করে দাঁড়িয়ে ছিলো আমার সামনে। ভাগ্য ভালো, সমস্ত দ্বিধা আর সংকোচ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিলাম অপরিচিত একজনের হস্তক্ষেপে। লেখালেখি করে যে টুকটাক পরিচিতি পেয়েছি সেটা আবারও টের পেলাম।

Gronthagaar.blogspot.com

ঐ খোলা দরজা দিয়ে এক যুবক বেরিয়ে আসার সময় আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ায়। আগ বাড়িয়ে জানায় সে আমার বইয়ের একজন পাঠক। ভক্তদের সাথে এরকম আকস্মিক দেখা-সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা আমার জন্য অপ্রত্যাশিত কোনো ঘটনা নয়। তাদের আচরণ, কথাবার্তা, উচ্ছাসের সাথে আমি পরিচিত।

করমর্দন করতে করতেই পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের ঐ যুবক অনেক কিছু বললো, তারপর যখন জানতে পারলো আমি কেন এখানে দাঁড়িয়ে আছি সঙ্গে সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলো সে। কার সাথে দেখা করতে যাচ্ছি আমি?–তার সঙ্গত প্রশ্নের জবাবে সেই নামটি উচ্চারণ করলাম যে নামটি আমার হৃদয়ের গহীনে দীর্ঘস্থায়ী আস্তানা গেঁড়ে আছে দুই যুগ ধরে।

খুবই আন্তরিকভাবে আমাকে লিফট পর্যন্ত পৌছে দিলো সেই তরুণ, সেই সাথে কতো তলায় যেতে হবে সেটাও বলে দিলো। এমনকি লিফটে করে আমাকে নির্দিষ্ট সেই অফিসে পৌছে দেবার আগ্রহও দেখিয়েছিলো তবে আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিরত করি।

gronthagaar.blogspot.com

লিফটের ইন্ডিকেটরের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে ভাবছিলাম সময় আর কী করতে পারে! সারিয়ে তোলে। দ্বিধার স্তুপ তৈরি করে। ভুলিয়ে দেয়। বিস্মৃত করে দেয়?

সময় আসলে সব কিছুই করে। আমরা নিতান্তই সময়ের সন্তান!

আমার বামহাতে একটি চামড়ার ব্যাগ। একদলা কাগজ ছাড়া ওর ভেতরে কিছু নেই। অথচ ব্যাগটাকে বেশ ভারি বলে মনে হচ্ছিলো। লিফটের ভেতরে একটু পর পর ডান-বাম করছিলাম কিন্তু হাত বদলের এই খেলায় তেমন ফল পাচ্ছিলাম না। আমার নাজুক হৃদপিণ্ডটা লাফাচ্ছিলো অনেকটা প্রথমবার প্রেমে পড়ার মতো অনুভূতিতে!

লিফটের দরজা খোলার আগে আরেকটা প্রশ্ন আমার দ্বিধার স্তুপ ভারাক্রান্ত করে তুললো : ও কি আমাকে চিনতে পারবে?

লিফটের দরজা খুলে গেলে বুক ভরে দম নিয়ে বের হলাম আমি। খুব বেশি খুঁজতে হলো না, কয়েক পা এগোতেই চোখে পড়লো একটি দরজায় সুন্দর করে ইংরেজিতে লেখা নামফলকটির দিকে। খুব বেশিদিন হয়নি লেখা হয়েছে ওটা। এখনও এর কালি চকচক করছে। টের পেলাম আবারো আমার মধ্যে দ্বিধা এসে ভর করেছে, কিন্তু এই দরজার সামনে এসে দ্বিধার হাতে ক্রীড়নক হতে রাজি নই, তাই অনেকটা যন্ত্রের মতো দরজায় নক্ করলাম।

আল্‌তো করে পর পর তিনটি টোকা।

ভেতর থেকে এক তরুণ দরজা খুলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। আমি কোনো কিছু বলছি না দেখে সে নিজেই জানতে চাইলো কি চাই। তাকে জানালাম এখানে আসার উদ্দেশ্য।

"আপনার কি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?"

"না," ছোট্ট করে বললাম যুবককে। "আমি তার পূর্বপরিচিত। ব্যক্তিগত একটা কাজে এসেছি।"

"তাহলে সোজা বামদিকে চলে যান। উনি বাইরের অফিসেই আছেন।"

আমি একটা প্যাসেজ দিয়ে চলে এলাম বিরাট বড় ঘরে। তিন-চারটা ডেস্ক, কয়েকজন লোক, কম্পিউটার আর কাগজপত্রের সমাহার। কাজে ডুবে থাকা লোকগুলো আমার উপস্থিতি টেরই পেলো না, যে যার মতো কাজ করে যাচ্ছে। আমি হাতের ব্যাগটা নিয়ে অযাচিত অতিথির মতো দাঁড়িয়ে রইলাম কয়েক মুহূর্ত, তারপরই দৃষ্টি আটকে গেলো ঘরের বামদিকের এককোণে।

সেগুন কাঠের বিশাল একটি ডেস্ক, অভিজাত ভঙ্গিতে এক নারী দখল করে আছে। রিডিংগ্লাসের ভেতর দিয়ে গভীর মনোযোগের সাথে হাতেধরা একটি কাগজ পড়ছে সে। তার পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখা চুল, মেনিকিউর

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

করা নখ, ঠোঁটে হালকা গোলাপি লিপস্টিক, চোখে চিকন করে দেয়া কাজল আর কানের দুল দুই যুগ আগের একটি ছবির মতোই স্থির হয়ে আছে! যেন বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ভেংচি কাটছে বয়সটাকে।

টের পেলাম দম বন্ধ হয়ে আসছে, আর আমি তার দিকে নিষ্পলক চেয়ে আছি।

বামহাতে কাগজটা ধরে রেখেছে সে, ডানহাতে একটি কলম। সেই কলমটি আলতো করে ফাঁক হয়ে থাকা ঠোঁটে মৃদু টোকা মারছে, ঠিক যেন তার পেছনে, দেয়ালে টাঙানো অ্যান্টিক ঘড়িটার টিকটিক ছন্দের তালে তালে। তারপর হঠাৎ করে কারো উপস্থিতি টের পেয়ে তার হাতের কলমটি স্থির হয়ে গেলো। রিডিংগ্লাসের উপর দিয়ে দৃষ্টি হানলো আমার দিকে। তার ভুরু আর কপালের কুচকে যাওয়া দেখতে পেলাম, আরো দেখতে পেলাম তার চোখের পাপড়িগুলো।

চোখাচোখির মুহূর্তটায় আমি কেমন অভিব্যক্তি দিয়েছিলাম জানি না, সম্ভবত তারও নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছিলো। নিজের অভিজাত ব্যক্তিত্বকে পুণরুদ্ধার করে খুব ধীরে হাতের কাগজটা নামিয়ে রাখলো সে, সেই সাথে কলমটি। তারপর চোখেমুখে বিস্ময় নিয়ে আস্তে করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই আমার সমস্ত দ্বিধা, জড়তা তিরোহিত হলো।

আমাকে চিনতে পেরেছে।

Gronthagaar.blogspot.com

*

কফি আমর পছন্দের নয়, আমি চায়ের মানুষ, তবে অনেকদিন পর কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে মোটেও খারাপ লাগেনি।

একটা বয়সে এসে মানুষ অতীতে ফিরে যেতে চায় বার বার, আর আমি তো সেখানেই বসবাস করছি দীর্ঘদিন থেকে!

"তোমাকে দেখেই কিন্তু চিনতে পেরেছি।" কফির কাপে চুমুক না দিয়েই বললো সে।

আমরা বসেছি তার প্রাইভেট চেম্বারে। একটু আগে এক কর্মচারি এসে দু-কাপ কফি দিয়ে গেছে। সেই কফি খেতে খেতে আলাপ করছি এখন।

কথাটা যদি সৌজন্যতা-ভদ্রতা না-হয়ে থাকে তাহলে অবাক করার মতোই বটে। আমার মতো স্বল্প পরিচিত একজন মানুষকে দীর্ঘদিন পর দেখে চেনার কথা নয়।

gronthagaar.blogspot.com

"আমার ভাগ্য..." আস্তে করে বললাম মুচকি হেসে।

প্রচ্ছন্ন এই টিটকারিটা আমলে না নিয়ে তার ঠোঁটজোড়া নড়ে উঠলো। "যদিও তুমি অনেকটাই বদলে গেছো।"

"হুম," আবারও হাসলাম। "ডিপ্লোমেটিক হবার দরকার নেই। বলো, বুড়ো হয়ে গেছি।"

"আমাদের বয়স তো আর কম হলো না," চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কফিতে সতর্ক চুমুক দিলো সে।

"তোমার বেলায় এটা বলার কোনো উপায় নেই। তুমি এখনও পয়ত্রিশে আটকে আছো।"

ভুরু নাচিয়ে মুচকি হাসলো সে। "আগে তো তোমার মেয়ে পটানোর স্বভাব ছিলো না...এই বয়সে এসে শিখে গেছো দেখছি।"

হেসে মাথা দোলালাম কেবল।

"গত বছর আগে পঞ্চাশতম জন্মদিন সেলিব্রেট করেছি।"

"আমি জানতাম মেয়েরা তাদের বয়সের কথা বলে না...মানে, সত্যিকারের বয়স।"

"বুড়ি হয়ে গেলে বলে।"

হা-হা করে হেসে উঠলাম আমি।

"তোমার কতো হলো?"

"বাহান্ন পেরিয়ে গেছি চার মাস আগে, অবশ্য দেখতে ষাটের মতো লাগে।"

ঠিক দুই যুগ আগের মতোই মোহনীয় কণ্ঠে বলে উঠলো সে, "অতোটা লাগে না, তবে শরীরের যত্ন নাও না সেটা বোঝা যায়।"

এ কথার কোনো জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে হেসে গেলাম।

"আমি যে ঢাকায়...কার কাছ থেকে জানলে?"

"বিখ্যাত মানুষের খবর পত্রিকায় হরহামেশাই পাওয়া যায়।"

কথাটা সত্যি। গত মাসের শেষের দিকে একটি ইংরেজি জাতীয় দৈনিকে তার এবং সদ্য প্রতিষ্ঠিত সংস্থা আর প্রধানের উপরে ইন্টারভিউ ছাপা হয়েছিলো। ওটা পড়ার পরই আমি জানতে পারি সে এখন ঢাকায়। আইনজীবি হিসেবে তার পেশাটা আমাকে বেশ অবাক করেছিলো। দুই যুগ আগে তার মুখ থেকে কখনও এরকম কিছুর কথা শুনিনি। অবশ্য, খুব বেশি কথাও শোনা হয়নি তার মুখ থেকে। যাই হোক, এরপরই দেখা করার সিদ্ধান্ত নেই।

gronthagaar.blogspot.com

মুচকি হেসে মাথা দুলিয়ে গেলো সে। "তোমার চেয়ে বেশি বিখ্যাত নিশ্চয় হইনি এখনও?"

"আমি যেকোনো উঠতি অভিনেতার চেয়েও কম বিখ্যাত। একটু খোলামেলা পোজ দেয়া মডেল আর উঠতি গায়ক-নায়করাও আমার চেয়ে বেশি জনপ্রিয়। এখনও যারা বই পড়ে তাদের কেউ কেউ আমার লেখার পাঠক...এই যা।"

মুচকি হাসলো সে। "আমি স্টেট্‌সে থাকার সময়েই শুনেছিলাম তুমি বেশ বিখ্যাত লেখক হয়ে উঠেছো কিন্তু ওখানে থেকে তোমার কোনো বই জোগাড় করতে পারিনি," একটু থেমে আবার বললো, "অবশ্য আমি এখন বই-টই খুব একটা পড়িও না...আই মিন, সময় পাই না।"

বই পড়ার সময় পায় না–এ কথাটাও আমাকে বিশ্বাস করতে হলো, কারণ ঐ সময়। সে-ই সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। সবকিছু বদলে দেয়ার ক্ষমতা রাখে। আর আমি সেটা অনেক আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম।

"পত্রিকায় যখন দেখলাম তুমি একজন ল-ইয়ার তখন খুব অবাক হয়েছিলাম," বললাম তাকে।

"হুম," সায় দিলো। "স্টেট্‌সে গিয়ে সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলাম," একটু থেমে আবার বললো, "ওখানে তো সবাই কাজ করে...আমিও সিদ্ধান্ত নিলাম জব করবো। কিন্তু ওড জব করার কোন ইচ্ছে ছিলো না। আবার ক্রেডিট ট্রান্সফার করারও ব্যবস্থা ছিলো না তখন। তাই নতুন করে গ্র্যাজুয়েশন করতে হলো।"

"আইনের উপরে কেন করলে? ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রি ছিলে...ল পড়ার ইচ্ছে হলো কেন?"

একটু হাসলো সে। "আমি আসলে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলাম। সেজন্যে এখানে অনার্স শেষ করেও মাস্টার্স করিনি। কিন্তু ওখানে গিয়ে মনে হলো, এটাই করবো। মানুষ ন্যায়বিচার পাবে–আর আমি তাতে সামান্য ভূমিকা রাখতে পারবো।"

চুপচাপ তার কথা শুনে গেলাম। আমার মন বললো, তার এমন সিদ্ধান্তের পেছনে দুই যুগ আগের ঘটনাটির নিশ্চয় বড় কোন ভূমিকা রেখেছে।

"কি ভাবছো?"

"কিছু না।"

সে একটু চুপ করে থেকে আবার বললো, "তুমি এসেছো বলে আমি অনেক খুশি হয়েছি। থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।"

gronthagaar.blogspot.com

আমি নিঃশব্দই রইলাম।

"দেশে ফিরে আসার পর আমার উচিত ছিলো তোমার সাথে যোগাযোগ করা, কিন্তু এটা স্ট্যাবলিশ করতে গিয়ে এতো ব্যস্ত হয়ে পড়লাম..." সে তার নতুন অফিসটির দিকে ইঙ্গিত করলো।

"আমি কিন্তু আশা করিনি তুমি আমাকে খুঁজে বের করবে...দেখা করবে," অবশেষে বললাম। "তাছাড়া দেশে ফিরে এসেছো খুব বেশিদিন হয়নি। কতো দিন হলো? তিন মাস?"

"উমম...প্রায় চারমাস।"

মাথা নেড়ে সায় দিলাম। "তুমি অবশ্য চেষ্টা করলেও আমাকে খুঁজে পেতে কি-না সন্দেহ।"

ভুরু আর চোখজোড়া কেমন তরঙ্গায়িত করে বলে উঠলো সে। "কেন, তোমার পাবলিশারের কাছ থেকে অ্যাড্রেস আর কন্ট্যাক্ট নাম্বার কালেক্ট করতাম?"

বুঝতে পারলাম, কথা না-বলে তার দিকে চেয়ে আছি। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ফিরে পাবার চেষ্টা করলাম। "সে তোমাকে ওসব দিতো না।"

"কেন?"

"আমার নিষেধ আছে।" এবার বোকার মতো হেসে ফেললাম। "আমি একটু একা থাকতে পছন্দ করি, লোকজন-হৈ-হল্লা ভালো লাগে না।"

নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো। কোনো কথা বলতে গিয়ে সঙ্কোচে ভুগছে। গভীর করে দম নিয়ে বললো সে, "বিয়ে করোনি কেন?" তার অভিব্যক্তি দেখে মনে হলো এজন্যে নিজেকে দায়ি মনে করছে।

কাঁধ তুললাম। "জানি না।" যদিও খুব বলতে ইচ্ছে করছিলো, তোমার মতো কাউকে পাইনি বলে!

"গুণমুগ্ধ ফিমেল-ফ্যানদের সাথে প্রেমও করো নি?" মুখ টিপে রহস্য করে বললো সে। "শুনেছি, লেখকদের সাথে ফিমেল-ফ্যানদের প্রেম-ট্রেম হয়ে থাকে।"

মুচকি হাসলাম। "কী জানি। আমার সাথে তো সে-রকম কিছু হয়নি।"

"নাকি বলতে চাইছো না?"

"কয়েকজনের সাথে বেশ কথা-টথা হতো। তবে প্রেম?" মাথা দোলালাম। "না, সে-রকম কিছু হয়নি।"

"এখন হয় না?"

"কি?"

"কথা-টথা?"

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

কপাল চুলকে আত্মসমর্পনের ভঙ্গি করলাম। "হয়...দুয়েকজনের সাথে...মাঝেমধ্যে।"

"থাক, এসব তোমাদের লেখক-ভক্তের সিক্রেট ব্যাপার, আমাকে বলতে হবে না।"

"বাঁচালে।"

হা-হা-হা করে হেসে উঠলো রামজিয়া শেহ্‌রিন।

"আমি যে বিয়ে করিনি এটা কি তুমি ওখানে থাকতেই জেনেছিলে?" প্রসঙ্গ বদলে জিজ্ঞেস করলাম।

মাথা নেড়ে জবাব দিলো সে। "না। দেশে আসার পর জেনেছি আমাদের অফিসের এক ছেলের কাছ থেকে। ও তোমার বই পড়ে। ওয়ান অব ইউর ডাই-হার্ড ফ্যান্‌স।"

"ও।" সম্ভবত এই ছেলেটার সাথেই একটু আগে নীচে দেখা হয়েছিলো।

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেলো অযাচিত নীরবতায়। সম্ভবত আমাদের দু-জনের বলার মতো আর কোনো কথা নেই কিংবা অনেক বেশি কথা জমে আছে দীর্ঘদিন থেকে, সেগুলো বের হতে গিয়ে হুড়োহুড়ি করছে, এক ধরণের জট লেগে গেছে। পানিভর্তি বোতলের খোলামুখ আচমকা নীচু করে ধরলে যেমনটি হয়।

"তোমার হাতে ওটা কি?"

তার প্রশ্নে নীরবতা ভাঙলো। হঠাৎ করেই আবিষ্কার করলাম এখানে আসার আসল কারণটি। "ও, এটা...একটা বই।"

"কার, তোমার?" আগ্রহি হয়ে উঠলো সে, অনেকটা চপলা কিশোরির মতো।

"হুম।"

"আমার জন্যে এনেছো?"

মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

"ওয়াও।"

খুশি এবং বিস্ময় দুটোই দেখা গেলো তার চোখেমুখে, তবে আমার মনে হলো না এর মধ্যে কোন কৃত্রিমতা আছে।

"নতুন বই?"

"হুম।" ঢোক গিললাম আমি। বুঝতে পারলাম না কী বলবো। "এটা এখনও প্রকাশিত হয়নি।"

"তুমি তোমার আনপাবলিশ বই নিয়ে এসেছো আমার জন্য?"

আল্‌তো করে মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

"ওয়াও...গ্রেট!"

gronthagaar.blogspot.com

"সত্যি বলতে বইটা তোমাকে গিফট করার জন্য আনিনি।"

তার চোখেমুখে কৌতুহল। "সরি টু সে...আই ডিডেন্ট গেট ইট...বুঝতে পারছি না?"

আর কোনো কথা না বলে চামড়ার ব্যাগ থেকে পাণ্ডুলিপিটা বের করে তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। প্রচণ্ড আগ্রহ আর বিস্ময় তাকে যেন জমিয়ে দিয়েছে। আস্তে করে হাত বাড়িয়ে পাণ্ডুলিপিটা তুলে নিলো।

আমি লেখক মানুষ, লিখে অনেক কিছুই বলতে পারি কিন্তু কথায় তেমন পারদর্শি নই। আমার সামনে যে বসে আছে তাকে মানুষটিকে অতো কিছু ব্যাখ্যা করার চেয়ে লেখাটা দেখিয়ে দেয়াই ভালো।

কয়েক মুহূর্ত এ-ফোর সাইজের কাগজের স্তুপটা হাতে ধরে প্রথম পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়ে নিলো তারপর ডেস্কের উপর ওটা রেখে গলায় ঝুলিয়ে রাখা রিডিংগ্লাসটা আবারো চাপালো নাকের উপরে। বইটির শিরোনাম পড়ে গেলো বেশ কিছুক্ষণ ধরে। " 'কেউ কথা রাখে নি'?!" অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করলো সে। রিডিংগ্লাসের উপর দিয়ে আহত দৃষ্টিতে তাকালো আমার দিকে। যেন বইয়ের শিরোনামটি তাকে সারসরি অভিযুক্ত করছে।

আমি কিছু বলছি না দেখে আবারও নজর দিলো পাণ্ডুলিপির দিকে। আল্‌তো করে প্রথম পৃষ্ঠাটি উল্টে দিলো। আমি দেখলাম তার কাজল দেয়া চোখের মণি দুটো নড়াচড়া করছে দ্রুত। কয়েক মুহূর্ত পর রিডিংগ্লাসের উপর দিয়ে আমার দিকে তাকালো। আমি কিছুই বললাম না। বুঝতে পারছি তার মনে কি প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে।

"এটা কি...মিলির খুনটা নিয়ে?"

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

অধ্যায় ২

একটি খুন

এরকম একজোড়া চোখ যেকোনো যুবকের হৃদয়ে ঝড় তোলার ক্ষমতা রাখে। সেই চোখে তাকিয়ে সাধারণ কোনো যুবকও লিখে ফেলতে পারে কবিতা। সম্ভবত এই চোখের করুণ আর্তি দেখে ক্ষণিকের জন্যে থমকে গেছিলো খুনি; কেঁপে উঠেছিলো তার উদ্যত হাত। তারপরও খুনটা হয়েছে। খুনির ভেতরে ঘাপটি মেরে থাকা পশু লাগাম খুলে বেরিয়ে এসেছিলো। পাশবিক উন্মাদনায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো মেয়েটির উপরে।

আমি যখন বিকেলের দিকে ক্রাইমসিনে আসি তখনও পথঘাট ভেজা। ঘণ্টা দুয়েকের বৃষ্টিতে পুরো শহর কেমন পরিষ্কার হয়ে গেছে। ঢাকায় তখন বৃষ্টি হলে একদমই জলাবদ্ধতা হতো না।

ঘরে ঢোকামাত্রই দেখি মেয়েটির মৃতদেহ একটি চাদর দিয়ে ঢাকা, তবে মুখটা উন্মুক্ত। প্রথমেই আমার নজরে পড়লো তার মায়াভরা চোখদুটো। ঐদিনের পর থেকে এই চোখদুটো আমি কোনোদিনই ভুলতে পারিনি। অবশ্য সেই চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা সম্ভব হলো না আমার পক্ষে। কয়েক মুহূর্ত পরই দৃষ্টি সরিয়ে নিলাম অন্যদিকে। মাত্র দু-বছর ধরে পুলিশের চাকরি করছি, খুন-খারাবি দেখতে অভ্যস্ত হইনি তখনও। সিনিয়র কলিগেরা বলতো, পুরোপুরি পুলিশ হতে গেলে নাকি কমপক্ষে পাঁচ বছর লাগে। আমি তিন বছরের ঘাটতি নিয়ে যারপরনাই অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেলাম!

চাদরে ঢাকা লাশের সামনে দাঁড়িয়ে আছি দ্বিধা নিয়ে। হাত দিয়ে চাদরটা সরানোর সাহস হচ্ছে না। তিনজন কনস্টেবল আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও তাদেরকে বলতে সংকোচ হচ্ছে। হাজার হলেও আমি একজন অ্যাসিসটেন্ট সাব-ইন্সপেক্টর, এই খুনের তদন্তে সহযোগী ভূমিকা আমার। দ্বিধা ঝেড়ে যে-ই না একটু এগিয়ে যাবো লাশের দিকে অমনি একজন ত্রাণকর্তা এসে আমার জন্যে কাজটা সহজ করে দিলেন। আমার যাবতীয় কঠিন কাজগুলোর সময় তিনি যেন ঈশ্বরের ইঙ্গিতে চলে আসেন ঠিক সময়ে। বিগত দু-বছর ধরে এমনটিই হয়ে আসছে।

gronthagaar.blogspot.com

সিনিয়র সাব-ইন্সপেক্টর এসএম হায়দার ঘরে ঢুকে এক ঝটকায় চাদরটা সরিয়ে দিয়ে আমার দিকে ক্ষিপ্ত চোখে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। আমি তার ক্রোধ টের পাচ্ছিলাম।

"দেখো, শূয়োরেরবাচ্চাটা কি করছে!" অজ্ঞাত খুনিকে গালি দিয়ে বললেন তিনি।

আমার সামনে দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে মৃত এক তরুণী। মেয়েটির গায়ে বলতে গেলে কোনো পোশাকই নেই। এই প্রথম আমি কোনো নগ্ন লাশ দেখলাম, তা-ও আবার কোনো তরুণীর। চোখ সরিয়ে ফেললাম। বয়সের কারণে হোক কিংবা আমার কোমল হৃদয়ের জন্য, এরকম মৃতদেহ দেখলেই কেমনজানি লাগে।

"আপনি এতোক্ষণ কোথায় ছিলেন?"

"উপরে," ছোট্ট করে জবাব দিলেন। "দোতলার ভাড়াটিয়াদের সাথে কথা বলছিলাম।"

"ঘটনাটা কখন ঘটেছে?" কাজের প্রসঙ্গে চলে আসার চেষ্টা করলাম আমি।

থুতনির নীচে একটু চুলকে নিলেন এসএম হায়দার। এটা তার মুদ্রাদোষ। কোনো বিষয়ে খুব নিশ্চিত হলেই তিনি এটা করেন। নতুন কারোর কাছে মনে হতে পারে তিনি অনিশ্চয়তায় ভুগছেন।

"সাড়ে তিনটা থেকে পৌণে চারটার মধ্যে খুনটা করা হয়েছে। খুনি হয়তো এখানে এসেছে তারও কিছুক্ষণ আগে। উমমম...ধরো, দশ-পনেরো মিনিট?"

আমি বিস্মিত। স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের বিখ্যাত চরিত্রটিও এতো কম সময়ের মধ্যে খুনের সঠিক সময় বলতে পারতো কি-না সন্দেহ। হায়দারভাই বড়জোর বিশ মিনিট আগে এখানে এসেছেন। আমি একটা কাজে বাইরে গেছিলাম, থানায় ফিরে এসে শুনি হায়দারভাই আমাকে এখানে চলে আসতে বলেছেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে মিনিটের হিসেবও বের করে ফেলেছেন তিনি!

এসএম হায়দার আমার চোখেমুখে অবিশ্বাস আর বিস্ময় দেখে মুচকি হাসলেন। ভাবখানা এমন, এতে অবাক হবার কী আছে!

সত্যি বলতে আমি খুবই অবাক হয়েছিলাম। "একেবারে মিনিটের হিসেবও বলে দিলেন?!"

এসএম হায়দার বিছানার বামদিকের বেডসাইড টেবিলের নীচে আঙুল তুলে দেখালেন। "ঘড়িটা দেখেছো?"

gronthagaar.blogspot.com

একটা গোলাকার বেডসাইড ঘড়ি চিৎ হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে। কাঁচটা ভেঙে গেছে, ডায়ালটাও ফেঁটে গেছে পড়ে যাওয়ার সময়। ওটার কাঁটা স্থির হয়ে আছে তিনটা বাহান্নতে।

"ধস্তাধস্তির সময় ঘড়িটা পড়ে গেছে," বললেন তিনি, "এরপর বড়জোর তিন-চার মিনিট বেঁচে ছিলো মেয়েটি, এর বেশি হবে না।"

শার্লক হোমস যেমন তার দুর্দান্ত অনুমাণের ব্যাখ্যা দেবার পর ডাক্তার ওয়াটসন কিংবা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টরদের কাছে সেটা মামুলি বলে মনে হয়, হায়দারভাই ঘড়িটা দেখিয়ে দেবার পর আমারও তাই মনে হলো।

এ আর এমন কি–ঘড়িটা আমার চোখে পড়লে আমিও একইভাবে অনুমান করে এটা বলে দিতে পারতাম!

কিন্তু সত্যি হলো, এরকম সব বিষয় বাকিদের চোখে ধরা পড়ে না, ধরা পড়ে হায়দারভায়ের চোখে। তার ক্ষুরধার মস্তিষ্কটি যে আমাদের সবার চেয়ে সেরা, সে-কথা তার কড়া মেজাজ আর বদরাগি চরিত্রের আড়ালে ঢাকা পড়ে থাকে সব সময়। ঘনিষ্ঠভাবে না মিশলে কেউ বুঝতেই পারে না এসএম হায়দার কতোটা মেধাবি।

"ঘটনার শুরু ড্রইংরুমে, সেখান থেকে মেয়েটা হয় বাঁচার জন্য বেডরুমে এসেছিলো, নয়তো ধর্ষকই তাকে টেনে হিচরে এখানে নিয়ে এসেছে।"

"ডাকাতির ঘটনা?"

আমার কথা দৃঢ়ভাবে নাকচ করে দিলেন তিনি। "রেপিস্ট মেয়েটার পরিচিত, তবে মেয়েটার সাথে খুব একটা ভালো সম্পর্ক ছিলো না। স্বল্প-পরিচিত কেউ।"

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে হায়দারভায়ের দিকে তাকালাম। এটাও কি মামুলি কোনো জিনিস দেখে আন্দাজ করেছেন তিনি? আমার মনের ভেতরে যে প্রশ্নের উদয় হয়েছে সেটা আমার অভিব্যক্তি দেখে আবারো ধরতে পারলেন। মাথার পেছনটা চুলকে আমাকে ড্রইংরুমে আসার জন্য ইশারা করলেন তিনি। আমি তার পেছন পেছন সেখানে চলে গেলাম।

"দেখো।" ড্রইংরুমের সোফার সামনে টেবিলটার দিকে ইশারা করলেন। একটা চায়ের কাপ আর পিরিচ, কিছু টোস্ট বিস্কিট টেবিলের ঠিক কাছেই, মেঝেতে পড়ে আছে। "মেহমান...বুঝলে? কিন্তু উটকো মেহমান।"

মেঝেতে পড়ে থাকা কাপ-পিরিচ দেখতে লাগলাম আমি। মেহমান ঠিক আছে কিন্তু উটকো মেহমানের ব্যাপারটা মাথায় ঢুকলো না।

"আর মেহমান কখনও একদম অপরিচিত হয় না। তার মানেটা দাঁড়াচ্ছে, খুনি ভিক্টিমের পরিচিত।"

gronthagaar.blogspot.com

হায়দারভায়ের দিকে তাকালাম। "এটা কিভাবে বুঝলেন? মানে, উটকো মেহমানের কথা বলছি।"

মাথা দোলালেন তিনি। তার মধ্যে অধৈর্যভাব ফুটে উঠলো। "চায়ের কাপ একটা...বুঝলে না?"

বুঝতে পারলাম না আমি। চায়ের কাপ একটা তো কি হয়েছে? কাপ গুণে মেহমানের সংখ্যা বের করা যায় কিন্তু পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা কিংবা অযাচিত-কাঙ্খিত এসব বের করা যায় জানা ছিলো না।

"তোমার বাড়িতে যদি ঘনিষ্ঠ কেউ বেড়াতে আসে তাহলে তুমিও তার সাথে চা খাবে," ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন তিনি। "কিন্তু এমন কেউ যদি আসে যার সাথে তোমার ঘনিষ্ঠতা কম, কিংবা যাকে তুমি ঠিক মেহমান হিসেবে পছন্দ করছো না, তাহলে?"

বুঝতে পারলাম, আবারো এসএম হায়দার ঠিক ঠিক অনুমাণ করতে পেরেছেন সম্ভবত।

"মেহমানের জন্য এক কাপ চা বানিয়ে দেবে...তার সাথে বসে এক কাপ চা খেতে চাইবে না, ঠিক?"

আমি মাথার পেছনটা একটু চুলকে বোকার মতো হাসলাম, সেই সাথে মাথা নেড়ে সায় দিতেও ভুললাম না। যেন পড়া না-পারা কোন ছাত্র শিক্ষকের কাছে ধরা খেয়েছে। সত্যি বলতে, তিনি আমার শিক্ষকই। তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে আমার যতোটুকু জ্ঞান অর্জিত হয়েছে তার বেশিরভাগই এসএম হায়দারের কাছ থেকে পাওয়া।

"আমরা ভিক্টিমের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব আর পরিচিতজনদের সাথে কথা বলবো। এই বাড়ির বাইরে ছোট্ট একটা মুদির দোকান আছে, ওটা বন্ধ দেখলাম। মুদির সাথে কথা বলা দরকার।"

"মুদির সাথে কেন?"

"আমার ধারণা খুনি বেশ কয়েকদিন ধরে বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব কিছু লক্ষ্য করেছে। মেয়েটার স্বামি কখন বাসায় ফেরে, মেয়েটা কি করে এসব অবজার্ভ করেছে। মনে হয়, এই কাজটা সে মুদি দোকানের আশেপাশেই করেছে।"

বুঝতে পেরে মাথা দোলালাম আমি। "তাহলে এটা প্রি-প্ল্যান ছিলো?"

"অবশ্যই। এখন সেই মেহমানকে খুঁজে বের করতে হবে।"

শেষ কথাটা হায়দারভাই অনেকটা আপনমনে বললেন।

"আচ্ছা, খুনের সময় মেয়েটির স্বামি কোথায় ছিলো?" আমি চেষ্টা করলাম গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রশ্ন করে অবদান রাখতে।

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

"হাজব্যান্ড বলছে, সে অফিস থেকে বাসায় এসে দেখে ওয়াইফ খুন হয়ে পড়ে আছে।" কোমরে দু-হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আবার বললেন, "এটা আমরা চেক করে দেখবো।"

"কেন?" কথাটা আমার মুখ ফস্‌কে বের হয়ে গেলো।

শিক্ষক যেমন বোকা ছাত্রের দিকে তাকায় হায়দারভাই ঠিক সেভাবে আমার দিকে তাকালেন। "স্ত্রি যখন খুন হয় তখন বেশরিভাগ ক্ষেত্রে প্রাইম সাসপেক্ট কে হয়, জানো?" আমার জবাবের অপেক্ষা না করেই তিনি জোর দিয়ে বললেন, "হাজব্যান্ড।"

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

"সুতরাং হাজব্যান্ডের এই স্টেটমেন্টটা আমাদেরকে চেক করে দেখতে হবে। তদন্ত কাজে সব কিছু শুধু চেক করে দেখলেই হয় না, ডাবল চেক করতে হয়।"

আমি এবার বেশ জোরেই মাথা নেড়ে সায় দিলাম। *আলবৎ!*

"তাছাড়া কেউই সন্দেহের বাইরে নয়। কেউ না।"

এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করার কোন কারণ নেই। "মেয়েটার স্বামি এখন কোথায়?" জানতে চাইলাম আমি।

আল্‌তো করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। "ঘুমাচ্ছে।"

"ঘুমাচ্ছে?" অবাকই হলাম।

"পাগলের মতো আচরণ করছিলো, ডাক্তার সিডেটিভ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে।"

একটু চুপ থেকে আবার বললাম, "আশেপাশের বাড়ি থেকে কেউ কিছু দেখে নি?"

"আই উইটনেসের কথা বলছো?"

"হুম।"

"আপাতত সে-রকম কাউকে পাওয়া যায়নি। এই গলিটা খুবই নিরিবিলি, মানুষজন খুব একটা আসে না। ঘটনা যখন ঘটেছে তখন আবার খুব বৃষ্টি হচ্ছিলো। সে-কারণে কেনো রকম চিৎকার কিংবা ধস্তাধস্তির শব্দ কেউ শুনতে পায়নি। তবে আমার মনে হচ্ছে দোতলায় যারা আছে তাদের কেউ কিছু একটা দেখেছে। অবশ্য সেটা তারা স্বীকার করছে না।"

হাটতে হাটতে আমরা আবারো চলে এলাম শোবার ঘরে, মেয়েটার লাশের কাছে।

"অনেকের সাথে কথা বলতে হবে আমাদের, বুঝলে?"

gronthagaar.blogspot.com

মাথা নেড়ে সায় দিলাম। খুনের তদন্তে প্রচুর লোকজনকে জেরা করতে হয়। দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দ শুনে ফিরে তাকালাম হায়দারভায়ের দিকে।

"মাত্র তিনমাস আগে বিয়ে হয়েছে ওদের," গম্ভীর মুখে বললেন তিনি।

ওহ্! কথাটা শুনে আমার খুব খারাপ লাগলো। নিহত মেয়েটির দিকে আবার তাকালাম, মনে হলো মেয়েটির ফাঁকা দৃষ্টি আমার দিকেই নিবদ্ধ। চোখ সরিয়ে ফেললাম সঙ্গে সঙ্গে। কী করুণ আর মায়াভরা চোখ। এখনও দু-চোখে অশ্রু টলটল করছে যেন!

"ওদের কোনো কাজের লোক নেই?" আমি তদন্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকতে চাইলাম। এটা হয়তো এক ধরণের পলায়ন। অন্তত মেয়েটির দৃষ্টি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চাইছিলাম।

"আছে, কিন্তু সে এখানে থাকে না। ছুটা বুয়া।" হায়দারভাই লাশের দিকে চেয়েই বললেন। কী যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন।

"মেয়েটি তাহলে সারাদিন একাই থাকতো?"

এবার আমার দিকে তাকালেন তিনি। "ছেলেটা ব্যাঙ্কে চাকরি করে, বিয়ের ঠিক আগে দিয়ে ঢাকায় পোস্টিং পেয়েছে। আর বিয়ের এক মাস পরই এই বাড়িতে উঠেছে মেয়েটাকে নিয়ে।"

"মেয়েটা এখানে সারাদিন একাই থাকতো?"

"এটা খতিয়ে দেখতে হবে। দোতলার ভাড়াটিয়াদের সাথে কথা বলে মনে হলো ওরা কিছু লুকাচ্ছে। আবারো ওদের সাথে কথা বলতে হবে। ভিক্টিমের হাজব্যান্ডের সাথে তো এখন কথা বলা যাবে না। ওর সাথে কথা বলাটা খুব জরুরি।"

আমি আর কিছু বললাম না। হায়দারভাই এই তদন্তের প্রায় সবগুলো দিকেই নজর রাখছেন। উনি থাকতে আমার কোনো চিন্তা নেই। আমি আস্তে করে দরজার দিকে পা বাড়ালাম।

"কই যাও?" পেছন থেকে এসএম হায়দার বললেন।

"বাইরে। আপনি কাজ সেরে আসেন।"

"লাশের সুরতহাল করবে না?"

"আপনি তো করেছেনই।" আমি আর কোনো কথা না বলে ঘর থেকে বের হয়ে গেলাম।

বাড়ির বাইরে প্রচুর লোকজন উঁকিঝুঁকি মারছে। চাপাকণ্ঠে একে অন্যের সাথে কথা বলছে প্রতিবেশীরা। সবার চোখেমুখে আতঙ্ক। বিশেষ করে বয়স্ক লোকজনের কপালে চিন্তার ভাঁজ একটু বেশি। সম্ভবত তাদের ঘরে এরকম তরুণী মেয়ে আছে। একই রকম ঘটনা তাদের পরিবারেও ঘটতে পারে।

Gronthagar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

দেশের অবস্থা ভালো নয়। দুর্ভিক্ষের কালো ছায়া এখনও তিরোহিত হয়নি। এটা নেই ওটা নেই। চারদিকে শুধু হাহাকার আর স্বপ্ন ভঙ্গের বেদনা। সেই বেদনা আবার ক্ষোভ হয়ে ছাইচাপা আগুনের মতো ফুঁসছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুবই খারাপ। যতো অপরাধ সংঘটিত হয় তার সিকিভাগের আসামিও ধরা পড়ে না। আবার যাদের ধরা হয় তাদের বিরাট একটি অংশ ক্ষমতাসীন দলের সাথে সংশ্লিষ্ট, সুতরাং উপর থেকে ফোন পেয়ে মাথা নীচু করে তাদেরকে ছেড়ে দিতে হয়। প্রতিদিনই ঘটছে এরকম ঘটনা। জনগণ অতীষ্ঠ হয়ে উঠছে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না। আশেপাশে জটলা পাকানো লোকজনের চোখেমুখে এক ধরণের চাপাঘৃণা দেখতে পেলাম আমি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পকেট থেকে ক্যাপস্টেন সিগারেট বের করে ধরালাম। এসব জানলে পুলিশের চাকরিতে ঢুকতাম না। অনেক স্বপ্ন নিয়ে গ্রাম থেকে ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম, ইচ্ছে ছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার, কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট পাস করতে না করতেই বাবা মারা গেলো, মা-তো মারা গিয়েছিলেন আমার জন্মের সময়েই। একেবারে অথৈজলে পড়ে যাওয়া যাকে বলে আমার বেলায় তাই হয়েছিলো। উচ্চাশিক্ষার স্বপ্ন বাদ দিয়ে প্রাইভেট টিউশনির টাকায় কোনো রকমে ডিগ্রি পাস করেই ঢুকে পড়ি পুলিশবাহিনীতে। সেটাও হয়েছে বাপের এক বাল্যবন্ধুর বদান্যতায়। ভদ্রলোক আমাদের এলাকায় ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী নেতা। বাল্যবন্ধুর প্রতি করুণা দেখানোর মতো একটি সহৃদয় তখনও তার ছিলো, তাই আমার এই চাকরি; আর ঢাকার মতো জায়গায় পোস্টিং।

"এখনও তুমি অভ্যস্ত হতে পারলে না," পেছন থেকে আমার পিঠে চাপড় মেরে বললেন হায়দারভাই।

আমি কোনো জবাব দিলাম না। পকেট থেকে তার জন্যে একটা সিগারেট বের করে বাড়িয়ে দিলাম।

সিগারেটটা হাতে নিয়ে বললেন, "আজ আর ধোঁয়ায় কাজ হবে না, গলা ভেঁজাতে হবে।"

"আপনি তো চান্স পেলেই খান, উসিলা খুঁজছেন কেন?" সিগারেটে টান দিয়ে বললাম।

হায়দারভায়ের একটাই দোষ–মদ্যপান। খুব সম্ভব প্রতিদিনই খান কিন্তু তার দাবি সপ্তাহে দু-তিনবারের বেশি বোতলের ছিপি খোলেন না।

"না, বউয়ের প্যানপ্যানানিতে স্টপ রেখেছিলাম কয়টা দিন, আজ মনে হচ্ছে খেতেই হবে।"

gronthagaar.blogspot.com

আমি চুপ মেরে রইলাম।

"মেয়েটার চোখদুটো দেখে কেমনজানি অস্থির অস্থির লাগছে।"

অবাক হলাম খুব। তাহলে জাঁদরেল হায়দারভায়েরও আমার মতো অবস্থা হয়!

"চিন্তা করো, মাত্র তিন মাস আগে বিয়ে হয়েছে," বলেই সিগারেটে এমন একটা টান দিলেন যেন এক টানেই পুরো সিগারেটটা শেষ করে দেবেন। একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "খুনির কাছে পিস্তল ছিলো, বুঝলে?"

অবাক হয়ে তাকালাম তার দিকে। "কিভাবে বুঝলেন? খুনি তো মেয়েটাকে গুলি করেনি?"

"দেখো, খুনটা করা হয়েছে শ্বাসরোধ করে। নাকে-মুখে অনেক ঘুষিও মারা হয়েছে।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বললেন, "আমার ধারণা মেয়েটাকে পিস্তল দেখিয়ে চুপ থাকতে বাধ্য করেছিলো খুনি, নইলে এত সহজে কাজটা সে করতে পারতো না।"

মাথা নেড়ে সায় দিলাম আমি। হায়দারভায়ের এমন লজিকে আস্থা রাখতেই হলো।

"এজন্যেই ভিক্টিম কোনরকম চিল্লাফাল্লা করেনি। যেটুকু করেছিলো সেটাও বৃষ্টি আর বজ্রপাতের আওয়াজে ঢাকা পড়ে গেছে।"

দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। অসহায়, ভীত এক তরুণিকে তারই স্বল্পপরিচিত কেউ পিস্তল দেখিয়ে চুপ থাকতে বাধ্য করছে। কিন্তু ধর্ষণের সময় মেয়েটা চিৎকার না করেও পারেনি। খুনি হয়তো মুখ চেপে ধরেছিলো। তাতেও সুবিধা করতে না পেরে গলা টিপে ধরে।

কয়েক মুহূর্তের নীরবতার পর আমি মুখ খুললাম। "এখন আমাদের কাজ কি?"

"এখানে আর কাজ নাই...লাশটা মর্গে নিয়া যাবে এখন। আজকে আর কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করে লাভ নেই, কাল আসতে হবে আবার।"

"তাহলে থানায় যাই, চলেন।"

"তুমি যাও, আমাকে একটু খেতে হবে, তারপর বাড়ি যাবো।"

"ভাবি না নিষেধ করেছে? এসব খেয়ে বাড়ি গেলে তো আবার ঝগড়া হবে।"

"আর ঝগড়া!" চোখমুখ বিকৃত করে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। "ওটা আমাদের রোজই হয়...না খেলেও হয়।"

gronthagaar.blogspot.com

আমি মাথা দোলালাম। "কেন যে আপনারা ঝগড়া করেন বুঝি না।"

"বিয়ে তো করো নাই বুঝবে কেমনে? করো না একটা, তখন বুঝবে ঠ্যালার নাম কাশেমবাবা।"

এই কাশেমবাবাটা কে, হায়দারভাইকে কখনও জিজ্ঞেস করা হয়নি। সবাই যেখানে ঠ্যালার নাম বাবাজি বলে, তিনি বলেন কাশেমবাবা। ঠিক করলাম, একদিন তার কাছে জানতে চাইবো এটা।

Gronthagaar.blogspot.com

অধ্যায় ৩

আমি অনেকক্ষণ ধরে চুপ মেরে আছি কারণ আমার সামনে যে বসে আছে তার দৃষ্টি এখন আমার অপ্রকাশিত বইয়ের পাণ্ডুলিপির উপরে। কোনো কথা না বলে রিডিংগ্লাসের ভেতর দিয়ে কয়েকটি পৃষ্ঠা পড়ে ফেললো সে। আমি কথা বলে তার মনোযোগে বিঘ্ন ঘটাতে চাইলাম না। আমার মনে হচ্ছে অনেকদিন পর এভাবে দেখা হয়ে যাওয়াটা সহজভাবে গ্রহণ করার জন্য আপাতত পড়ায় ডুবে থাকতে চাইছে। সময় নিচ্ছে হয়তো। তাতে অবশ্য আমার কোনো সমস্যা হচ্ছে না। তার মতো আমিও একটু সময় পেয়ে আড়ষ্টতা কাটিয়ে ওঠার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছি। তাছাড়া খুব কাছ থেকে অলক্ষ্যে অপলক চোখে তাকে দেখাটাও কম নয়।

তার মনোযোগ পাণ্ডুলিপির দিকে থাকলেও আমি যে তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি এ ব্যাপারে সম্ভবত সে যথেষ্ট সচেতন। মেয়েদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যে খুবই প্রখর সেটা তো প্রবাদপ্রতীম।

"আমিও অনেক বদলে গেছি, তাই না?" লেখাটার দিকে তাকিয়ে থেকেই বললো সে। তার ঠোঁটে রহস্যময় হাসি।

"খুব কম।" ছোট্ট করে বললাম।

মুচকি হেসে মাথা দোলালো, চোখ তুলে তাকালো না। "লেখালেখি করে অনেক বেশি সেনসিটিভ হয়ে গেছো নাকি বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতে শিখেছো, বুঝতে পারছি না।"

"কী জানি," আস্তে করে বললাম, আমার চোখ তার দিকেই, আর সে এখনও অক্ষরের জঞ্জালে ডুবে আছে। "হয়তো অনেক বেশি নস্টালজিক হয়ে গেছি। কিংবা ছেলেমানুষ।"

এবার রিডিংগ্লাসের উপর দিয়ে তার অন্তর্ভেদি চোখজোড়া সরাসরি আমার দিকে নিবদ্ধ করলো। মনে করলাম কিছু বলবে, কিন্তু আলতো করে মাথা দুলিয়ে দুর্বোধ্য এক হাসি দিয়ে আবারো লেখাটার দিকে মনোনিবেশ করলো সে।

"তোমার চুল খুব একটা পাকেনি," বললাম তাকে।

"কালার করি রেগুলার।" চোখ না তুলেই বললো।

gronthagaar.blogspot.com

Gronthagaar.blogspot.com

"ওজনও মনে হয় আগের মতোই আছে।"

"প্রায় কাছাকাছি বলতে পারো।"

"মুখে খুব একটা বলিরেখা পড়েনি।"

এবার মুখ তুলে তাকালো। "তাই?"

"হুম।"

আবার ফিরে গেলো পড়ায়।

"অবশ্য স্টেট্‌সে ছিলে...প্লাস্টিক সার্জারি করালেও করাতে পারো।"

আমার টিটকারিসুলভ কথাটা সহজভাবেই নিলো, মুখ টিপে হেসে মাথা দোলালো সে। "আই হেট সার্জারি...ইউ নো দ্যাট।"

মাথা নেড়ে সায় দিলাম। আমি এটা জানি। অন্তত দুই যুগ আগে তা-ই জানতাম। "আমার মনে হয় এ কথাটা আরো অনেকে বলে তোমাকে।"

"কোন্ কথাটা?" মুখ তুলে তাকালো আবার।

"এই যে, তোমার বয়স থমকে আছে।"

চোখ নামিয়ে বললো, "হুম।"

ভালো করেই বুঝলাম অনেকের কাছ থেকে এটা শুনে শুনে সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তার পড়ায় ব্যাঘাত হবে তাই আর কিছু না বলে দীর্ঘক্ষণ চুপ করে রইলাম। ঘরের আশেপাশে তাকালাম মনোযোগ দেবার জন্য কিন্তু কিছুই পেলাম না। আসবাবপত্র আর সম্মাননার ব্যাপারে আমার কোনো কালেই আগ্রহ ছিলো না। লেখক হিসেবে আমি সবার আগে পাঠক, তাই দেয়াল জুড়ে অসংখ্য বইয়ে ঠাসা বুকসেল্‌ফ আমাকে মুগ্ধ করার কথা কিন্তু আইনের মোটা মোটা বইগুলো আমার কাছে বই বলেই মনে হয় না কখনও। এজন্যে কোনো আইনজীবির চেম্বারে আমি আড্ডা দেই না। আইনের বই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি একঘেয়েমির মনে হয়। একগাদা ভীতিকর হুকুম, আদেশ-উপদেশ আর দণ্ডের ফিরিস্তি। আরো আছে প্রতিটি শব্দ আর পদবাচ্যের সংজ্ঞায় ভারাক্রান্ত হাজার-হাজার শব্দ-বাক্য। আমার মনে হয় মানুষের সৃষ্ট সবচাইতে 'যান্ত্রিক জিনিস' যন্ত্রপাতি কিংবা প্রযুক্তি নয়, এটা হলো আইন-কানুনের ভারি ভারি বইগুলো। যন্ত্রের মধ্যেও প্রচুর সৃজনশীলতা থাকে কিন্তু এগুলোতে ছিঁটেফোটাও থাকে কি-না সন্দেহ।

"আরেক কাপ চা খাবে?"

আমি একটু চমকে তার দিকে তাকালাম। "চা?"

"হুম।"

মুচকি হাসলাম। "তুমি কি আমাকে বসিয়ে রেখে পুরোটা এখানেই পড়ে শেষ করতে চাচ্ছো?"

gronthagaar.blogspot.com

যেন নিজের বালখিল্যতা বুঝতে পেরে লজ্জিত হলো সে। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, পঞ্চাশেও তার গাল দুটো আরক্তিম হয়ে উঠলো ঠিক ভরা যৌবনের মতো।

"সরি, আমি আসলে খেয়ালই করিনি। মানে–"

"আহ্, সরি বলছো কেন?" আমি তাকে থামিয়ে দিলাম। "আমার তো ভালোই লাগছে। এর আগে এতো মনোযোগ দিয়ে আমার লেখা কেউ পড়েনি, তা-ও আবার আমাকে সামনে বসিয়ে রেখে।"

মাথা দোলালো সে। মুখে এখনও সলজ্জ হাসি। কিছুটা বিব্রতও বটে। "অ্যাগেইন, আ'ম সরি। বুঝতেই পারছো, এটা মিলির খুন নিয়ে। আর তোমার লেখাটাও খুব সুন্দর হয়েছে। ঘটনাগুলো ভেসে উঠছে চোখের সামনে।"

আমি কোন কথা না বলে শুধু আলতো করে মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

"আচ্ছা, তোমার কি তাড়া আছে?" প্রসঙ্গ পাল্টালো এবার।

"না।" সত্যিই বললাম। "লেখালেখির টেবিল ছাড়া লেখকের আবার তাড়া কিসের। আমি এখন একদম ফ্রি।"

মুখ টিপে হেসে বললো, "তাহলে চলো, একসাথে বের হই। আমি একটু পরই বের হবো।"

কাঁধ তুললাম শুধু। আপত্তি জানানোর প্রশ্নই ওঠে না। দুই যুগ আগে আমি তার সঙ্গ ভীষণ কামনা করতাম।

"গুড।" পাণ্ডুলিপিটা ভ্যানিটি ব্যাগে ভরে নিলো। "আচ্ছা, বলো তো, মিলির ঘটনাটা নিয়ে কেন লিখলে?"

একটু ভেবে নিলাম। "যে ঘটনা এতগুলো মানুষের জীবন বদলে দিলো সেটা নিয়ে লিখবো না?"

রামজিয়া কিছু না বলে চেয়ে রইলো আমার দিকে।

"বহু আগেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম এটা নিয়ে," একটু থেমে আবার বললাম, "কিন্তু লেখা হয়ে ওঠেনি। ভেবেছিলাম রহস্যের কূলকিণারা করে লিখবো কিন্তু দু-বছর আগে টের পেলাম আমার স্মৃতি মুছে যাচ্ছে। বয়স হচ্ছে, দুই যুগ আগের অনেক ঘটনাই ভুলে যাচ্ছি। ডিটেইলগুলোর কথা বলছি...ভুলে যাওয়াটাই তো স্বাভাবিক, তাই না?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

"তখনই ঠিক করলাম, খুব দ্রুত এটা লিখে ফেলবো।"

"ঘটনাটা শুধু রেকর্ড করে রাখার জন্য? আই মিন, সংরক্ষণ করতে চাইছো?"

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

মাথা নেড়ে সায় দিলাম। "হ্যা, সেটা তুমি বলতে পারো। মিলিরা কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। একেবারেই সাধারণ মানুষ। ওদের কথা ইতিহাসে থাকবে না, কেউ লিখবেও না। এরইমধ্যে বিস্মৃত হয়ে গেছে সে। কিন্তু আমি এখনও বেঁচে আছি। আমি মরে গেলে আর কে লিখবে?" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, "তাই ঠিক করলাম এটা লেখার এখনই সময়।"

"হুম," সায় দিয়ে বললো রামজিয়া।

"তাছাড়া, আমি নিজেও এই ঘটনার অংশ, আমার একটা দায়বদ্ধতা আছে না?"

আবারো সায় দিলো সে।

"আমি চাই মিলির গল্পটা বেঁচে থাকুক। মানুষ জানুক। বিস্মৃতির অতলে সে হারিয়ে যাক সেটা আমি চাই না।"

"ইফ অ্যা রাইটার ফলস ইন লাভ উইথ ইউ, ইউ ক্যান নেভার ডাই," আস্তে করে বললো সে। "প্রেম বলতে অনুরাগ, অ্যাফেকশন। সাম কাইন্ড অফ ফিলিংস...যেটা তুমি ফিল করছো মিলির জন্য।"

আমি চুপ মেরে রইলাম।

"আচ্ছা, সত্যি করে একটা কথা বলবে?" তারপর আমার জবাবের অপেক্ষা না করেই বললো সে, "এই বইটা পাবলিশ হবার আগে আমাকে পড়াতে চাইছো কেন?"

কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিলাম। এর জবাব আমি আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছি, তারপরও গুছিয়ে নিতে হলো কথাগুলো। "প্রথমত এই বইয়ের একটা চরিত্র তুমি। তোমার কোনো বিষয়ে আপত্তি আছে কি-না সেটা আগেভাগে জেনে নেয়া দরকার।"

"আর?" স্থিরচোখে চেয়ে বললো সে।

কপালের বামপাশটা চুলকে নিলাম। "সম্ভব হলে মিলির হাজব্যান্ডের সাথে দেখা করতে চাই। তার অদ্ভুত আচরণের কারণটা আমি জানতে চাই।" একটু থেমে আবার বললাম, "শুধু বইয়ের জন্যই নয়, এটা আমার নিজেরও কৌতুহল।

আমার দিকে চেয়ে রইলো রামজিয়া।

gronthagaar.blogspot.com

অধ্যায় ৪

ছবি কথা বলে

মিলি খুন হবার তিনদিন পর সকালের দিকে আমাকে যেতে হলো নিহত মেয়েটির শোকাতুর স্বামির সাথে কথা বলতে। বেচারা এমনভাবে ভেঙে পড়েছিলো যে, দু-দণ্ড কথাও বলা হয়নি, অথচ এই খুনের তদন্ত কাজে এটা খুবই গুরুতপূর্ণ ছিলো।

আগের দিন রাতে থানা থেকে বের হয়ে যাবার সময়ই হায়দারভাই বলে দিয়েছিলেন আমি যেন বাসা থেকে সরাসরি ওখানে চলে যাই। অন্য একটা কাজ সেরে তিনি চলে যাবেন সেখানে। তার জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই, আমি যেন দরকারি তথ্যগুলো জেনে নেই ভদ্রলোকের কাছ থেকে। বুঝতে পারছিলাম না তিনি কেন আমাকে দিয়ে এ কাজটা করাতে চাইছেন।

যাই হোক, সকাল সকাল নাস্তা করেই আমি রওনা দিলাম আজিমপুরের ইরাকি কবরস্তানের দিকে। পথে যেতে যেতে মনে হলো মেয়েটির স্বামি যদি জিজ্ঞেস করে কেসের কি অবস্থা তাহলে কী বলবো। এখনও তো কোনো কূলকিণারাই করতে পারিনি আমরা।

এই তিনদিন হায়দারভাই আমাকে সঙ্গে নিয়ে অনেক মানুষের সাথে কথা বলেছেন, অনেক ভেবেছেন কিন্তু সামান্যতম ধারণাও করতে পারেননি কে বা কারা কি কারণে মেয়েটিকে ধর্ষণ করে খুন করলো। আস্ত একটা মদের বোতলও হায়দারভাইকে কোনোরকম সাহায্য করতে পারেনি। যদিও তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন এইসব তেতোপানি পেটে গেলে তার বুদ্ধির ঝাপি খুলে যায়। তবে আমি নিশ্চিত, এই কেসের সুরাহা না করে ছাড়বেন না তিনি। মাত্র তিনদিন হয়েছে, খুব বেশি সময় বলা যায় না। কয়েক সপ্তাহ, কিংবা মাসখানেকের মধ্যে অবশ্যই সমাধান করতে পারবেন। তাই ঠিক করলাম, মেয়েটির স্বামিকে সত্যি কথাই বলবো, কোনোরকম মিথ্যে সান্ত্বনা দেবার দরকার নেই।

১৩ নাম্বার বাড়ির সামনে এসে আমার রিক্সা থামলে দেখতে পেলাম মেইন দরজাটা খোলাই আছে। ভেতরে ঢুকে আরো অবাক হলাম। ঘরের দরজা আধভেঁজানো। এতোবড় ঘটনা ঘটে যাবার পরও কেউ সতর্ক হয়নি,

gronthagaar.blogspot.com

দরজা খোলা রেখেছে! পরক্ষণেই বুঝতে পারলাম, সতর্ক থাকার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে এখন।

আধভেঁজানো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটু দ্বিধায় পড়ে গেলাম আমি–কলিংবেল টিপবো নাকি দরজায় টোকা দেবো? ঘরের ভেতরে যে মেয়েটির স্বামি আছে সেটা আমি দরজার ফাঁক দিয়েই দেখতে পাচ্ছি। বেচারা ড্রইংরুমের সোফায় বসে মাথা ঝুঁকিয়ে একগাদা সাদা-কালো ছবি দেখছে।

অবশেষে দরজায় টোকাই দিলাম। নিহতের স্বামি একটুও চমকালো না। যেন চমকে যাবার ক্ষমতা লোপ পেয়ে গেছে তার। আস্তে করে পেছন ফিরে তাকালো সে। দরজার ফাঁক দিয়েই আমাদের চোখাচোখি হলো। লাল টকটকে চোখ। তিন-চার রাত না ঘুমানোর ফল। চোখের নীচে কালি পড়ে গেছে। স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়েছে এ-কদিনে। মাথার চুলগুলো এলোমেলো। মুখটা দেখামাত্রই খুব মায়া হলো আমার।

"আমি থানা থেকে এসেছি।" যদিও এটা বলার দরকার ছিলো না। আমার পুলিশের ইউনিফর্মটাই যথেষ্ট।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিধ্বস্ত মানুষটা আমাকে ভেতরে আসার জন্য ইশারা করলো।

"আপনার সাথে একটু কথা বলার দরকার ছিলো," ঘরে ঢুকে বললাম।

লোকটা আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। "ঐদিন তো একজন কথা বলেছিলো...কী সব উল্টাপাল্টা প্রশ্ন করেছিলো!"

এবার বুঝতে পারলাম কেন হায়দারভাই আমাকে দিয়ে এ কাজটা করাতে চেয়েছেন। ঐদিন আমি ঘটনাস্থলে পৌছার আগে হায়দারভাই নিশ্চয় নিহতের বিপর্যস্ত স্বামিকে চাছাছোলা প্রশ্ন করে বিগড়ে দিয়েছিলেন।

"উনার কথা বাদ দিন," বললাম তাকে। "উনি আসলে সবার সাথে এভাবেই কথা বলেন।"

মিলির স্বামি মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"আমি জানি আপনার মানসিক অবস্থা ভালো নেই কিন্তু এই কেসে আপনার সাথে কথা বলাটা খুবই জরুরি, তাই–"

"বসুন," আমার কথা শেষ করার আগেই আস্তে করে বললো ভদ্রলোক।

মাথার টুপিটা খুলে একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। ভদ্রলোক কতোগুলো সাদা-কালো ছবি দেখছে। একটু চোখ বুলিয়েই বুঝতে পারলাম বেশিরভাগই তাদের বিয়ের সময় তোলা।

gronthagaar.blogspot.com

"তিনমাস আগে আমাদের বিয়ে হয়েছে," একটা ছবি তুলে বললো মেয়েটির স্বামি।

আমি কিছু বললাম না।

"এই ছবিগুলোই তার শেষ ছবি।" ছড়িয়ে থাকা তিন-চারটা ছবি তুলে বললো এবার। "গতমাসে ওর এক কাজিনের বিয়ে হয়, আমি গায়ে হলুদে যেতে পারিনি। ব্যাঙ্কে খুব চাপ ছিলো তখন। গুজব ছিলো, সরকার পাঁচ শ' টাকার নোট ব্যান্ড করবে। দম ফেলারও সময় ছিলো না আমাদের।"

লোকটা আমার জন্য অপেক্ষা না করেই বলে যেতে লাগলো। বুঝতে পারলাম তার মানসিক অবস্থা এখন ভিন্ন এক স্টেজে চলে এসেছে–ঝড়ের পর লণ্ডভণ্ড প্রকৃতি যেমন শান্ত আর থিতু হয়ে যায় ঠিক সেরকম। সে কথা বলছে বেশ মিনমিনে গলায়। যেন আপন মনে বলে যাচ্ছে। শরীরের দূর্বলতা কণ্ঠে প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে। একটা ঘোরের মধ্যে আছে এখনও।

"বাসায় কেউ নেই?"

আমার প্রশ্নটা শুনে ফ্যালফ্যাল চোখে চেয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। বুঝতে পারলাম, শোকার্ত লোকটি অন্যভাবে নিয়েছে কথাটা।

"যে ছিলো সে তো নেই! আর কে থাকবে? কেউ না। আমার আর কেউ রইলো না।" শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো ছবিগুলোর দিকে।

আমি ভয় পেয়ে গেলাম, এই বুঝি কান্নাকাটি শুরু করে দেবে। শিশুদের কান্নাই আমি সামলাতে পারি না, বড়দের কান্না দেখলে রীতিমতো অসহায় বোধ করি। কিন্তু আমাকে বাঁচিয়ে দিয়ে লোকটা নিজের কান্না দমিয়ে রাখলো।

"আমার মনে হয় আপনার এখন আত্মীয়স্বজনের মাঝে থাকা উচিত। এভাবে একা থাকা ঠিক হচ্ছে না।"

আমার কথায় কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালো না। ছবিগুলো থেকে মুখ সরিয়ে নিলো। নিজেকে ফিরে পাবার জন্য চুপ থাকলো কিছুক্ষণ, তারপর মুখ তুলে তাকালো আমার দিকে। "আমার বড়ভাই বলছিলো আমাকে বাদি হয়ে কেস করতে হবে...সেটা কি কাল-পরশু করা যাবে না?"

কাজের কথা শুরু করাতে আমি খুশিই হলাম। "এ নিয়ে ভাববেন না, কাল-পরশু করলেও কোনো সমস্যা হবে না।"

"দেরি করাটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না...তদন্ত করতে দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

আমি আশ্বস্ত করার হাসি দিলাম। "না, তা হচ্ছে না। আমাদের তদন্ত আমরা অলরেডি শুরু করে দিয়েছি।"

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

লোকটার চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠলো। "কিছু বের করতে পারলেন?"

"আমার সিনিয়র অফিসার এটা তদন্ত করছে, আমি তার সহকারী। আসামিকে ধরার ব্যাপারে উনি খুবই কনফিডেন্ট।" আমি দ্রুত বলে গেলাম নিহতের স্বামিকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে।

"যেভাবেই পারেন ওই শূয়োরটাকে ধরেন।" লোকটা এক হাতের মুঠি শক্ত করে তুলে ধরলো।

মাথা নেড়ে সায় দিলাম আমি। "এ নিয়ে আপনি ভাববেন না, খুনিকে অবশ্যই ধরবো আমরা। ওকে ফাঁসিতে ঝুলতেই হবে।"

স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, ভিক্টিমের স্বামি আমার এ কথা শুনে খুশি হতে পারলো না। আমার দিকে কেমন দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রইলো। "ফাঁসি!?" অস্ফুটস্বরে বলে উঠলো সে।

"যে কাজ সে করেছে ফাঁসিই তার একমাত্র শাস্তি।"

আমাকে অবাক করে দিয়ে ভদ্রলোক মাথা দোলালো আক্ষেপে। "না, না!" চোখ বন্ধ করে ফেললো কয়েক মুহূর্তের জন্য। "ফাঁসি দেয়া চলবে না!"

সত্যি বলতে কথাটা শুনে আমি যারপরনাই অবাক হয়েছিলাম। এমন কথা জীবনেও শুনিনি। নিহতের স্বামি খুনির ফাঁসি চাইছে না!

"ঐ হারামজাদাকে সারা জীবন জেলে পচিয়ে মারতে হবে!"

আমি কী বলবো বুঝতে পারলাম না। যেখানে খুন হলেই নিহতের পরিবার-পরিজন আর আত্মীয়-স্বজনেরা 'ফাঁসি চাই-ফাঁসি চাই' বলে দাবি তোলে সেখানে এই লোক চাইছে যাবজ্জীবন!

"ফাঁসি দিলে তো সে কিছুই টের পাবে না," আবারো আক্ষেপে মাথা দোলালো মিলির স্বামি। "আমি শুনেছি, ফাঁসি দিলে খুব একটা মৃত্যুযন্ত্রণা হয় না। দ্রুত মৃত্যু হয়, টেরই পায় না। কিছু বোঝার আগেই সব শেষ হয়ে যায়। মিলি কিন্তু খুব যন্ত্রণা পেয়ে মারা গেছে। ওকে অনেক কষ্ট দিয়েছে হারামজাদা। অনেক!" মন্ত্রতাড়িত হয়ে একটা ঘোরের মধ্যে ডুবে কথাগুলো বলে গেলো।

আমি চুপ রইলাম।

"আপনারা ওই হারামজাদাকে সারাজীবন জেলে পচিয়ে মারবেন, ঠিক আছে?"

বেচারার মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরেও বললাম, "বিচার করবেন আদালত, আমরা না। যে কাজ সে করেছে, ঠিকমতো প্রমাণ করতে পারলে

gronthagaar.blogspot.com

নির্ঘাত ফাঁসি হবে। তবে অনেক সময় এরকম কেসে সবকিছু প্রমাণিত হবার পরও আদালত যাবজ্জীবন শাস্তি দিয়ে থাকে," কাঁধ তুললাম আমি। "সেটা অবশ্য আদালতই ভালো বুঝবেন। আমাদের কাজ হলো অপরাধিকে ধরা, সাক্ষি-প্রমাণ জোগাড় করা। আমরা এখন খুনিকে ধরার জন্যই চেষ্টা করে যাচ্ছি।"

"ধরা তাকে পড়তেই হবে," মিলির স্বামি হাত মুঠো করে দাঁতে দাঁত পিষে বলে উঠলো।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম। "অবশ্যই ধরবো তাকে, আর সেজন্যেই তো আপনার সাহায্য আমাদের দরকার।"

এ কথায় কাজে দিলো। ভদ্রলোক নড়েচড়ে উঠলো। "বলুন, আমাকে কি করতে হবে? আমি সব করতে রাজি আছি। সব!"

আমি কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে তদন্তকারী কর্মকর্তার মতো করে বলতে শুরু করলাম : "আমাদের ধারণা খুনি আপনাদের পরিচিত কেউ হবে। এটাই আমাদের প্রাথমিক অনুমান।"

নিহতের স্বামি স্থিরচোখে চেয়ে রইলো আমার দিকে। তার অভিব্যক্তি দেখে কিছুই বুঝতে পারলাম না।

"এই খুনের ব্যাপারে আপনি কি কাউকে সন্দেহ করেন?"

ভদ্রলোক একটু ভেবে অপারগতা জানিয়ে আল্‌তো করে মাথা দোলালো। "আমার সাথে কারোর এমন কোনো খারাপ সম্পর্ক নেই যে এরকম জঘন্য কাজ করবে। অসম্ভব!"

"আপনার হয়তো নেই কিন্তু আপনার ওয়াইফের থাকতে পারে না?"

ভদ্রলোক আবারো ভাবনায় ডুবে গেলো। তার চোখের মণি দুটো ডানে-বামে দুলছে। বিক্ষিপ্ত। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে। "না।" খুবই দুর্বল কণ্ঠে বললো, তারপর কাঁধ তুলে এমন একটা ভঙ্গি করলো যেন সে নিজেও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না কী বলবে। "আসলে জোর দিয়ে বলতে পারছি না। জানেনই তো, কয়েক মাস আগে বিয়ে...এই অল্প সময়ে একজন মানুষের কতোটুকুই বা জানা সম্ভব।"

"আপনাদের বিয়েটা কি সেটেল্‌ড ম্যারেজ ছিলো?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ভদ্রলোক।

"আপনার ওয়াইফ কি কখনও আপনাকে এমন কারোর কথা বলেছিলেন, কেউ তার ক্ষতি করতে পারে? কিংবা তার সাথে সম্পর্ক খারাপ, এমন কারোর কথা?"

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

ঠোঁট উল্টে মাথা দোলালো নিহতের স্বামি। "না।"

আমি একটু থেমে ভেবে নিলাম। "এখানে এই বাসায় কতোদিন ধরে উঠেছেন?"

"বিয়ের পর পরই...দু-মাসের বেশি হবে না।"

"এর আগে কোথায় থাকতেন?"

"আমার বাবা-মা নেই, বড়ভায়ের কাছে মানুষ হয়েছি। বিয়ের পর পর কিছুদিন উনার বাসায়ই ছিলাম...মোহাম্মদপুরে। তারপর এখানে এসে উঠি।"

"এই এলাকার কারোর সাথে কি আপনার কিংবা আপনার ওয়াইফের কোনো রকম ঝামেলা হয়েছিলো কখনও? মানে, একেবারেই সামান্য কোনো ঘটনা, হয়তো আপনার কাছে সেটা তুচ্ছ মনে হতে পারে, খুবই ছোটোখাটো কোনো ব্যাপার নিয়ে কারো সাথে...?"

আমার কথা শেষ হবার আগেই ভদ্রলোক মাথা দোলাতে লাগলো। "না, না। এরকম কিচ্ছু হয়নি। হবার প্রশ্নই ওঠে না। আমরা দু-জন খুবই নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। আর মিলি এতো মিশুক স্বভাবের...সবার সাথে ওর ভালো সম্পর্ক। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের কাছে ও খুবই পপুলার।"

"আচ্ছা, ঘটনার কয়েক দিন আগে থেকে কি কাউকে আপনার বাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করতে দেখেছেন? কারোর আচরণে কি সন্দেহজনক কিছু খেয়াল করেছেন?"

মাথা দুলিয়ে সরাসরি জবাব দিলো ভদ্রলোক।

"আপনার এই বাড়িতে নিয়মিত আসা-যাওয়া করে এরকম কোনো আত্মীয়স্বজনের কথা বলতে পারেন?"

মুখ তুলে তাকালো আমার সামনে বসে থাকা বিপর্যস্ত মানুষটি। "ওর এক বোন আর বান্ধবি মাঝেমধ্যে আসতো।"

"আমি পুরুষ মানুষের কথা বলছি।"

আবারো মাথা দুলিয়ে নেতিবাচক জবাব দিলো সে। "না। আমার বড়ভাই যে-কদিন এসেছে বউ-বাচ্চা নিয়েই এসেছে। আর সব সময়ই এসেছে ছুটির দিনে। রবিবার। আমিও তখন বাসায় ছিলাম।"

"আচ্ছা," আবারো ভেবে নিলাম এরপর কি বলবো। "এই বাড়ির দোতলায় যে ফ্যামিলি থাকে তাদের সাথে আপনাদের সম্পর্ক কেমন?"

"আমার সাথে হাই-হ্যালো সম্পর্ক। বুঝতেই পারছেন, সারাদিন অফিসে থাকি, খুব একটা দেখাও হয় না। তবে ওর সাথে খুব ভালো সম্পর্ক ছিলো। আমি অফিসে চলে যাবার পর দিনের বেশিরভাগ সময়ই দোতলায় কাটাতো।

gronthagaar.blogspot.com

দোতলার ভদ্রলোক সাধারণ বীমায় চাকরি করেন। উনার ওয়াইফ স্কুলটিচার। একটামাত্র বাচ্চা, ক্লাস টু-তে পড়ে। ভদ্রলোকের বৃদ্ধ মা আছেন। উনাদের সাথে মিলির সম্পর্ক খুবই ভালো ছিলো।”

আমি চুপ থেকে ভদ্রলোককে আরো কথা বলার সুযোগ করে দিলাম।

“ব্যাঙ্ক থেকে একটু দেরি করে সন্ধ্যার পর ফিরলেই দেখতাম মিলি আর ঐ বাচ্চাটা ঘরে বসে টিভি দেখছে। ওদের ঘরে তো টিভি নেই তাই বাচ্চাটা সন্ধ্যার পরই এখানে চলে আসতো।”

এই বিষয়টা হায়দারভাইও ভেবে দেখেছেন। তার মতে দোতলার বাচ্চাটা কিছু দেখেছে কিন্তু তার বাবা-মা এটা স্বীকার করতে চাইছে না। ওদের সাথে কথা বলে তার এরকম ধারণা হয়েছে। বাচ্চাটার মা-বাবা চাইছে না তাদের সন্তানকে পুলিশ এটা-ওটা জিজ্ঞেস করুক। কিংবা হতে পারে খুনোখুনির মতো ঘটনা বলে জড়াতে চাইছে না কোনোভাবে। হায়দারভাই বাচ্চাটার সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ওর মা-বাবা বলেছে এই বাড়িতে খুন-খারাবির মতো ঘটনা ঘটে গেছে বলে তারা বাচ্চাটাকে আপাতত কয়েকদিনের জন্যে নানার বাসায় রেখে এসেছে।

“ও খুব ছবি তুলতো।”

কথাটা শুনে আমি সম্বিত ফিরে পেয়ে দেখি নিহতের স্বামি দু-তিনটা ছবি হাতে নিয়ে উদাস হয়ে চেয়ে আছে।

“যেকোনো অনুষ্ঠানে গেলেই ছবি তুলে রাখতো। হানিমুনেরও অনেক ছবি আছে আমদের,” ভদ্রলোক অনেকটা আনমনে বলে গেলো। একের পর এক ছবি তুলে দেখছে সে। “চোখে কাজল না দিয়ে কখনও ছবি তুলতো না।” কথাটা বলেই আমার দিকে একটা ছবি বাড়িয়ে দিলো।

আমি ছবিটা হাতে তুলে নিলাম। এটা সম্ভবত বিয়ের পরের কোনো ছবি। ঐ সময় রঙ্গিন ছবি ছিলো স্বপ্নের ব্যাপার। প্রায় সবাই সাদা-কালো ছবি তুলতো। নিহত মেয়েটার যতো ছবি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ড্রইংরুমে তার সবগুলোই সাদা-কালো। হাতের ছবিটা ভালো করে দেখার আগেই আমার দিকে আরেকটা ছবি বাড়িয়ে দিলো মেয়েটির স্বামি।

পুরনো একটি ছবি। কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের সময়কার হবে। চোখে টানা টানা কাজল দেয়া। অসম্ভব সুন্দর চোখ। মেয়েটা খুন হবার পরও তার চোখে মৃত্যু-আতঙ্ক এই সৌন্দর্য তিরোহিত করতে পারেনি। তখনও মেয়েটির চোখে কাজল দেয়া ছিলো, তবে সেটা ধর্ষক-খুনির জন্যে নয়, নিশ্চয় অফিসফেরত স্বামির জন্য। কিংবা কে জানে!

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

"বললাম না, কয়েক দিন আগে ওর এক কাজিনের বিয়ে হয়েছিলো, তখনও অনেক ছবি তুলেছে," ভদ্রলোক চার-পাঁচটা ছবি বাড়িয়ে দিয়ে বললো।

ছবিগুলো হাতে নিয়ে দেখে গেলাম। মেয়েটির জীবনের শেষ কিছু ছবি। সব ছবিতেই সে হাসছে। হয় মুখে হাসি এঁটে নয়তো চোখ দিয়ে। একদঙ্গল ছেলে-মেয়ের সাথে তোলা। গায়েহলুদের আনন্দঘন পরিবেশ। কোনো সিঙ্গেল ছবি নেই। সবই গ্রুপ ফটোগ্রাফি। প্রতিটি ছবিতেই ভিক্টিম মেয়েটিকে খুব সহজেই চেনা যাচ্ছে তার দুর্দমনীয় সৌন্দর্য আর ব্যক্তিত্বের কারণে। ছবির আর কোনো মেয়েই তার মতো সুন্দর করে চোখে কাজল দেয়নি। পোশাকে, ব্যক্তিত্বে তার মতো আর কেউ নেই।

এক এক করে ছবিগুলো দেখতে গিয়ে থমকে গেলাম।

না। আরেকজন আছে!

আমার হাতের শেষ ছবিটি গ্রুপ ফটোগ্রাফি নয়-ভিক্টিম আর তার এক বান্ধবির ছবি। দুটো মেয়েই দেখতে অসাধারণ। তাদের মধ্যে মিলগুলো বেশ চোখে পড়ার মতো। চোখে কাজল, বেশভূষা, ব্যক্তিত্ব আর সৌন্দর্যে তারা একে অন্যের সাথে কঠিন প্রতিযোগিতা করছে যেন।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে রইলাম ছবিটার দিকে।

"ওর সবচাইতে ক্লোজ ফ্রেন্ড।"

নিহতের স্বামির কথায় মুখ তুলে তাকালাম। দেখি আমার হাতের ছবির দিকে ঝুঁকে আছে ভদ্রলোক।

"আপনি হয়তো ভাবছেন ওরা দুই বোন...ওদের দেখলে সবাই এরকমই মনে করে।"

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে আবারো ফিরে গেলাম ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সাদা-কালো ছবিগুলোর দিকে। নিহত মিলির স্বামির শোকাতুর কথাবার্তা আর আক্ষেপের দিকে আমার কোনো মনোযোগ নেই, আমার সমস্ত মনোযোগ এখন একগাদা ছবির দিকে। সম্ভবত ভদ্রলোকও সেটা টের পেয়ে কথা বলা বন্ধ করে দিলো। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেলাম আমার দিকে তাকিয়ে আছে সে।

একটা ছবি তুলে নিলাম। গায়েহলুদের আরেকটি গ্রুপ ছবি। অনেকেই আছে ছবিতে। দুই সারিতে কমপক্ষে দশ-বারোজন তো হবেই। নিহত মিলি আছে সবার সামনে, একেবারে মাঝখানে। ছবির পেছনের সারির একেবারে ডানদিকে দাঁড়িয়ে আছে এক তরুণ। তার চোখ আর সবার মতো ক্যামেরার

gronthagaar.blogspot.com

দিকে নিবদ্ধ নয়। সে চেয়ে আছে তার ডানদিকে। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে তার দৃষ্টি মিলির দিকেই নিবদ্ধ। মিলির মতো সুন্দরি মেয়েদের দিকে কেউ এভাবে তাকাতেই পারে, এতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু পর পর তিন-চারটা গ্রুপ ছবিতেই যখন একই চিত্র দেখা যাচ্ছে তখন আর স্বাভাবিক বলার কোনো উপায় থাকে না। অন্তত আমার কাছে এটা স্বাভাবিক মনে হয়নি। কেন মনে হয়নি সেটা হয়তো বুঝিয়ে বলতেও পারবো না। এটা এক ধরণের অনুভূতি।

আমি এরকম একটা গ্রুপ ছবি নিয়ে মিলির স্বামিকে দেখালাম। "এই ছেলেটা কে?"

মিলির স্বামি ছবিটা ভালো করে দেখে মাথা দোলালো। "আমি চিনি না। হয়তো মিলির কোনো আত্মীয় হবে," ছবিটা উল্টে অন্যপিঠের সাদা অংশটা দেখলো। "মিলি সব ছবিতেই নাম আর তারিখ লিখে রাখে কিন্তু এখানে কিছু লেখা নেই।"

আমি চুপ মেরে রইলাম। আমার মন তখন অনেক কিছু ভেবে যাচ্ছে। উটকো মেহমান! খুনি ভিক্টিমের পরিচিত!

"হয়তো সময় পায়নি," ভদ্রলোক বললো। "ছবিগুলো মাত্র গত সপ্তাহেই প্রিন্ট করা হয়েছে।"

আরেকটা গ্রুপ ছবি তুলে নিলাম। একই চিত্র। মিলির দিকে আড়চোখে চেয়ে আছে ঐ যুবক। আমার কেনজানি মনে হলো তার চোখে লাম্পট্য আর লালসা।

"একে চিনতে পারে এরকম কেউ আছে?"

মিলির স্বামি একটু অবাকই হলো। "সম্ভবত রামজিয়া চিনতে পারবে। মিলির সবচাইতে ঘনিষ্ঠ বান্ধবি...ও-ই বেশিরভাগ ছবি তুলেছে।" ভদ্রলোক সেই ডুয়েট ছবিটা তুলে নিলো একটু আগে যে ছবিটা আমি অপলক দৃষ্টিতে দেখছিলাম। "এই যে, রামজিয়া। বেশ বড়লোকের মেয়ে। মিলি আর ও একসাথেই পড়াশোনা করেছে।"

এবার আমি ছবিটার দিকে বিশেষ নজর দিলাম না, সরাসরি কাজের কথায় চলে এলাম। মিলির ঘনিষ্ঠ কোনো বান্ধবির সাথে কথা বলা দরকার। এখন সেটা আরো জরুরি হয়ে পড়েছে।

"এই মেয়ের সাথে যোগাযোগ করা যায় কিভাবে?"

মিলির স্বামি পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে মিনি-সাইজের ফোনবুক বের আনলো। "ও থাকে ধানমণ্ডিতে...বারো নাম্বারে।" পাতা উল্টে গেলো

gronthagaar.blogspot.com

সে। "বাসার একজ্যাক্ট ঠিকানাটা আমি বলতে পারছি না তবে ওর ফোন নাম্বার আছে আমার কাছে।" ভদ্রলোক নির্দিষ্ট পাতাটি পেয়ে গেলে মুখ তুলে তাকালো। "নাম্বারটা লিখে নিন।"

আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার নোটবুকে টুকে রাখলাম নাম্বারটা, তারপর কী যেন মনে করে উঠে দাঁড়ালাম। "আমি কি এই ছবিটা নিতে পারি?" পিকনিকের গ্রুপ ফটোর একটা হাতে নিয়ে বললাম। "কাজ শেষে হলে আবার ফেরত দিয়ে দেবো।"

"নিন, কোনো সমস্যা নেই। আমার কাছে নেগেটিভ আছে," মিলির স্বামি বললো।

উঠে দাঁড়ালাম আমি, ছবিটা পকেটে ভরে হাত বাড়িয়ে দিলাম। ভদ্রলোক আমার সাথে যন্ত্রের মতো করমর্দন করলো। তার হাত-দুটো মৃত-মানুষের মতোই ঠাণ্ডা আর ঘামে ভেঁজা।

"ধন্যবাদ, মিনহাজসাহেব।"

Gronthagaar.blogspot.com

অধ্যায় ৫

রামজিয়া গাড়ি চালাচ্ছে আর আমি বসে আছি তার পাশে। রাস্তার লোকজনের তাকানোর ভঙ্গি দেখে বুঝতে পারলাম এ শহরের লোকজন এখনও কোনো মেয়েকে গাড়ি চালাতে দেখলে স্বাভাবিকভাবে নিতে পারে না। অনেকে আবার আমার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে যেন আমি কোনো পুরুষই না! ব্যাটা মানুষ হয়ে গাড়ি না চালিয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে, আর গাড়িটা চালাচ্ছে কি-না এক বেটি!

আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, তাদের মনে এ-কথাগুলোই প্রতিধ্বণিত হচ্ছে। ব্যাপারটা বেশ উপভোগ্য আমার কাছে। রামজিয়া কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমাকে জানি না। জিজ্ঞেস করার প্রয়োজনও মনে করিনি। আজ এতো বছর পর দেখা, একটুখানি সময় কাটাতে পারলে মন্দ কি!

"গল্পটা কি মিলির খুন নিয়েই? মানে শুধুই ওই ঘটনাটা নিয়ে লিখেছো?" রাস্তা থেকে চোখ সরিয়ে চকিতে আমার দিকে তাকালো সে।

"ঠিক তা নয়।"

"তাহলে? তোমার অটো-বায়োগ্রাফি?"

হেসে মাথা দোলালাম। "না, তা-ও নয়।"

"বাট দিস ইজ নট অ্যা ফিকশন, আই গেস?" রাস্তায় চোখ রেখেই বললো সে।

"অবশ্যই ফিকশন। আমি এখন পর্যন্ত নন-ফিকশন কিছু লিখিনি, লিখতেও পারি না।" একটু থেমে আবার বললাম, "এটাকে বলতে পারো সত্যি ঘটনা অবলম্বনে লেখা ফিকশন।"

পাশ ফিরে আমার দিকে তাকালো সে। তার বাম ভুরুটা একটু উপরে উঠে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে আবার নজর দিলো সামনের রাস্তার দিকে। "সবটাই কি সত্যি ঘটনা নাকি কিছু ফিকশনও রয়েছে?"

কয়েক মুহূর্ত চুপ মেরে রইলাম। এ প্রশ্নের জবাব দেয়াটা একটু কঠিনই। যা লিখেছি সবটাই সত্যি কিন্তু সেগুলোর সবই আমার নিজের চোখে দেখা ঘটনা। আমি যেভাবে দেখেছি, অনুভব করেছি, বুঝেছি তা-ই লিখেছি। এরমধ্যে অনেক কিছুই আছে যা একান্তই আমার নিজস্ব ভাবনা। অনেক কিছুই আছে আমার নিজস্ব বোধ থেকে উৎসারিত। আমি ছাড়াও এ

gronthagaar.blogspot.com

গল্পে অনেক চরিত্র আছে–তাদেরকে আমি আমার দৃষ্টিতেই চিত্রিত করেছি। তাদের মনোভাবের বিষয়টা সত্যি বলতে আমার নিজেরই।

"কঠিন প্রশ্ন করে ফেললাম নাকি?"

রামজিয়ার কথায় একটু চমকে উঠলাম। "না। ভাবছি, কী বলবো। আসলে আমি সজ্ঞানে ফিকশনাল কিছু লিখিনি, সত্যি ঘটনাটাই লিখেছি। তবে সেটা আমার চোখ দিয়ে, আমার দৃষ্টিকোণ থেকে। এর সবটা হয়তো সত্যি নয়, কিছু কল্পনাও আছে।"

"হুম, বুঝেছি," রাস্তার দিকে চোখ রেখেই বললো সে।

আমি জানি না সে কি বুঝতে পেরেছে। কয়েক মুহূর্ত চুপ থাকলাম আবারো।

"আমাকে কিভাবে প্রেজেন্ট করেছো?"

জানতাম এই প্রশ্নটা সে করবেই।

"আমি কি তোমার এই লেখায় পুরোপুরি ফ্যাকচুয়াল নাকি ফিকশনাল?"

রাস্তা থেকে চোখ না সরালেও আমি তার মুখের বাঁকাহাসিটা ঠিকই দেখতে পেলাম। যে মানুষটার সাথে সর্বসাকুল্যে মাত্র কয়েক মাসের পরিচয়, হাতেগোনা কয়েকবার দেখা-কথাবার্তা, তারপর দীর্ঘ দুই যুগ কোনো যোগাযোগ না থাকা–তাকে আর যাই-ই হোক বাস্তব বলার কোনো উপায় নেই। সে তো গল্প-উপন্যাসের চরিত্রের চেয়েও দূরবর্তি!

অবশেষে আস্তে করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, "পড়লেই বুঝতে পারবে।"

"পড়বো তো অবশ্যই, জাস্ট জানতে ইচ্ছে করছে, না বলতে চাইলে ইনজিস্ট করবো না।"

আনমনেই মাথা নেড়ে সায় দিলাম। চকিতে আমার দিকে তাকালো সে কিন্তু চোখে চোখ পড়ার আগেই রাস্তার দিকে ফিরে গেলো।

"আমি আগে তোমার কোনো লেখা পড়িনি, শুনেছি তুমি ক্রাইম-ফিকশন লেখো। এটাও কি সে-রকম কিছু?"

"উমমম...বুঝতে পারছি না।"

আমার দিকে চোখ গোল গোল করে তাকালো সে। এরকম চাহনি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াদেরই বেশি মানায়। "তুমি নিজেই বুঝতে পারছো না, তাহলে পাঠক কী বুঝবে?"

মুচকি হাসলাম। সঙ্গত প্রশ্নই করেছে। "আসলে, যে-রকম ক্রাইম-ফিকশন আগে লিখেছি এটা ঠিক সে-রকম নয়। এখানে কোনো টুইস্ট নেই,

gronthagaar.blogspot.com

নাটকিয় উপাদানও নেই। শুধুই ট্র্যাজেডি।" একটু থেমে যোগ করলাম, "আর সন্দেহ।"

কয়েক মুহূর্ত ভেবে বললো, "ইনভেস্টিগেশনটা...আই মিন, মিলির কেসটা নিয়ে যে তদন্ত করেছিলে তোমরা সেটা ডিটেইল আছে তো এখানে?"

"হ্যা।" ছোট্ট করেই বললাম।

"দেন আ'ড লাভ টু রিড ইট।"

মুচকি হাসলাম আমি।

"স্টেট্‌সে কিন্তু ক্রিমিনাল ল-ই প্র্যাকটিস করতাম।"

আমি তার ইন্টারভিউ পড়ে এটা জেনেছি। "তা, ক-জন ক্রিমিনালকে বাঁচিয়েছো এ পর্যন্ত?" হালকাচালে বললাম।

আমার দিকে না তাকিয়েই ভুরু কুচকে ফেললো সে। "হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দ্যাট?"

"ক্রিমিনাল ল-ইয়ার ছিলে, নিশ্চয় ক্রিমিনালরাই আসতো তোমার কাছে। কাড়ি কাড়ি টাকা ঢেলে বলতো, ম্যাম, সেভ মাই অ্যাজ!"

হি-হি-হি করে হেসে উঠলো রামজিয়া। তার অট্টহাসিটাও আগের মতোই আছে। "ইয়েস, আই ইউস্‌ড টু সেভ লটস অব অ্যাজেস!"

মাথা নেড়ে সায় দিলাম আমি।

গাড়িটা ধানমণ্ডির একটি বাড়ির সামনে থামলে আমি অবাক হয়ে দেখলাম সময় যেন থমকে দাঁড়িয়ে আছে আমার চোখের সামনে।

Gronthagar.blogspot.com

* * *

পুলিশের জিপ থেকে নেমে রামজিয়াদের দোতলা বাড়িটার দিকে তাকালাম। অভিজাত পাড়ার অভিজাত একটি বাড়ি।

সদ্যস্বাধীন হওয়া দেশ। চারদিকে হাহাকার। কিন্তু এই বিক্ষুব্ধ সময় আর বঞ্চনা সারাদেশ গ্রাস করলেও এ শহরের কিছু এলাকায় প্রবেশ করতে পারেনি। তারা যেন বানের জলে ডুবে থাকা অঞ্চলের মধ্যে ভাসমান কিছু গেরস্থ বাড়ি! কিংবা চারপাশের পঙ্কিলতা থেকে বিচ্ছিন্ন নিরাপদ কোনো *ঘেট্টো*!

মিনহাজের বাসা থেকে আমি চলে এসেছিলাম আজিমপুর থানায়। হায়দারভাই যে কোথায় গেছে কে জানে। শুনলাম তখনও থানায় আসেননি। দুপুরের খাওয়ার পর হাতে তেমন কোনো কাজ না থাকায় আমি মিনহাজের

gronthagaar.blogspot.com

দেয়া নাম্বারে ডায়াল করি। যাকে খুঁজছিলাম সে-ই ফোনটা ধরে। তার ছবি দেখে মুগ্ধ ছিলাম, কণ্ঠ শুনে একেবারে কুপোকাত হয়ে গেলাম। এমন কণ্ঠের নারীর জন্যই তো যুবকেরা অপেক্ষা করে।

তাকে সংক্ষেপে বললাম তার তোলা গায়েহলুদের ছবিগুলোর মধ্যে একজনের নাম-পরিচয় জানতে চাইছি। আমার বর্ণনা শুনে সে চিনতে পারলো না। সেটাই স্বাভাবিক। ছবিতে একজন মিলির দিকে তাকিয়ে ছিলো? কে হতে পারে? ছবিটা দেখলে হয়তো চিনতে পারবে। রামজিয়া নামের মেয়েটি যখন বুঝতে পারলো আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসটি তার বান্ধবির হত্যাকাণ্ডের তদন্তের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তখন প্রত্যাশার চেয়েও বেশি সাড়া দিয়ে তার বাড়িতে চলে আসতে বললো আমাকে। বিকেলে সে ফ্রি আছে। সমস্যা না থাকলে আজই চলে আসতে পারি তার বাসায়।

পুলিশের জিপটা ওদের ধানমণ্ডির বাড়ির বাইরে রেখেই আমি মেইন দরজায় গিয়ে দারোয়ানকে বললাম রামজিয়ার কথা। পুলিশের ইউনিফর্ম দেখে দারোয়ান আমাকে সমীহ করলেও বলামাত্রই ভেতরে ঢুকতে দিলো না, ভেতরে গিয়ে অনুমতি নিয়ে ফিরে এলো, সঙ্গে করে নিয়ে এলো এক কাজের লোককে। ঐ কাজের লোকের সাথে আমি চলে গেলাম নীচতলার ড্রইংরুমে, তবে সেখানে খুব বেশিক্ষণ বসে থাকতে হলো না আমাকে।

বেলবটম ফুলপ্যান্ট আর শর্ট-কামিজ পরা মোহনীয় এক তরুণী ড্রইংরুমে ঢুকতেই বুঝতে পারলাম এই সেই কিন্নরীকণ্ঠী। সত্যি বলতে, এর আগে এমন আপ-টু-ডেট মেয়ে পথেঘাটে দেখলেও তাদের সাথে কখনও আমার কথা হয়নি।

হ্যা, আপ-টু-ডেট! তখন স্মার্ট আর আধুনিক মেয়েদেরকে লোকজন এটাই বলতো।

"একটু আগে কি আপনার সাথেই আমার কথা হয়েছিলো?"

আমি টের পেলাম টেলিফোনের চেয়েও বাস্তবে তার কণ্ঠ অনেক বেশি মোহনীয়। "জি।" ছোট্ট করে বললাম।

"ফোনে আপনার গলা শুনে মনে হয়েছিলো খুব বয়স্ক একজন," বলেই আল্‌তো করে হাসলো।

এটাকে আমার প্রশংসা হিসেবেই দেখা উচিত ছিলো কিন্তু সত্যি বলতে, ঐ সময় আমি একটু অন্য ভাবনায় ডুবে ছিলাম। আমার মনে হচ্ছিলো সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি হয়তো ভাবছে টেলিফোনে যার সাথে কথা বলেছে সে আমি নই।

gronthagaar.blogspot.com

আমার পাশে একটা সোফায় বসে পড়লো সে। ধনী আর অভিজাত পরিবারের অন্দরমহলে ঢুকে একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। এরকম অস্বস্তি এখনও আমাকে পেয়ে বসে। বিশেষ করে যার বাসায় যাই সে যদি সহজ ব্যবহার না করে। আমার অভিজ্ঞতা বলে, ধনীরা সাধারণত নিজেদের আচার-ব্যবহার দ্রুত বদলায় না। হয় এটা করার প্রয়োজনই মনে করে না তারা কিংবা এ কাজটা করতে চায় না। তাদের অর্থনৈতিক ভিত্তিটা যেমন মজবুত তেমনি তাদের এই আলগা ইমেজটিও শক্তপোক্ত থাকে। আর মধ্যবিত্ত অনেক চেষ্টা করে, তিলে তিলে তার আলগা ইমেজ গড়ে তুললেও সেটা ডিমের খোসার মতোই ভঙ্গুর। দরকার শুধু একটা চাপের! তবে নিম্নবিত্ত তার শরীরের মতোই নগ্ন–আলগা ইমেজহীন।

অবশ্য ধনাঢ্য পরিবারের মেয়ে রামজিয়াকে দেখে আমার মনে হলো, তার কোনো আল্‌গা ইমেজ নেই। মুখোশ নেই।

"ছবিটা কি নিয়ে এস্‌ছেন?"

রামজিয়ার কথায় নড়েচড়ে বসলাম। আমি এখানে এসেছি ভয়ঙ্কর একটি হত্যা-ধর্ষণের তদন্ত কাজে অথচ মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে রোমান্টিক সব চিন্তা-ভাবনা। নিজেকে আমার চাঁদের সামনে বসে থাকা বামন বলে মনে হলো।

"জি," আবারো একই শব্দ আওড়ালাম।

"মিলির কাজিনের গায়েহলুদের যে ছবিগুলো আছে তার বেশিরভাগই আমার নিজের ক্যামেরায় তোলা, সেজন্যে আমার খুব কম ছবিই আছে," সহজভাবে বলে যেতে লাগলো মেয়েটি। "আমার অবশ্য ফটোগ্রাফি করতে ভালো লাগলেও নিজের ছবি তুলতে একদম বিশ্রী লাগে।"

সমস্ত মুগ্ধতা স্থগিত করে আমি বুকপকেট থেকে ছবিটা বের করে তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। "এই যে, পেছনের ডানদিকের এই লোকটা..." মিলিকে আড়চোখে দেখতে থাকা তরুণকে দেখিয়ে বললাম।

রামজিয়া স্থিরচোখে কয়েক মুহূর্ত ছবিটার দিকে চেয়ে রইলো। আস্তে করে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরলেও সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক অভিব্যক্তি দেবার চেষ্টা করলো সে।

"আপনার বান্ধবির মতো মেয়ের দিকে যেকোনো পুরুষই তাকাবে কিন্তু," একটু থেমে আবার বললাম, "এই লোক বেশ কয়েকটি ছবিতেই এভাবে চোরাচোখে চেয়ে আছে। ব্যাপারটা সন্দেহজনক মনে হচ্ছে আমার কাছে।"

Gronthogaar.blogspot.com

মুখ তুলে তাকালো রামজিয়া। "শুধু এ কারণেই ওকে সন্দেহ করছেন নাকি আরো কোনো কারণ আছে?"

একটু ভেবে বললাম, "আমাদের ধারণা, খুনি ভিক্টিমের পরিচিত।"

রামজিয়া চেয়ে রইলো আমার দিকে। সে আরো কিছু শুনতে চায় নাকি এমনি চেয়ে আছে বুঝতে পারলাম না।

"তাছাড়া লোকটার চাহ্নির মধ্যে কিছু একটা আছে...চাহনিটা ঠিক স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না।"

"আপনি বলতে চাইছেন চাহনিটা স্বাভাবিক নয়?"

"হুম।"

আমার কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে ছবির দিকে তাকালো। যেন সে নিজেও চাহনির মধ্যে ওরকম কিছু খুঁজে পেতে চাইছে। সে-ও একজন নারী। পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি ভালো করেই বোঝার কথা। তবে সম্ভবত সে আমার কাছ থেকেই জানতে চাইছে। হয়তো পরিষ্কার হতে চাইছে।

এমন সময় চা-বিস্কিট নিয়ে এক কাজের লোক চলে এলো।

"প্লিজ, নিন।"

কথাটা বলেই রামজিয়া আবার ছবির দিকে চেয়ে রইলো, তারপর নিজের কাপটা তুলে নিয়ে আলতো করে নিঃশব্দে চুমুক দিলো তাতে। তার দৃষ্টি আটকে আছে ছবিতে।

তাকে চা খেতে দেখে আমার ভালো লাগলো। তাহলে আমি উটকো মেহমান নই!

চায়ের কাপ তুলে আমিও চুমুক দিলাম বেশ সাবধানে। ভালো করেই জানতাম, শব্দ করে চুমুক দেয়াটাকে অভিজাতরা ছোটোলোকি স্বভাবের বলে মনে করে। কিন্তু নিজেকে বিব্রত করে দিয়ে আস্তে করে একটা শব্দ করে ফেললাম। হয়তো এই প্রথম চায়ে চুমুক দেবার সময় আমি শব্দহীন থাকার চেষ্টা করেছি বলে, কিংবা ভেতরে ভেতরে নার্ভাস ছিলাম–কারণ যাই হোক, নিজের কাছেই আমার চুমুক দেবার ছোট্ট আর মৃদু শব্দটি খুব জঘন্য লাগলো প্রথমবারের মতো! দ্বিতীয় চুমুক দেবার সাহস হলো না আমার। স্থির চোখে চেয়ে রইলাম রামজিয়ার দিকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছবি দেখে যাচ্ছে সে। আমার চুমুকের শব্দ তার মনোযোগ আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে বলে এক ধরণের স্বস্তি পেলাম। কিন্তু সেটা মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য।

"আমার বাবা বলেন, শব্দ করে চা না খেলে নাকি চায়ের মজাটাই নষ্ট হয়ে যায়," বেশ শান্তকণ্ঠে ছবির দিকে চোখ রেখেই বলে গেলো সে।

gronthagaar.blogspot.com

আমি ঝিম মেরে গেলাম। কথাটা শেষ করে চকিতে আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসি দিয়ে আবার ফিরে গেলো ছবিতে।

"আপনি কিন্তু চা খাচ্ছেন না," এবারও আমার দিকে না তাকিয়ে বললো।

"না, এই তো...খাচ্ছি," এবার আর চুমুক না দিয়ে উপায় রইলো না।

রামজিয়ার চোখ যেমন ছবিতে নিবদ্ধ তেমনি আমার চোখ তার উপরে নিপতিত।

"আপনার কথাই ঠিক," ছবি থেকে চোখ তুলে বললো সে, "ওর চোখের চাহনি অন্যরকম।"

আমি আর কিছু বললাম না।

"আমিও একজন মেয়ে। পুরুষের দৃষ্টিতে কি থাকে ভালো করেই জানি।"

আনমনেই ঢোক গিলে ফেললাম। কথাটা কি আমাকে উদ্দেশ্য করে? চোরের মন তো পুলিশ-পুলিশ। এদিকে আমি আবার স্বয়ং পুলিশ! নিজেকে চোর মনে করতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। "লোকটা কে?" আমি কাজের কথায় ফিরে যেতে চাইলাম। চোর থেকে পুলিশ হতে চাইলাম আর কি!

দীর্ঘশ্বাস ফেললো রামজিয়া। "ওর নাম ইমতিয়াজ...ইমতিয়াজ শফিক।"

"মিলির কি হয়?"

"কেমন জানি আত্মীয় হয়, আমি ঠিক বলতে পারছি না। তবে মিলিদের পরিবারের সাথে ওদের সম্পর্ক বেশ ভালো।" কাপ আর ছবি দুটোই নামিয়ে রাখলো সে। "অনেকদিন পর গায়েহলুদে তার সাথে আবার দেখা হয়ে গেলো।"

"অনেক দিন পর দেখা হলো মানে? আপনি কি মিলির এই আত্মীয়কে আগে থেকে চিনতেন?" মোক্ষম প্রশ্নটাই করলাম আমি।

নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো সে। "মিলি আর আমি একই স্কুল-কলেজ আর ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি। ওর পরিবারের সবাইকে আমি চিনি। অনেক আত্মীয়স্বজনকেও চিনি।"

"এই ইমতিয়াজ লোকটার সাথে মিলির কি কোনো সম্পর্ক ছিলো?" প্রশ্নটা করার পরই বুঝতে পারলাম এতোটা সরাসরি না বললেও পারতাম। কিন্তু কিছু করার নেই, বন্দুক থেকে গুলি বের হয়ে গেছে।

একটু চুপ মেরে গেলো রামজিয়া। আস্তে করে নীচের ঠোঁট কামড়ে

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

ধরলো আবার। "অনেক আগের কথা, তেমন কিছু না আসলে। ইউ নো, অল্প বয়সে যা হয়।"

আমি অপেক্ষা করলাম পুরোটা শোনার জন্য।

"আমরা যখন কলেজে পড়তাম তখন একবার মিলিকে প্রেমপত্র দিয়েছিলো ইমতিয়াজ। এ নিয়ে আমরা বান্ধবিরা খুব মজা করেছিলাম।"

"তারপর?" আমি আরো কিছু জানার জন্য উদগ্রিব।

"তারপর আর কি...এই তো।"

আমার মনে হলো রামজিয়া এই বিষয়টা নিয়ে খুব বেশি কথা বলতে চাইছে না। "আপনি একটু খুলে বললে আমাদের জন্য সুবিধা হয়। এটা মিলির খুনের তদন্তে সাহায্য করবে।"

স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলো রামজিয়া। "এসব তেমন কোনো ঘটনা নয়। এগুলো প্রায় সব মেয়ের জীবনেই ঘটে।"

"আমি আসলে জানতে চাইছি, প্রেমপত্র দেবার পর কি হলো।"

গভীর করে দম নিয়ে নিলো সে। "মিলির মতো মেয়ে ইমতিয়াজের মতো ছেলের সাথে কোনো সম্পর্কে জড়াবে না এটাই স্বাভাবিক। ওদের মধ্যে অনেক অনেক ডিফারেন্স ছিলো। কোনো কিছুই ম্যাচ করতো না। করার কথাও নয়।"

"স্ট্যাটাসের কথা বলছেন?"

আমার কথাটা শুনে মাথা দোলালো আস্তে করে। "না, ঠিক তা নয়। আসলে দেখতে-শুনতে, আচার-ব্যবহার, পড়ালেখা কিংবা পারিবারিক অবস্থা...কোনো দিক থেকেই মিলির যোগ্য ছিলো না ইমতিয়াজ। ওদের দুই ফ্যামিলির সখ্যতার সুযোগ নিয়ে সে এ কাজটা করেছিলো বলে মনে হয়।"

মাথা নেড়ে সায় দিলাম আমি। "তাহলে মিলি তাকে রিফিউজ করে দিয়েছিলো?"

"সঙ্গে সঙ্গে করেনি অবশ্য।"

আমি স্থির চোখে চেয়ে রইলাম।

মলিন হাসি দিলো সে। "একটু নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছে আর কি।"

আমি অবাক হলাম কথাটা শুনে। "

"অবাক হবার কিছু নেই, এরকম কাজ অল্পবয়েসি মেয়েরা করেই থাকে।"

"তারপর কি হলো?"

"কি আর হবে, কয়েকদিন পর মিলি জানিয়ে দিলো ওর মনোভাব।"

gronthagaar.blogspot.com

"ইমতিয়াজ এটা কিভাবে নিলো?"

"সেটা তো আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। ধরে নিতে পারি একটু মন খারাপ হয়েছিলো। এর বেশি কিছু না। গায়েহলুদের অনুষ্ঠানে দেখা হবার পর স্বাভাবিক আচরণই করেছে সে। যেচে যেচে আমাদের সাথে কথা বলেছে।"

"আপনাদের সাথে নাকি শুধু মিলির সাথে?"

গভীর করে নিশ্বাস নিয়ে বললো, "শুধু মিলির সাথে।"

"আগেও কি এই লোকটা এরকম করতো? মানে, গায়ে পড়ে মিলির সাথে কথা বলার চেষ্টা করতো?"

"মিলি না করে দেবার পর আর ঘুরঘুর করেনি। আসলে মিলির পেছনে কে ঘুরঘুর করলো সেটাকে আমরা সিরিয়াসলি নিতাম না। আফটার অল, মিলি দেখতে খুব সুন্দর ছিলো। অনেকেই তার পেছনে ঘুরঘুর করতো।"

"কখনও এর বেশি কিছু করে নি?"

স্থিরচোখে আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলো রামজিয়া। "বাড়াবাড়ি করার কথা বলছেন?"

মাথা নেড়ে সায় দিলাম আমি।

"যুদ্ধের পর একবার জোর করে মিলির সাথে কথা বলার চেষ্টা করলেও মিলি পাত্তা দেয়নি। সে-ও আর এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করেনি।"

"আপনি বলতে চাইছেন মিলি ওর সাথে কথা বলেনি?"

"হ্যা।"

"আপনি শিওর?"

একটু ভেবে বললো, "পুরোপুরি শিওর কিভাবে হবো? আমার সামনে কথা হয়নি। আমার অগোচরে কিছু হয়ে থাকলে মিলি সেটা আমাকে বলতো।" একটু থেমে আবার বললো, "ও আমার খুবই ঘনিষ্ঠ বান্ধবি ছিলো, সব কথা আমার সাথে শেয়ার করতো।"

আমি দেখতে পেলাম তার চোখেমুখে বান্ধবি হারানোর দৃশ্যমান শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

"ইমতিয়াজ স্টুডেন্ট পলিটিক্স করতো," কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে আস্তে করে বললো রামজিয়া। "যুদ্ধের পর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে এলেও আমাদের সাথে কথাবার্তা হয়নি। আমি আর মিলি ওকে দূর থেকে দেখেছি কয়েকবার।"

"ইমতিয়াজ কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তো?"

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

"না। ইন্টারমিডিয়েটের পর সে ড্রপ-আউট করে। ক্যাম্পাসে যেত পলিটিক্স করতো বলে।"

একটু চুপ থেকে আবারো প্রশ্ন করলাম তাকে, "আচ্ছা, গায়ে-হলুদের প্রোগ্রামে মিলির সাথে তার কি ধরণের কথাবার্তা হয়েছে সে সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা আছে?"

"একদম ফর্মাল কথাবার্তা। অনেকদিন পর দেখা হলে যা হয়। মিলির বিয়ে হয়েছে এটা সে জানতো। কেমন আছে, কি করে, এইসব। তেমন কিছু না।"

"মিলি কোথায় থাকে, ওর স্বামি কি করে এইসব জানতে চেয়েছিলো?"

"আমার সামনে করেনি। তবে কোন এক ফাঁকে করে থাকতে পারে। আ'ম নট শিওর অ্যাবাউট দ্যাট।"

মাথা নেড়ে সায় দিলাম আমি।

"ইমতিয়াজ কিন্তু খুব স্বাভাবিক আচরণ করেছিলো। তার মধ্যে আমি কোনো অস্বাভাবিক কিছু দেখিনি। তবে..."

"কি?"

"এখন ছবিতে তার চাহ্নি দেখে মনে হচ্ছে না তার আচরণ পুরোপুরি স্বাভাবিক ছিলো।"

"বেশিরভাগ ছবি তো আপনিই তুলেছেন, ছবি তোলার সময় এটা খেয়াল করেন নি?"

মাথা দোলালো রামজিয়া। "ও ছিলো ফ্রেমের একেবারে কোণায়। গ্রুপ ছবি তোলার সময় ফোকাস থাকে মাঝাখানে। ডানে-বামে হয়তো খেয়াল রাখবেন কিন্তু সেটা ফ্রেমের কারণে, কে কোথায় চেয়ে আছে, কিভাবে তাকাচ্ছে সেটা খেয়াল করা তখন অসম্ভব।"

"তা ঠিক," আমি বললাম।

"আপনারা কি ইমতিয়াজকেই প্রাইম সাসপেক্ট মনে করছেন?"

তার এ প্রশ্নে আমি একটু বুঝেশুনে জবাব দিলাম। সত্যি বলতে, ইমতিয়াজ তখনও কোন সন্দেহভাজন নয়। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে এটা আমার নজরে এসেছে। তাকে সাসপেক্ট হিসেবে গন্য করতে গেলে আরো অনেক কিছু লাগবে। সবচাইতে বড় কথা হায়দারভায়ের কাছে এটা গ্রহণযোগ্য হতে হবে নইলে কথাটা তোলামাত্রই তিনি খারিজ করে দিতে পারেন। ছবিতে এক যুবক হা-করে মেয়েমানুষ দেখছে–এটা কোনো ফৌজদারি অপরাধের মধ্যে পড়ে না। খুনখারাবি আর ধর্ষণের মতো ঘটনার

gronthagaar.blogspot.com

আসামি হিসেবে তাকে সন্দেহ করার উপায় নেই। আমি যেটা করছি তার সবটাই আমার নিজস্ব মূল্যায়ন। অনুভূতির ব্যাপার।

"ঠিক তা নয়," গাল চুলকে বললাম। "একটু খতিয়ে দেখতে চাইছি আর কি।"

"আমার কিন্তু মনে হচ্ছে ও-ই জঘন্য কাজটা করেছে," রামজিয়া জোর দিয়ে বললো। "ওর চোখদুটো আসলেই কেমনজানি। আপনি বোধহয় ঠিকই ধরতে পেরেছেন।"

"দেখা যাক, কি হয় শেষ পর্যন্ত।"

আল্‌তো করে মাথা নেড়ে সায় দিলো রামজিয়া।

"এই লোকটা কোথায় থাকে বলতে পারেন?"

আমাকে হতাশ করে দিয়ে মাথা দোলালো সে। "আমি ওর সম্পর্কে একদমই কিছু জানি না। কোথায় থাকে কি করে, নো আইডিয়া। তবে পারভেজ নামে মিলির এক কাজিন আছে, ও আবার বিয়ে করেছে আমাদের আরেক বান্ধবি পারুলকে। পারভেজের সাথে আমি ইমতিয়াজকে কথা বলতে দেখেছি গায়েহলুদের প্রোগ্রামে। সম্ভবত পারভেজ জানে ইমতিয়াজের ঠিকানা।" উঠে দাঁড়ালো সে, "ওয়েট অ্যা মিনিট...আমি আসছি।" বলেই পাশের ঘরে চলে গেলো।

আমি ড্রইংরুমের চারপাশটা দেখতে লাগলাম। এরা শুধু ধনীই নয়, বেশ শিক্ষিতও বটে। দেয়ালে কিছু পেইন্টিং টাঙানো আছে, টিভি সেটের পাশে একটা লং-প্লেয়ারও–তখনকার দিনে যা খুব কম বাড়িতেই ছিলো। প্লেয়ারটার পাশে একগাদা লং-প্লে ডিস্ক। এটাকে সবাই এল.পি নামে ডাকতো। সবার উপরে থাকা লং-প্লেটা চিনতে পারলাম গায়কের ছবি দেখে–ক্লিফ রিচার্ড। ভদ্রলোককে চেনার কারণ যুদ্ধের পর পর এ দেশে এসেছিলেন তিনি। টিভিতে তার গাওয়া 'কংগ্রাচুলেশন্স' গানটা আমিও দেখেছি। দীর্ঘদিন এই গানটা প্রচার করতো বিটিভি। আমার মতো ইংরেজি গান না-শোনাদেরও মুখস্ত হয়ে গেছিলো ভদ্রলোকের চেহারা!

আমি রুমের বামদিকে তাকালাম। বড় বড় জানালা দিয়ে বাইরে ছোট্ট একটি বাগান দেখা যাচ্ছে। ঘরের বড় জানালার পাশে একটা রকিংচেয়ার। কেউ হয়তো আয়েশ করে চায়ে চুমুক দিতে দিতে এই চেয়ারে বসে বই পড়ে, গান শোনে আর বাগানের হরেক রকম ফুল দেখে। একেবারে সিনেমায় দেখা বড়লোকদের মতোই!

তবে ঘরে বিশাল একটি বুকসেল্‌ফই আমার মনোযোগ বেশি আর্কষণ

gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

করলো। এরকম বুকসেল্‌ফের স্বপ্নই আমি দেখতাম। ব্যাচেলরের জীবন যেমন এলোমেলো হয় তেমনি তার বইগুলোও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে ঘরে। আমিও এর ব্যতিক্রম ছিলাম না। তবে অন্যদের তুলনায় সামান্য একটু গুছিয়ে রাখতাম।

যাই হোক, বুকসেল্‌ফে থাকা বইগুলো বলে দিচ্ছিলো এ বাড়িতে কমপক্ষে একজন পড়ুয়া আছে। সে কে হতে পারে? এই মেয়েটা? সম্ভবত।

আমি বইগুলো দেখে গেলাম এক এক করে। আমি যে এতো বই পড়ি তারপরও অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম সেল্‌ফের একটা বইও আমার পড়া নেই! কালেকশানে থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না!

বইগুলো সব ইংরেজি ভাষার।

ঢাকায় আসার পর পুরনো ইংরেজি বইয়ের কিছু দোকান দেখে ঢু মেরেছিলাম। সেই সময় ঢাকায় খুব বেশি ইংরেজি বই পাওয়াও যেতো না, আর পাওয়া গেলেও দাম পড়তো খুব বেশি। তবে স্টেডিয়ামের একটা দোকানে পুরনো বইয় বিক্রি করা হতো, ওখান থেকে কম দামে দুটো ইংরেজি নভেল কিনে পড়ার চেষ্টা করেছিলাম, বার বার ডিকশনারি দেখে বই পড়া যে কী যন্ত্রণাদায়ক সেটা হাঁড়ে হাঁড়ে টের পেয়েছিলাম আমি। তিনদিনে বিশ পৃষ্ঠা পড়ে ক্ষান্ত দিয়েছিলাম অবশেষে।

বুকসেলফে একমাত্র বাঙালি লেখক নিরদচন্দ্র চৌধুরি, কিন্তু তার বইটা যথারীতি ইংরেজিতে *লেখা-অ্যান অটো-বায়োগ্রাফি অব অ্যান আননোন ইন্ডিয়ান।* এই বাদামি সাহেবের দুটো বাঙলা বই আমি পড়েছি, কোন ইংরেজি বই পড়া হয়নি। আনমনেই অটো-বায়োগ্রাফি বইটা হাতে তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাতে শুরু করলাম।

"আব্বা দেশের বাইরে গেলেই আমার জন্য বই নিয়ে আসেন," ঘরে ঢুকেই রামজিয়া বলে উঠলো।

আমি একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বইটা জায়গামতো রেখে দিলাম।

"মনে হচ্ছে খুব বই পড়েন?"

"না, মানে...একটু আধটু।" আমি যে ইংরেজি বই পড়ি না, পড়তে গিয়ে ঘেমে উঠি সেটা আর তাকে বললাম না।

"নিরদ চৌধুরির লেখা ভালো তবে ভাষা খুবই কঠিন। একেবারে রয়্যাল-ইংলিশে লেখেন।"

"আমি অবশ্য উনার দুটো বাঙলা বই পড়েছি," বললাম তাকে।

"উনি বাঙলা বই-ও লেখেন নাকি?" অবাকই হলো। "আব্বু বলেন, উনি

gronthagaar.blogspot.com

নাকি কিছুটা বাঙালি বিদ্বেষি। আমার তো ধারণা ছিলো উনি বাঙলায় লেখেন না।"

"উনার একটা বইয়ের নাম আত্মঘাতী বাঙালী, সেজন্যে হয়তো মনে করা হয় উনি বাঙালি বিদ্বেষি।"

"বিদ্বেষি না-হলে কেউ পুরো জাতিকে আত্মঘাতী বলতে পারে, বলেন?"

আমি সৌজন্যমূলক হাসি দিলাম। "হতে পারে। তবে উনার বাঙালীর জীবনে রমণী বইটা বেশ ভালো। আমার খুব ভালো লেগেছে।"

"তাই?"

"হুম।" একটু থেমে আবার বললাম, "এসব বই কে পড়ে, আপনি?"

"আমি আর আব্বা।" ছোট্ট করে জবাব দিলো। তারপর কিছু একটা মনে পড়তেই বলে উঠলো, "আপনার ভাগ্য ভালো, পারভেজকে ফোনে পেয়েছি।"

আমি কৃত্রিম হাসি দিলাম।

"দু-দিন ধরে ওর চোখ উঠেছে তাই অফিসে যায়নি, বাসায়ই আছে।"

এই চোখ ওঠা রোগটি তখন বেশ পরিচিত ছিলো। যুদ্ধের সময় লক্ষ-লক্ষ শরণার্থি কোলকাতায় আশ্রয় নিলে রোগটা এ দেশ থেকে সেখানেও চলে যায়। ওরা এটাকে 'জয়বাংলা রোগ' বলে ডাকতো।

আবার নিজের জায়গায় বসে পড়লো সে। "এই নিন, ইমতিয়াজের ঠিকানা।"

বাড়িয়ে দেয়া এক টুকরো কাগজটি হাতে নিলাম।

"পারভেজ আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলো ইমতিয়াজের ঠিকানা চাচ্ছি কেন, আমি বলেছি একটা দরকার আছে। ওকে এসব বলা ঠিক হতো না, তাই না?"

"জি। না বলে ভালোই করেছেন।"

কাগজে চোখ বোলালাম : কাঠালবাগানের বড় মসজিদের পাশে।

"পারভেজ বলেছে, ওখানে গিয়ে ইমতিয়াজের নাম বললেই লোকজন ওর বাড়িটা দেখিয়ে দেবে," রামজিয়া বললো।

"থ্যাঙ্ক ইউ," কথাটা বলার পরই আমার মনে হলো অযথাই বোকার মতো ইংরেজি বললাম কেন! ধনীর বাড়িতে এসে তাদের অনুকরণে কথা বলে নিজের কাছেই কেমন ছোট হয়ে গেলাম যেন। আস্তে করে উঠে দাঁড়ালাম।

রামজিয়াও আমার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো। "আমার ফোননাম্বারটা তো

gronthagaar.blogspot.com

আপনার কাছে আছেই...মিলির কেসটার আপডেট আমাকে জানাবেন।"

"জি, অবশ্যই জানবো।"

হঠাৎ করেই মনে হলো, রামজিয়ার মুখটা কেমনজানি চেনা চেনা লাগছে। কোথায় যেন দেখেছি।

আহ্! রোমান হলিডে...অড্রে হেপবার্ন!

কয়েক বছর আগে *মধুমিতা*'য় গিয়ে এই সিনেমা দেখে রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছিলো।

"কিছু বলবেন?"

তার কথায় সম্বিত ফিরে পেলাম। "না।"

বাড়ি থেকে বের হয়ে আসার সময় আমার শুধু এটাই মনে হলো, খুন-খারাবির তদন্ত করাটা সব সময় নিরস আর বিরক্তিকর হয় না!

Gronthagaar.blogspot.com

অধ্যায় ৬

আমি জানি সময় কখনও এক মুহূর্তের জন্যেও থেমে থাকে না কিন্তু কখনও কখনও কিছু কিছু দৃশ্য দেখলে মনে হয়, সময় বুঝি থমকে আছে। রামজিয়াদের বাড়িতে ঢুকেই আমি এটা বুঝতে পারলাম। দুই যুগ আগে বাড়িটা যেমন ছিলো তেমনি আছে, খুব একটা বদলায়নি। বদলে গেছে কেবল আশেপাশের পরিবেশ। ধানমণ্ডিতে আর একতলা-দোতলা বাড়ি বলে কিছু চোখে পড়ে না। তবে অল্পকিছু বাড়ির মতো এই বাড়িটা এখনও আগের আভিজাত্য নিয়ে টিকে আছে। সত্যি কথা হলো, আমি এ শহরে থাকলেও ঠিক দুই যুগ পরে এখানে এলাম। আশ্চর্য হলেও সত্যি, এই দীর্ঘ সময়ে কোনো দরকারে-অদরকারেও এই বাড়ির সামনে দিয়েও যাতায়াত করা হয়নি।

প্রথমবার এই বাড়িতে ঢুকে যে ড্রইংরুমে বসেছিলাম সেটা যেন ফ্রেমে বাধাই করা ছবির মতোই থমকে আছে। আমি অনেক কষ্টেও মনে করতে পারলাম না চব্বিশ বছর আগে যা দেখেছিলাম তার সাথে বর্তমান সময়ে কি কি পার্থক্য তৈরি হয়েছে। সেই পুরনো বুকসেলফ, পেইন্টিং, সোফা, এমনকি লং-প্লেয়ারটা পর্যন্ত ঠিক যে-জায়গায় ছিলো সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে এখনও। সম্ভবত বুকসেল্‌ফে নতুন কিছু বই ঠাঁই করে নিয়েছে। তবে লং-প্লেয়ারটা নিশ্চয় অ্যান্টিক হিসেবে বেঁচে-বর্তে আছে, মনে হয় না ওটা আর কাজ করে।

"তুমি একটু বসো, আমি বুয়াকে বলি চা দিতে," হেসে বললো সে। "এইফাঁকে একটু ফ্রেশ হয়ে আসি।"

আমি কেবল আশ্বস্ত করার হাসি দিতে পারলাম। সোফায় বসেই বুঝতে পারলাম একটা জিনিস নেই। টিভি! হ্যা, আগে যেখানে টিভিটা ছিলো সেখানে এখন তিনফুট উঁচু পোড়ামাটির একটি ফুলদানি রাখা। ফুলদানি থেকে একটু উপরে চোখ যেতেই থমকে গেলাম আমি।

দেয়ালে একটি সাদা-কালো ছবির ফ্রেম। দু-জন প্রাণের সখি। একজন বহুকাল আগেই পাশবিকতার শিকার হয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। আমার মনে পড়ে গেলো, এটাই মিলির তোলা শেষ ছবিগুলোর একটি।

gronthagaar.blogspot.com

মিলির কাজলমাখা চোখ আমার স্মৃতিতে ফিরিয়ে আনলো ভয়ঙ্কর ঐ দৃশ্যটি : এক তরুণী উদাস হয়ে তাকিয়ে আছে শূন্যে। নিজের নগ্ন শরীরকে অবজ্ঞা করে। সেই চোখে তখনও অশ্রু থমকে ছিলো।

চট করে ছবি থেকে চোখ সরিয়ে নিলাম আমি। বড় জানালার পাশে রকিং-চেয়ারটা খুঁজে বেড়ালাম। ওটাও নেই।

আসলে সময় সব কিছু বদলে দেয়, কোনো কিছুই আগের মতো থাকে না। যতো সযত্নেই পুরনো জিনিসগুলো আগলে রাখা হোক না কেন, সময়ের আঘাত ঠিকই চোখে পড়বে।

আস্তে আস্তে পরিবর্তনগুলো ধরা পড়তে শুরু করলো আমার চোখে। বামদিকের বড় বড় জানালাগুলোর রঙ আগের মতো থাকলেও বাইরের বাগান বলতে এখন আর কিছু নেই। সেখানে দেখতে পেলাম নগ্ন মাটি। যেন ক্ষেতের জমি লাঙ্গল দিয়ে চষে ফেলা হয়েছে। ওখানে কি আবারো বাগান করা হবে?

"দেশে ফিরে এসে দেখি বাগানটা নেই," ঘরে ঢুকে বললো রামজিয়া। এখন তার পরনে ঢিলেঢালা লং-গাউন। "ঝোঁপ-ঝাঁড়ে ভরে গেছে। আমি ওগুলো সাফ করিয়েছি, আবার বাগান করবো।"

"তুমি যখন দেশে ছিলে না তখন কি তোমাদের বাসায় কেউ থাকতো না?" জিজ্ঞেস করলাম।

"আমি চলে যাবার পাঁচ বছর পর আম্মুও চলে এলো। ক্যান্সার ধরা পড়েছিলো...আমেরিকায় রেখে ট্রিটমেন্ট করিয়েছিলাম কিন্তু সারভাইভ করতে পারেনি। এরপর আব্বু আর ছোটোভাই আশফাক এখানে থেকেছে কয়েক বছর। কয়েক বছর পর ও কানাডায় চলে গেলে আব্বুও চলে গেলো ওর ওখানে। বাড়িটা খালিই পড়েছিলো। একজন কেয়ারটেকার রেখেছিলাম। পরে আব্বু চলে এলো আবার। মারা যাবার আগপর্যন্ত একাই থাকতো এই বাড়িতে।"

"উনি কবে মারা গেছেন?"

"তিন বছর আগে।" মাথার চুলগুলো রিবন দিয়ে পেঁচিয়ে নিলো সে। আগের মতো আর লম্বা চুল রাখে না, বড়জোর কাঁধ অবধি হবে। "আব্বুর কারণেই বাড়িটা আগের মতো আছে। আব্বু কোনো কিছু সহজে বদলাতে চাইতো না। ডেভেলপারদের অফার ফিরিয়ে দিতেন সব সময়। খুবই ট্র্যাডিশনালিস্ট ছিলো।"

"তোমার ভাই দেশে আসে না?"

gronthagaar.blogspot.com

“না,” ছোট্ট করে বললো। “তুমি চা খাওনি এখনও? ঠাণ্ডা হয়ে গেছে তো।”

আমি চেয়ে দেখলাম সোফার টেবিলে এককাপ চা রাখা। এটা আবার কখন দিয়ে গেলো? “ইয়ে মানে...খেয়াল করিনি।”

“চা-টা বোধহয় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, আরেক কাপ দিতে বলি?”

“আরে না, লাগবে না,” বলেই আমি কাপটা তুলে নিলাম হাতে। “এই এলাকায় মনে হয় তোমাদের বাড়িটাই আগের মতো আছে।”

“হুম। তবে ডেভেলপাররা খুব জ্বালাচ্ছে। ওরা এমনকি কানাডায় আশফাকের সাথেও কন্ট্যাক্ট করছে। এ নিয়ে আমার সাথে ওর মনোমালিন্য হচ্ছে। আমি চাই বাড়িটা যেমন আছে তেমনি থাকুক, অন্তত যতোদিন বেঁচে আছি।”

তার শেষ কথাটা দীর্ঘশ্বাসের মতো শোনালো।

ধানমণ্ডির মতো জায়গায় এরকম একটি বাড়ির দিকে ডেভেলপারদের শ্যেনদৃষ্টি পড়বে সেটাই স্বাভাবিক। এদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমিও বেশ ওয়াকিবহাল। দু-বছর আগে এদের জমি দখলের ঘৃণ্য কাজকারবার নিয়ে একটি ক্রাইম-ফিকশন লিখেছিলাম। তখন গ্রাউন্ড-ওয়ার্ক করতে গিয়ে অনেক সত্যি আবিষ্কার করেছি।

অবশেষে ঠাণ্ডা চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, “তুমি তাহলে দেশেই থেকে যাচ্ছো?”

“হুম।”

“এখানেই...মানে, এই বাড়িতে?”

“আশ্চর্য, এই বাড়ি ছাড়া আর কোথায় থাকবো?”

“কেন, তোমার হাজব্যান্ডের বাড়ি নেই ঢাকায়? শ্বশুড়বাড়ি?”

“তা আছে কিন্তু ওখানে তো আমার পক্ষে ওঠা সম্ভব নয়।” হাসিটা আস্তে করে মিঁইয়ে গেলো যেন।

আমি কিছু বললাম না। দুই যুগ পর দেখা হতেই অনেক বেশি ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে ফেলছি। অযাচিতভাবে নাক গলিয়ে ফেলছি তার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলোতে।

“অনেক আগেই ওর সাথে আমার ডির্ভোস হয়ে গেছে,” খুব স্বাভাবিক কণ্ঠেই বললো রামজিয়া। কপালের সামনে চলে আসা এক গোছা চুল সরিয়ে দিলো। “ইট ডিডেন্ট ওয়ার্ক...অ্যাকচুয়ালি।”

“তোমার ছেলেমেয়ে?” প্রশ্নটা না করে পারলাম না।

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

"একটাই মেয়ে, লাস্ট ইয়ার কানাডার এক ছেলেকে বিয়ে করেছে। ওরা দু-জন ওখানেই সেটেল্‌ড। তো, আমি আর ওখানে কী করবো? আই হেট লোনলিনেস।"

"কিন্তু এখানেও তো তুমি একা...ফ্যামিলির কেউ নেই।"

"এখানে আমি যতোটা লোনলি ফিল করবো ওখানে তারচেয়ে অনেক বেশি ফিল করতাম। তাছাড়া বিদেশে সেটেল্‌ড করার কোন ইচ্ছে আমার ছিলো না, ওটা ঘটনাচক্রে হয়ে গেছে।"

ঘটনাচক্রে? খুব জানতে ইচ্ছে করলো, সেটা কি–কিন্তু বলতে পারলাম না।

"আচ্ছা, ইমতিয়াজের কোনো খবর কি জানো? সে এখন কোথায়? কি করে?"

আমি কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলাম তার দিকে।

Gronthagaar.blogspot.com

অধ্যায় ৭

সন্দেহভাজন

"ইমতিয়াজ!"

সিগারেটে জোরে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ার পর পর দাঁতে দাঁত পিষে বললেন এসএম হায়দার। নাক দিয়ে যেন ধোঁয়া নয়, বের হচ্ছে উত্তপ্ত ক্রোধ! চোখের সামনে ধরে রেখেছেন একটি সাদা-কালো ছবি।

আমি রামজিয়ার বাসা থেকে সোজা থানায় ফিরে এসে দেখি হায়দারভাই অস্থির হয়ে পায়চারি করছেন। আমাকে দেখেই তিনি প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতে শুরু করবেন, অমনি তাকে একগাদা নতুন তথ্য দিয়ে বোবা করে দেই ক্ষণিকের জন্য।

মিলির স্বামি মিনহাজের সাথে আমার কথোপকথন, ছবিতে ইমতিয়াজের অমন চাহ্নি, রামজিয়ার কাছ থেকে ইমতিয়াজ সম্পর্কে যতোটুকু জেনেছি, সব বলার পর আমার হাত থেকে ছবিটা নিয়ে তিনি রাগে ফুঁসতে থাকেন।

"ছবির এই চাহ্নি দেখে অবশ্য নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না, তবে খতিয়ে দেখতে হবে," আমি বললাম। "খুনি হিসেবে এই লোকের সম্ভাবনা আছে। আপনি কি বলেন?"

"তা তো আছেই, কেউই সন্দেহের বাইরে নয়। সবাইকে বাজিয়ে দেখতে হবে।" তার দৃষ্টি ছবিতেই নিবদ্ধ।

"আপনি এতো দেরি করলেন কেন? কোথায় গেছিলেন?"

মুখ তুলে তাকালেন হায়দারভাই। ছবিটা ডেস্কের উপরে রেখে বললেন, "আর বোলো না, একটা মামলায় কোর্টে গেছিলাম...শালার ম্যাজিস্ট্রেটের আসার কোনো নামগন্ধ নেই। আসার কথা দশটার দিকে, হারামজাদা নবাব সলিমুল্লাহ এসেছে সাড়ে বারোটায়।" রাগেক্ষোভে মুখ বিকৃত করে ফেললেন তিনি। "নবাবসাহেব একটা মামলা শেষ করেই চলে গেলো লাঞ্চে, ফিরে এলো দু-টার পর। আমি খালাস পেলাম তিনটায়। সারাটা দিনই গেলো কোর্টের বারান্দায়।"

পুলিশের চাকরি অল্পদিন ধরে করলেও ততোদিনে অনেক কলিগকে

gronthagaar.blogspot.com

এরকম অভিজ্ঞতা অর্জন করতে দেখেছি। দ্রুতই বুঝতে পেরেছি, কোনো মামলার তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে কোর্টে হাজিরা দেয়ার মতো বিড়ম্বনার কাজ আর নেই।

"মনে হয় দেশটা এদের জন্যই স্বাধীন হয়েছে।" ক্ষোভের সাথে বললেন হায়দারভাই। "কোনো কিছু যদি ঠিকমতো চলতো! সবখানে একই অবস্থা। পাবলিক তো এখনই বলা শুরু করে দিয়েছে, পাকিস্তান আমলই ভালো ছিলো।"

আমি চুপ থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। অন্য কোনো সময় হলে হায়দারভায়ের সাথে একচোট তর্কাতর্কি করতাম, যেমনটা সব সময় করি। উনি আওয়ামী লীগের কড়া সমালোচক আর আমি কট্টর সমর্থক। স্বাধীনতার পর থেকেই উনার স্বপ্নভঙ্গ হতে শুরু করেছে। সরকারী দলটির অনেক কর্মকাণ্ড আর নীতি তার পছন্দ নয়। আমি এর বিপরীত। তখনও আশায় ছিলাম, অচিরেই সব ঠিক হয়ে যাবে। বঙ্গবন্ধু ঠিকই সব গুছিয়ে নিতে পারবেন। তার স্বপ্নের সোনারবাংলা হবেই হবে।

এই একটা বিষয়ই আছে যা আমাদের সম্পর্ককে পুরোপুরি মিষ্টি হতে দেয়নি, কিছুটা টক-ঝাল করে রেখেছে। এতে অবশ্য আমাদের আন্তরিকতায়, সম্পর্কে কোনো চিড় ধরেনি। বরং আমার মনে হয়, এর ফলে আমাদের ঘনিষ্ঠতা আরো বেড়ে গেছে। দু-জনেই দু-জনের মনের কথা খোলাখুলিভাবে বলতে পারি, রাগ-ক্ষোভ, হতাশা প্রকাশ করতে পারি। আমার ধারণা, সম্পর্ক বেশি মিষ্টি হলে ডায়বিটিসের মতো ভয়ঙ্কর কিছু ঢুকে পড়ে!

"আর আমাদের জাতিরপিতা! তোমার বঙ্গবন্ধু!" ঝাঁঝের সাথে বললেন, "আবেগমার্কা কথাবার্তাই শুধু বলে যাচ্ছেন। উনার চারপাশে নাকি সব চোর! চাটার দল নাকি সব চেটেপুটে খাচ্ছে! তা, আপনি কী করছেন? আপনি তো সৈয়দ মোহাম্মদ হায়দার নন, কোনো ঠুটা জগন্নাথও নন। আপনি জাতির পিতা! দেশটার মালিক! সমস্ত ক্ষমতা আপনার হাতে। চোরবাটপারগুলোকে পাছায় লাথি মেরে বঙ্গোপসাগরে ফেলে দিচ্ছেন না কেন! চাটার দলের জিহ্বা কেটে কুকুর দিয়ে খাইয়ে দেন! আপনার আশেপাশেই তো ওরা ঘোরাঘুরি করে। ওদেরকে আপনি ভালো করেই চেনেন। আপনি মামা না-হয়ে, বাবা না-হয়ে, মুজিবভাই না-হয়ে, দলের নেতা না-হয়ে আমাদের শেখসাহেব হয়ে যান না আবার!"

আমার চুপ মেরে থাকাটা যেন হায়দারভাইকে আরো ক্ষেপিয়ে তুললো।

gronthagaar.blogspot.com

"এখন মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছো কেন? চোপাবাজি করো? তোমার নেতাকে ডিফেন্ড করো? কিছু যুক্তি দাও?"

"আমি যা-ই বলবো সেটাই আপনার কাছে কু-যুক্তি মনে হবে, তাই কিছু না বলাই ভালো," মুচকি হেসে বললাম।

"বাহ্, দারুণ পরিবর্তন হয়েছে তো তোমার!" নাটকিয় ভঙ্গিতে বললেন তিনি। "কয়েক দিন আগেও তো খুব চোপাবাজি করতে, আজ দেখি অন্য সুর! তলে তলে আবার ঐ বালের জাসদে নাম লিখিয়েছো নাকি?"

আমি হেসে ফেললাম। "আমি জাসদে যোগ দেবো? কী যে বলেন!"

"তাহলে হঠাৎ এই পরিবর্তন, ঘটনা কি?"

"আশ্চর্য! ঘটনা আবার কি, ঐ লোকটার ঠিকানা জোগাড় করেছি, চলেন তার খবর লাগাই। সব সময় রাজনীতি নিয়ে তর্কা করতে ভালো লাগে না।"

"আরে ব্রাদার, সাধে কি করি? আমাদের সবকিছু জড়িয়ে আছে এই রাজনীতির সাথে। সবকিছু।"

মুচকি হাসলাম আমি। "হুম, বুঝতে পেরেছি। আমাদের এই কেসেও রাজনীতি আছে!"

আমার টিটকারিসুলভ কথাটা আমলে নিলেন না হায়দারভাই, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন শুধু। "না থাকলেই ভালো।" তারপর একটু চুপ থেকে আবার বললেন, "রাজনীতি ঠিক না হলে কোনো কিছুই ঠিকমতো চলবে না। এমনকি আমাদের এই যে তদন্ত, এটাও ঠিকমতো করতে পারবো না।"

ঐ মুহূর্তে কথাটার গুরুত্ব আমি পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিলাম, যেন সবটাই আমার কাছে পরিষ্কার। "সবই বুঝি, বড়ভাই," বলেছিলাম তাকে, "কিন্তু এখানে বসে বসে কারোর চৌদ্দগুষ্টি উদ্ধার করলে কি রাজনীতি ঠিক করতে পারবেন?"

হায়দারভায়ের ক্ষুব্ধ চোখে হঠাৎ করেই বিষন্ন এক হতাশা নেমে এলো যেন। আর সেই বিষন্ন চোখজোড়া সরাসরি আমার দিকেই নিক্ষিপ্ত। "কী করবো, বলো, এখন তো যুদ্ধ চলছে না...গুলি করে শেষ করে দেবো সব ক-টাকে।" দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুকের ভেতর জমে থাকা ক্ষোভ নির্গত করে বললেন, "এসব বলি কেন জানো?"

আমি ভেতরে ভেতরে লজ্জায় কুকঁড়ে গেলাম। আমার এভাবে কথা বলা ঠিক হয়নি।

"অনেক ক্ষোভ...সারাক্ষণ দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে। তুমি বুঝবে না, ব্রাদার। এসব বলে বলে আগুনের তেজ কমাই।"

gronthagaar.blogspot.com

হায়দারভাই জীবনবাজি রেখে, মা-বাবা, ভাই-বোন এমনকি নতুন বউকে ফেলে যুদ্ধে চলে গেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন এমন একটি সমাজ যেখানে একটু-আধটু অভাব থাকলেও অন্যায় যেন না থাকে। সেটা যখন পাননি তখন তার হতাশা আন্দাজ করা আমার মতো একজনের পক্ষে বোঝা সত্যি কঠিন। আমি, যে কি-না যথেষ্ট উপযুক্ত বয়স থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধে যাবার সাহস দেখাতে পারিনি। ভীরু কাপুরুষের মতো পালিয়ে বেড়িয়েছি নিজের জীবন নিয়ে। বেঁচে থাকাটাই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে আমার কাছে। এই যে যুদ্ধে না-যাওয়া, এটা আমার আজন্ম আক্ষেপ হয়ে আছে। যদিও হায়দারভাই কখনও চুড়ান্ত রাগের সময়ও বলতেন না–তুমি কিভাবে বুঝবে, তুমি তো যুদ্ধ করোনি! তিনি জানতেন, যুদ্ধে না-যাবার অপরাধবোধ আমার ভেতরে রয়েছে। এটা বলে আমাকে কখনও লজ্জা দিতে চাইতেন না। কিন্তু উনি না বললেও আমি ঠিকই কথাটা শুনতে পেতাম! যেন মগজের ভেতরে কেউ চিৎকার করে বলে উঠতো, আমাকে যারপরনাই বিব্রত করে তুলতো।

"চলো, ঐ শালার ইমতিয়াজের পাত্তা লাগাই।"

হায়দারভায়ের কথায় মুখ তুলে তাকালাম। উনি ডেস্ক থেকে উঠে দাঁড়ালেন।

"চলো?"

আমি হায়দারভায়ের পেছন পেছন থানা থেকে বের হয়ে গেলাম। যে জিপটায় করে রামজিয়াদের বাড়িতে গেছিলাম ওটা নিয়েই চলে গেলাম ইমতিয়াজের খোঁজে কাঠালবাগানে। তখন ওসব এলাকা খুব নিরিবিলি ছিলো, অনেকটা মফশ্বলের মতো। পথেঘাটে যানজট বলতে কিছুই ছিলো না। আজিমপুর থেকে কাঠালবাগানে চলে গেলাম কয়েক মিনিটের মধ্যেই। পথে আমাদের মধ্যে তেমন কোনো কথা হলো না। হায়দারভাই চুপচাপ সিগারেট টেনে গেলেন। আমি অবশ্য সিগারেট ধরালাম না। ইচ্ছে করছিলো না। কখন যে কাঠালবাগানের বড় মসজিদের সামনে চলে এলাম টেরই পাইনি।

হায়দারভাই একটা চুল কাটার সেলুনের সামনে গাড়ি থামিয়ে বয়স্ক নাপিতকে ইমতিয়াজের কথা জিজ্ঞেস করতেই লোকটা হাত তুলে দেখিয়ে দিলো একটু দূরেই ইলেক্ট্রিক পোস্টের পাশে রঙচটা দেয়ালের একতলার বাড়িটা।

পুলিশের গাড়ি দেখে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা অনেকেই সটকে পড়লো। কেউ কেউ উৎসুক হয়ে ঘাড় উঁচু করে দেখতে লাগলো ঘটনা কি।

gronthagaar.blogspot.com

ইমতিয়াজদের বাড়িতে ঢোকার জন্য কোনো দরজা নেই। তখনকার দিনে অনেক বাড়িই এমন ছিলো।

বাড়িটার দিকে তাকালাম। খুবই মলিন আর পুরনো। ভেতরে ঢোকার পর কাঁচামাটির একটি আঙিনা, তারপর দু-তিনটে ঘর। চারদিকে পাকা দেয়াল হলেও ছাদ টিনের। পুলিশের পোশাকে দু-জন লোককে ঢুকতে দেখে বয়স্ক এক মহিলা ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। তার চোখেমুখে আতঙ্ক।

"এটা কি ইমতিয়াজদের বাসা?" হায়দারভাই বেশ রাশভারি কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।

মাথা নেড়ে সায় দিলেন মহিলা।

"আপনি কে?"

"ওর মা।"

"ইমতিয়াজ বাড়িতে আছে?"

"না।"

"কখন আসবে?"

মহিলা ঢোক গিললেন। "ও তো কাইল রাইতে বাড়িতে আসে নাই।"

হায়দারভাই ভুরু কুচকে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। "আসে নাই মানে?"

মহিলা একটু কাচুমাচু খেলেন। "মাজেমইদ্যেই রাইতে বাড়িতে আসে না।" কথাটা বলেই মাথা নীচু করে ফেললেন ইতমিয়াজের মা।

"রাতে বাসায় না এসে কোথায় থাকে জানেন না?"

মাথা দোলালেন বৃদ্ধা।

হায়দারভাই বাড়ির চারপাশটা দেখে নিলেন। "ইমতিয়াজের বাবা আছেন?"

"অফিসে গেছে।"

"কি করেন উনি?"

"ঢাকা ভারসিটির রেজিস্টার বিল্ডিংয়ে কাজ করে।"

"আর কেউ নেই? ভাই-বোন?"

"আমার এক মেয়ে আছে...বিয়া হইয়া গেছে, বাবা।" মহিলাকে আরো ভয়ার্ত দেখালো।

"আপনার ছেলে করে কি?"

মহিলা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে ঢোক গিলে বললেন, "আ-আমি জানি না।"

gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

"ছেলে কি করে আপনি জানেন না?" হায়দারভাই একটু চটে গেলেন।

আবারো ঢোক গিললেন মহিলা। "পলিটিক্স করে। কিন্তু কাম-কাজ কি করে তা তো জানি না, বাবা।"

"হুম," দাঁতে দাঁত পিষে আবারো আমার দিকে তাকালেন তিনি। "পলিটিক্স করলে তো আর কিছু করা লাগে না। দারুণ একখান পেশা।"

মহিলা ফ্যাল ফ্যাল চোখে চেয়ে রইলেন আমাদের দিকে।

"ওর কোনো বন্ধুবান্ধব আছে? মানে যাকে জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে ও কোথায় থাকে?"

ইমতিয়াজের মা মাথা দোলালেন। "আমি তো এমুন কাউরে চিনি না।"

একটু চুপ থেকে গম্ভীরভাবে বললেন, "মিলি যে খুন হয়েছে এটা আপনারা জানেন?"

"জানুম না কেন, ওরা তো আমাগো আত্মীয় হয়।"

"হুম।"

মহিলা ঢোক গিলে জানতে চাইলেন, "ইমতিয়াজ কি করছে, বাবা?"

হায়দারভাই বাঁকাহাসি দিলেন। "কিচ্ছু করে নাই। পাসপোর্ট করতে দিয়েছে। পাসপোর্ট করতে দিলে পুলিশ বাসায় এসে খোঁজখবর নিয়ে দেখে ঠিকানাসহ সব ঠিকঠাক আছে কি-না, বুঝলেন?"

মনে হলো মহিলা খুব অবাকই হলেন কথাটা শুনে। "ও পাসপোর্ট করতে দিসে?"

"হুম।"

"বিদেশ যাইবো নি?"

"তাই তো মনে হচ্ছে।" হায়দারভাই আমার দিকে ফিরলেন। "চলো। এখানে কাজ শেষ।"

ইমতিয়াজের বাড়ি থেকে বের হয়ে হায়দারভাই যেন আরো বেশি নিশ্চিত হয়ে গেলেন মিলির খুনটা সে-ই করেছে। গাড়িতে করে থানায় ফিরে আসার সময় আমার পিঠ চাপড়ে দিয়েছিলেন। মানে, সত্যি সত্যি পিঠে চাপড় মেরে যেভাবে বাহবা দেয়া হয় সে-রকম কিছু।

"তুমি দারুণ কাজ করেছো। অসাধারণ!"

হায়দারভায়ের মুখ থেকে কথাটা শুনে গর্বে বুক ফুলে যাবার কথা, কিন্তু আমি লজ্জায় কুকড়ে গেলাম।

"আমি ভাবতেই পারিনি এভাবে ছবি দেখে সাসপেক্ট বের করা যেতে পারে।" আমার দিকে তাকালেন। "এরজন্যে তুমি আমার কাছ থেকে আপাতত একটা সিগারেট পেতেই পারো। পরে তোমাকে বড় কিছু দেবো।"

gronthagaar.blogspot.com

কথাটা শেষ করেই একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিলেন তিনি। "এটা তোমার প্রাইজ।"

আমি সিগারেটটা হাতে নিয়ে রীতিমতো আবেগতাড়িত হয়ে পড়লাম। হোক না সামান্য একটা সিগারেট, হায়দারভায়ের কাছ থেকে একটা শব্দ-বাক্য উপহার পেলেও আমি খুশিতে সারারাত ঘুমাতাম না।

"আমি খুব খুশি হয়েছি।"

লজ্জায় আরো কুকড়ে গেলাম। সেটা কাটিয়ে ওঠার জন্য বললাম, "ইমতিয়াজই যে করেছে তা কিন্তু নিশ্চিত না, ভাই।"

"আলবৎ ও করেছে। আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর। ফ্যামিলি থেকে ডিটাচ্‌ড লোকজনই এরকম জঘন্য খুন-ধর্ষণ করে। এগুলো স্বাভাবিক মানুষের কাজ না," বেশ জোর দিয়ে বললেন। "বুড়ো মা-বাবা রেখে বাড়ির বাইরে থাকে, কাজকর্ম কিছু করে না, বিয়েশাদিও করেনি। একদম খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে, বুঝলে?"

"দেখা যাক...ইমতিয়াজকে ধরতে পারলেই সব জানা যাবে।"

"ওকে আমি ধরবোই। যেখানেই থাকুক, আমি ওকে ধরবো। আমার হাত থেকে ও পালাতে পারবে না।"

পরদিন খুব সকালে আবারো ইমতিয়াজের বাসায় গেলাম আমরা। আমাদের দেখে ইমতিয়াজের মা বেশ ভড়কে গেলেন। জানালেন তার ছেলে বাসায় নেই। গতকাল রাতেও বাসায় আসেনি।

হায়দারভাই এবার আর নিছক কথা বলে চলে এলেন না। ইমতিয়াজের ঘরটা তল্লাশি করলেন তিনি। কিছুই পাওয়া গেলো না। দশ-বাই-দশ ফুটের ছোট্ট একটা ঘর। সস্তা আমকাঠের খাট। জামাকাপড় রাখার একটি আলনা। একটা চেয়ার আর টেবিল। ঘরের দেয়ালভর্তি বাংলা সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের রঙ্গিন ছবি লাগানো। দেখেই বুঝতে পারলাম, সিনে-পত্রিকা চিত্রালী আর রূপবাণী'র পৃষ্ঠাগুলো কেটে কেটে লাগানো হয়েছে।

হায়দারভাই অবশ্য দেয়ালের দিকে নজর না দিয়ে প্রায় ফাঁকা আলনার দিকে চেয়ে রইলেন।

"ও কাল বাড়িতে এসেছিলো," আস্তে করে বললেন তিনি।

কথাটা শুনে অবাক হলাম। "তাই নাকি?"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন। "ওর মা মিথ্যে বলছে।"

হায়দারভাই কেন এমন সিদ্ধান্তে এলেন সেটা বুঝতে পারলাম আলনায় কোন জামা-কাপড় নেই দেখে।

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

ঘর থেকে বের হয়ে ইমতিয়াজের মাকে ধমক দিয়ে জানতে চাইলেন এসএম হায়দার, "মিথ্যে বললেন কেন, আপনার ছেলে তো কাল বাড়িতে এসেছিলো?"

মহিলা আমতা আমতা করে ঢোক গিললেন।

বয়স্ক মহিলা বলে খুব বেশি ধমকাধমকি না করে আমাকে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলেন তিনি।

"এখন আমরা কি করবো তাহলে? ওকে কোথায় খুঁজবো?" বাড়ির বাইরে এসে জানতে চাইলাম আমি।

সিগারেট ধরিয়ে আমাকেও ইশারা করলেন ধরাবার জন্য, তারপর প্রথম টান দিয়ে উদাস হয়ে কিছুক্ষণ ভেবে গেলেন, "তুমি ঐ মেয়েটার সাথে দেখা করবে...যার কাছ থেকে ইমতিয়াজের পরিচয় জেনেছো...ভিক্টিমের বান্ধবি।"

আমি সিগারেটে খুব আস্তে করে টান দিয়ে মনোযোগী শ্রোতার মতো চেয়ে রইলাম, যেন ফলাফল ভালো করার পর আরো বেশি মনোনিবেশ করা কোনো ছাত্র! "ঠিক আছে।"

"ওই মেয়েকে বলবে, সে যার কাছ থেকে ইমতিয়াজের বাড়ির ঠিকানাটা জোগাড় করেছে তার নাম-ঠিকানা দিতে...তার সাথে আমাদের কথা বলতে হবে।"

"ঠিক আছে, আমি কালই ফোন করবো।"

"না, না...ফোনটোন করার দরকার নেই। সরাসরি দেখা করবে," হায়দারভাই দিকনির্দেশনা দেবার ভঙ্গিতে বললেন। "ফোনে এড়িয়ে যাওয়া, না-করা অনেক সহজ হয়, বুঝলে? সামনাসামনি অতোটা সহজ হয় না। মেয়েটা হয়তো উটকো ঝামেলা মনে করে আর বেশি হেল্প না-ও করতে পারে। ভালো হয় দেখা করে বললে। তখন চক্ষুলজ্জার খাতিরে না করতে পারবে না।"

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম। যদিও আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিলো রামজিয়া সাহায্য করবে। মিলি ছিলো তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বান্ধবি।

* *

ঐদিন বিকেলে দ্বিতীয়বারের মতো আবারো গেলাম রামজিয়াদের বাসায়। ফোন করে যাইনি বলে সে আমাকে দেখে অবাকই হলো। বাড়ির সামনে এক চিলতে বাগানে কী যেন করছিলো। হাতে কাঁচামাটি লেগে আছে। পরনে গতকালকের মতোই বেলবটম প্যান্ট, তবে আজকে পরেছে শার্ট।

gronthagaar.blogspot.com

হালকা গোলাপি শার্টটা রোদে লাল হওয়া ত্বকের সাথে মিলেমিশে যাচ্ছে যেন।

"এনিথিং রং?" আমাকে দেখেই বললো সে।

"না, তা নয়। একটা দরকারে এসেছিলাম," বললাম আমি।

"ফোন করে আসলেই পারতেন, এরকম সময়ে আমি সাধারণত বাড়িতে থাকি না। আজ বাগানে কিছু নতুন গাছ লাগাচ্ছিলাম বলে বাইরে যাইনি।"

"আসলে থানার সবগুলো ফোন সকাল থেকে নষ্ট...ফোনের লাইন ঠিক করা হচ্ছে," একটা মিথ্যে বানিয়ে দ্রুত বলে দিলাম তাকে। সময়টা অ্যানালগ টেলিফোনের। ঘনঘন লাইন খারাপ হওয়াটা একেবারেই সাধারণ ঘটনা ছিলো।

"ও," বলেই দু-হাতের আলগা মাটি ঝেড়ে ফেললো। "ড্রইংরুমে গিয়ে বসুন, আমি হাত ধুয়ে আসছি।"

"দরকার নেই, খুব বেশি সময় লাগবে না। আমি এক্ষুণি চলে যাবো।"

"তাই?" মুখের সামনে থেকে অবাধ্য চুলগুলো ডানহাতের তালুর উল্টোপিঠ দিয়ে সরিয়ে দিলো সে।

আশ্বস্ত করার হাসি দিলাম। "আসলে একটা ছোট্ট ইনফর্মেশনের জন্য এসেছি।"

"বলুন?"

আমার দিকে আগ্রহি হয়ে তাকালো সে। সঙ্গে সঙ্গে টের পেলাম তার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে হিমশিম খাচ্ছি। ছোট্ট বাগানের দিকে তাকালাম। "খুব সুন্দর।"

"কি?" বুঝতে না পেরে বললো সে।

আমি আরো বেশি নার্ভাস হয়ে পড়লাম। "আপনার বাগানটা খুব সুন্দর।"

"নতুন কিছু গাছ নার্সারি থেকে নিয়ে এসেছি," একেবারে সৌজন্যমূলক হাসি দিলো। মাপা, নিঃশব্দ আর ক্ষণস্থায়ি। "হ্যা, কী যেন জানতে চেয়েছিলেন?"

আমি বাগান থেকে চোখ সরিয়ে আবার তাকালাম ওর দিকে। "ওই যে, ইমতিয়াজের ঠিকানা যিনি আপনাকে দিয়েছিলেন, উনার ঠিকানাটা দরকার। ফোন নাম্বার হলেও চলবে।"

তার দুই ভুরু কিছুটা কাছাকাছি চলে এলো। হালকা ভাঁজ পড়লো কপালে। "পারভেজের সাথে কথা বলতে চান? কেন?"

gronthagaar.blogspot.com

"ইমতিয়াজকে খুঁজে পাচ্ছি না। আমরা ওর বাসায় গেছিলাম, পাইনি। পারভেজসাহেবের সাথে দেখা করে ইমতিয়াজের ব্যাপারে কিছু জেনে নিতে চাইছি।"

"বাসায় নেই মানে?" বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলো সে। "ও কি বুঝে গেছে ওকে সাসপেক্ট করা হচ্ছে?"

"আমরা দু-দিন ওর বাড়িতে গেছিলাম। প্রথমদিন যাওয়ার পরই সে বাড়ি ছেড়েছে মনে হয়।"

"ও।" মাথা নেড়ে সায় দিলো রামজিয়া। "ঠিক আছে, ভেতরে চলুন। আমি পারভেজকে ফোন করে জিজ্ঞেস করে নেই। ওর অনুমতি ছাড়া ফোন নাম্বার পুলিশকে দেয়া ঠিক হবে না।"

আমি কিছু বললাম না।

দ্বিতীয়বারের মতো রামজিয়াদের ড্রইংরুমে ঢুকে ঠিক গতকাল যে সোফায় বসেছিলাম সেটাতেই বসলাম। ও চলে গেলো ভেতরে। খামোখা বসে না থেকে সামনের টেবিল থেকে ঐ দিনের ইত্তেফাক পত্রিকাটি তুলে নিলাম, যদিও এটা থানায় বসে পড়েছি একটু আগে।

প্রায় পাঁচ-সাত মিনিট পর রামজিয়া ফিরে এলো হাত-মুখ ধুয়ে। আমি দেখতে পেলাম পরনের শার্ট আর প্যান্ট পাল্টে ফেলেছে। মুখটা ভেঁজা। বিশেষ করে ভুরু দুটো। তাকে শিশিরে ভেঁজা গোলাপ ফুলের মতো লাগছে।

"পারভেজকে ফোন দিয়েছিলাম, ও বললো ওর সাথে ফোনে যোগাযোগ করতে পারেন। ওর নাম্বারটা লিখে রাখুন।"

আমি পকেট থেকে কলম বের করে ছোট্ট নোটবুকে টুকে নিলাম।

"আমার মনে হয় ইমতিয়াজের ব্যাপারে ও খুব বেশি কিছু জানে না।"

মাথা নেড়ে সায় দিলাম। "হুম। ওর মা-ও তেমন কিছু বলতে পারলো না।"

"ওর ব্যাপারে আপনারা কতোটুকু নিশ্চিত? মানে, ক্রাইমটা কি ও-ই করেছে?"

"আমার সিনিয়র এসএম হায়দার মনে করছেন ইমতিয়াজই কাজটা করেছে কিন্তু ওকে ধরা না গেলে, ইন্টেরোগেট করতে না পারলে নিশ্চিত হওয়া যাবে না।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। "আমারও মন বলছে এটা ইমতিয়াজেরই কাজ, বাট উই নিড প্রুফ, তাই না?"

gronthagaar.blogspot.com

আমি সায় দিলাম। আমাদের প্রমাণের দরকার–কথাটা শুনে অন্যরকম ভালো লাগার অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হলাম ক্ষণিকের জন্যে। মনে হলো আমরা দু-জন যেন একই টিমে কাজ করছি।

"ঠিক আছে," উঠে দাঁড়ালাম। "আপনাকে আবারো অনেক অনেক থ্যাঙ্কস।"

"বসুন, চা খেয়ে যান?" সে-ও উঠে দাঁড়ালো।

"না, না। আজ সময় নেই। অনেক কাজ," কথাটা বললাম নিতান্তই সৌজন্যতাবশত। আসলে আমার ইচ্ছে করছিলো আরেক কাপ চা খেতে, আরেকটু বসতে।

"ও," বললো সে। "ঠিক আছে।"

আমি মুচকি হেসে দরজার দিকে পা বাড়াবো অমনি পেছন থেকে বলে উঠলো।

"আমাকে ডেভেলপমেন্টটা জানাবেন কিন্তু।"

আমি পেছন ফিরে মাথা নেড়ে সায় দিলাম। "শিওর।"

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

অধ্যায় ৮

থানায় বসে কোনো পুলিশ বই পড়ছে এটা বোধহয় এ দেশে সবচেয়ে বিরলতম একটি ঘটনা। বর্তমানের খবর আমি জানি না, তবে ঐ সময়ে এটা যে বিরল থেকেও বিরলতম ছিলো সেটা ভালো করেই টের পেতাম।

অবসরে আমার একমাত্র সঙ্গি ছিলো বই। আর কোনো বই একটানা না পড়ে শেষ করতাম না। যে বই একটানা পড়তে পারতাম না সে বই কখনও শেষ করা হয়ে উঠতো না। রাতে হয়তো নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে একটা বই নিয়ে বসলাম, সেটা সারারাত পড়ার পরও শেষ করতে না পারলে অবধারিতভাবেই পরদিন সকালে শেষ করে ফেলতাম। কিন্তু পুলিশের চাকরি করতাম, সকাল সকাল থানায় না গিয়ে উপায় ছিলো না, তাই সঙ্গে করে অসমাপ্ত বইটা নিয়ে চলে যেতাম থানায়। সকালের দিকে একটু সময় পাওয়া গেলে নিজের টেবিলে বসেই পড়তে শুরু করে দিতাম। এ নিয়ে কলিগদের টিটকারি শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছিলাম ততোদিনে। তাদের টিপ্পনি গায়ে না মেখেই দিব্যি নিজের চেয়ারে বসে বই পড়তে পারতাম আমি। দু-কান কাটা লোকের মতো গ্রামের মাঝখান দিয়ে হেটে যাওয়ার মতোন।

একমাত্র হায়দারভাই ছাড়া থানার সবাই আমার এই বই পড়া নিয়ে হাসাহাসি করতো, টিপ্পনি কাটতো। কেউ কেউ এমনও বলতো, আমি ভাব দেখানোর জন্য এসব করি!

যাই হোক, এরকম একটা বই রাতে শেষ করতে না পেরে সকালে থানায় নিয়ে এসে পড়ার চেষ্টা করছিলাম একদিন, কিন্তু বইটার বিশাল কলেবর আর থানার ব্যস্ততার কারণে সকালের দিকেও শেষ করতে পারলাম না। বিকেলের পর একটু ফুরসত পেয়ে বইটা আবার খুলে বসলাম নিজের চেয়ারে। মাত্র শেষ হবে, তার আগেই টের পেলাম কেউ আমার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বই থেকে চোখ সরাতেই দেখি মিনহাজ। ভদ্রতার খাতিরে আমার পড়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি না করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

তাকে এ সময় থানায় দেখে আমি মোটেও অবাক হইনি। স্ত্রী হারানোর শোক কিছুটা কাটিয়ে ওঠার পর থেকেই সপ্তাহে দুয়েকদিন ব্যাঙ্ক থেকে বাসায় ফেরার পথে মিনহাজ থানায় চলে আসতো কেসের হালহকিকত

gronthagaar.blogspot.com

জানার জন্য। তাকে সন্তুষ্ট করার মতো কোনো খবর তখনও আমাদের কাছে ছিলো না। পারভেজ নামের লোকটার সাথে ফোনে কথা বলে ইমতিয়াজ সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য জানতে পারিনি। ইমতিয়াজের বন্ধুবান্ধব কারা–সে-সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না ভদ্রলোক। সরকার দলের সদ্যগঠিত যুব সংগঠনের একজন সদস্য সে–এর বেশি কোন তথ্য জানা যায়নি।

আমি মিনহাজকে এক কাপ চা দিয়ে আপ্যায়ন করে একটা আশার বাণী শুনিয়ে দিলাম–তদন্ত ভালোমতোই এগোচ্ছে, খুব জলদি আসামি ধরে ফেলবো।

"আর কতোদিন লাগবে, ভাই?" চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলো মিনহাজ। আমি কিছু বলতে যাবো তার আগেই সে বলে উঠলো, "দয়া করে আমাকে কোনো সান্ত্বনার বাণী দেবেন না। সত্যি করে বলুন, কেসের আসল অবস্থা কি।"

বুঝতে পারলাম আমার সান্ত্বনার বাণীতে কাজ হয়নি। মিনহাজ ভেতরে ভেতরে অধৈর্য হতে শুরু করে দিয়েছে। এজন্যে তাকে অবশ্য দোষও দেয়া যায় না। মিলির হত্যা-ধর্ষণের একমাত্র সন্দেহভাজন ইমতিয়াজকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ঢাকা শহর তখন আজকের মতো বড় না-হলেও, মানুষজন অনেক কম থাকা সত্ত্বেও কাজটা আমাদের জন্য খুব কঠিন ছিলো। সদ্য স্বাধীন দেশ, পুলিশে লোকবল খুবই কম, তারচেয়েও কম লজিস্টিক সাপোর্ট। মান্ধাতা আমলের থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল আর ওয়েম্বলি-স্কট পিস্তলই ভরসা। ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেবার মতো ব্যবস্থা ছিলো না। আজকের দিনের মতো রক্ত কিংবা সালিভা থেকে ডিএনএ টেস্ট করে অপরাধি সনাক্ত করার কথা তখন কল্পনাও করতে পারতাম না। হাতেগোণা কিছু মানুষের কাছে অ্যানালগ ল্যান্ডফোন ছিলো, তা-ও প্রায় সময় বিকল হয়ে থাকতো। আর অপরাধিদের তালিকা বলতে পুলিশের কাছে যা ছিলো সেটা হাস্যকরভাবেই অপ্রতুল। একমাত্র ভরসা ইনফর্মার আর তদন্তকারির নিজস্ব মেধা, অভিজ্ঞতা।

"ইমতিয়াজের বাড়িতে গিয়ে ওকে পাইনি, কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে। আমরা চেষ্টা করছি, আপনি চিন্তা করবেন না।"

"চিন্তা করবো না?" অবাক হয়ে বললো মিনহাজ। "আশ্চর্য! ও যদি ঢাকার বাইরে চলে যায়, তখন?"

"যেখানেই যাক, ওকে আমরা ধরবোই। ঢাকার বাইরে আর কতোদিন থাকবে?"

gronthagaar.blogspot.com

"তাহলে কি ওই বদমাশটা কবে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াতে শুরু করবে সেই অপেক্ষায় বসে থাকবেন আপনারা?"

মিনহাজের হতাশা বুঝতে একটুও কষ্ট হবার কথা নয়। "বসে থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না," আমি আশ্বস্ত করার জন্য বললাম। সত্যি বলতে, আমরা তখন বসেই ছিলাম, অপেক্ষায় ছিলাম কবে কোথায় ইমতিয়াজের টিকিটা দেখা যায়। "বিভিন্নভাবে খোঁজ নিচ্ছি–"

"ও যদি ঢাকার বাইরে চলে গিয়ে থাকে? ঢাকায় আর না আসে, তখন কি করবেন?" আমার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললো মিনহাজ।

হেসে ফেললাম আমি। "কী যে বলেন, পালিয়ে কতোদিন থাকবে?"

"ধরুন, ও আর ঢাকায় এলো না, তখন?" নাছোরবান্দার মতো বললো মিনহাজ।

"আশ্চর্য, আসবে না কেন?" আমিও পাল্টা বললাম তাকে।

"ধরেন, ও বছরখানেক ঢাকার বাইরে থাকলো তখন কি করবেন? কেসটা কি এভাবেই পড়ে থাকবে?"

আমি কী বলবো বুঝতে পারছিলাম না। বানিয়ে বানিয়ে সান্ত্বনা দেয়ায় খুবই অপটু ছিলাম আর মিথ্যে প্রবোধ দিতেও কেমন জঘন্য লাগতো নিজের কাছে। তাই কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে যখন ভাবছিলাম কী বলবো তখনই আমাকে রক্ষা করলেন এসএম হায়দার।

"আরে, মিনহাজসাহেব যে," প্রসন্নভাবে হেসে মিলির বিক্ষুব্ধ স্বামির পিঠে হাত রেখে বললেন তিনি। "কখন এসেছেন?"

"এই তো...একটু আগে," মিনহাজ আমতা আমতা করে বললো।

"শুনুন, মার্ডার কেস তদন্ত করা খুবই ধৈর্যের কাজ, অধৈর্য হলে চলে না।" বললেন হায়দারভাই। "খুনি যতোই চেষ্টা করুক না কেন, আমরা ওকে ধরবোই। আপনি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন। ও যদি ঢাকার বাইরে গিয়েও থাকে সেখানেও আমরা রেইড দেবো। পালিয়ে গিয়ে বাঁচতে পারবে না। এটা মনে রাখবেন।"

মিনহাজ আর কিছু বললো না। হায়দারভায়ের সামনে একটু অস্বস্তি বোধ করে সে।

মিনহাজ চলে যাবার পর হায়দারভাই তিক্তমুখে আমার সামনে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। "এই ইমতিয়াজ খুবই ধুরন্ধর। সে ভাবছে এভাবে গা ঢাকা দিয়ে থাকলে বেঁচে যাবে।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বললেন, "কিন্তু আমি ওকে ধরবোই, তুমি দেখে নিও।"

gronthagaar.blogspot.com

হায়দারভাই এটা মুখে না বললেও আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতাম তিনি এটা করবেনই।

"দুয়েকদিন পর পর নিশ্চয় বাড়িতে আসতো," বললেন হায়দারভাই। "আমরা ওর বাড়িতে যাবার পর পরই এসেছিলো, তখন শুনেছে পুলিশ ওকে খুঁজছে। আফটার অল, চোরের মন হলো ক্ষিরাই ক্ষেত, বুঝলে? বুঝে গেছে হারামজাদা, তারপরই গা ঢাকা দিয়েছে।"

হায়দারভায়ের আরেক প্রবচন–ক্ষিরাই ক্ষেত! চোরের মন পুলিশ পুলিশ না বলে তিনি সব সময় এটা বলেন। ঠিক যেমন বলেন, ঠ্যালার নাম কাশেমবাবা।

"আচ্ছা, ক্ষিরাই ক্ষেত ব্যাপারটা না-হয় বুঝলাম, কিন্তু কাশেমবাবাটা কে, ভাই?"

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। "তোমার কি ধারণা কাশেম নামে সত্যি কেউ আছে?"

"নেই?"

"হা-হা-হা!" হেসে ফেললেন এসএম হায়দার।

"আমার তো মনে হয় কাশেম নামের একজন ছিলো, লোকটা সবাইকে খুব ফাপড় দিয়ে বেড়াতো। খুব জাহাবাজ টাইপের।"

"ঠিকই ধরেছো," হাসতে হাসতে বললেন হায়দারভাই। "একদিন কাশেমের সাথে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবো।"

"কাশেম এখনও বেঁচে আছে?" বিস্মিত না হয়ে পারলাম না।

"আলবৎ বেঁচে আছে!"

* * *

সম্বিত ফিরে পেয়ে দেখি আমি ঘরে একা, রামজিয়া নেই। ও কখন ঘর থেকে বের হয়ে গেলো টেরই পাইনি। কয়েক মিনিট পর ফিরে এলো।

"তুমি কখন ঘর থেকে চলে গেলে?"

কপালে ভুরু তুলে হেসে ফেললো রামজিয়া। "মানে?"

"তুমি যে ঘর থেকে চলে গেছো আমি টেরই পাইনি।" অকপটে বলে ফেললাম।

"মাই গড, বলো কি!" বিস্মিত হলো সে। "একটু আগে না আমি তোমাকে বললাম একটা ফোন এসেছে...আসছি।"

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

"তাই?" সত্যি বলতে এটা আমার একদমই মনে পড়ছে না। আমি পুরনো স্মৃতিতে বিভোর হয়ে ছিলাম।

"তুমি দেখছি বেশ ভুলোমনা হয়ে গেছো," আমার সামনে বসতে বসতে বললো।

আমি আল্‌তো করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘরের চারপাশে তাকালাম। বাড়িটা এতো সুনসান যে ভুতুরে বলে মনে হচ্ছে। "কে কে থাকে এখানে?" প্রসঙ্গ পাল্টে জানতে চাইলাম।

"কেউ না," ছোট্ট করেই বললো।

"কাজের লোকজন?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো। "দারোয়ান, বুয়া আর কাজের এক ছেলে।"

"ভয় লাগে না?"

মুখ টিপে হাসলো রামজিয়া। "স্টেট্‌সে আমি বলতে গেলে একাই থাকতাম। লাস্ট ফোর অর ফাইভ ইয়ার্স অলমোস্ট একাই ছিলাম।"

"কেন, তোমার মেয়ে?"

"ও তো ওন্টারিও'র ইউনিভার্সিটিতে পড়তো তখন।"

"ও," আমি আর কথা খুঁজে পেলাম না।

"তুমি কি আমার এই একা থাকা নিয়ে চিন্তিত?"

"না, মানে..."

এবার মুখ টিপে হেসে ফেললো। "ডোন্ট ওরি, আমি একদম ঠিক আছি।"

আমি কিছু বললাম না। একটু লজ্জা গ্রাস করলো আমাকে।

"চারমাস ধরে তো এভাবেই আছি, তাই না?"

"আসলে দেশের অবস্থা ভালো না। খুনখারাবি, চুরি-ডাকাতি প্রচুর হচ্ছে।"

"কখন দেশের অবস্থা ভালো ছিলো বলতে পারো?" হুট করে সিরিয়াস হয়ে উঠলো রামজিয়া।

এ প্রশ্নের উত্তর খুব সহজ। এ দেশের সবার কাছেই উত্তরটা জানা। মলিন হাসি দিলাম আমি।

"সব দেশেই ক্রাইম হয় কিন্তু সভ্যদেশের কোনো সরকার, রাষ্ট্র ক্রাইমকে প্রশ্রয় দেয় না। কালচার অব ইমপিউনিটি যেন এ দেশে জেঁকে বসেছে একদম শুরু থেকে।"

আমি কোনো কথা না বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। এটাই আমার জবাব, এটাই আমার আক্ষেপ।

gronthagaar.blogspot.com

"আমরা ক্রিমিনালদের ছাড় দেই, আমাদের গভমেন্ট দেয়, রাষ্ট্র নিজেই দেয়। উই আর অ্যা হেলুভা কান্ট্রি!"

"এখন তোমাকেও দিতে হবে," হেসে হেসেই বলে ফেললাম কথাটা। "আফটার অল তুমি একজন ল-ইয়ার।"

"একজন ল-ইয়ার কখনও ক্রিমিনালদের প্রশ্রয় দেয় না। এটা একটা পপুলার মিস-কনসেপশন।"

"কিন্তু তোমরা তো ক্রিমিনালদের হয়ে ফাইট করো, করো না?"

"আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হয়ে ফাইট করি, সেটাই আমাদের পেশা। ক্লায়েন্ট ক্রিমিনাল কি-না সেটা যদি আমরা বিচার করি তাহলে আমরাই জাজ হয়ে যাবো। বাট, জাজ করা আমাদের কাজ নয়। ওটা করেন রেসপেক্টেড জাজেসরা। ওনারাই দেখেন কে দোষি আর কে নির্দোষ।"

মোহনীয় রামজিয়া আমার চোখের সামনে মুহূর্তেই একজন আইনজীবি হয়ে উঠলো। মোহনীয় এক আইনজীবি!

"সমস্যাটা কোথায় জানো?"

"কোথায়?"

"মিডিয়া কিংবা পাবলিক পারসেপশান বিচারের আগেই একজনকে ক্রিমিনাল হিসেবে স্ট্যাবলিশ করে দেয়। কেউ ভাবতে চায় না, মানতে চায় না, তাদের চোখে যে ক্রিমিনাল সে আদতে ক্রিমিনাল না-ও হতে পারে। হয়তো অন্য কেউ কাজটা করেছে, হয়তো অন্য কোনো ঘটনা আছে। এমনও হতে পারে আসামি নিজেই ভিক্টিম।"

আমি স্থিরচোখে চেয়ে রইলাম তার দিকে।

"কিন্তু এটা বেশিরভাগ সাধারণ মানুষ বুঝতে চায় না। সন্দেহভাজনের পক্ষে কোনো আইনজীবি দাঁড়ালেই তারা মনে করে উকিল টাকা খেয়ে অপরাধির পক্ষ নিচ্ছে।"

"এই সমস্যাটা মনে হয় পৃথিবীর সবখানেই আছে।"

আমার কথায় সায় দিয়ে বললো সে, "হুম, তা আছে। তবে আমাদের এ দেশে এটা অনেক বেশি পপুলার। মানুষজন দেখে অপরাধির ঠিকমতো বিচার হয় না, তাই তারা ধরে নেয় সবাই টাকা খেয়ে অপরাধির পক্ষে কাজ করে। এখানকার পাবলিক পারসেপশনটা এমনই।"

এবার আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

"কিন্তু তারা বুঝতেই চায় না সন্দেহভাজনের পক্ষে কেউ না দাঁড়ালে

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার উপায় কী? পাবলিক পারসেপশনই যদি চূড়ান্ত কথা হয় তাহলে কোনো জাজের দরকার পড়ে না।"

তার এসব কথার সাথে দ্বিমত পোষণ করার কোনো কারণই নেই। "ঠিক। প্রমাণ হবার আগ পর্যন্ত কেউই অফরাধি নয়...শুধুই সন্দেহভাজন।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। "বাই দ্য ওয়ে, একটা পর্যায়ে তো তোমরা মিনহাজকেও সন্দেহ করেছিলে, তাই না?"

আমি রামজিয়ার দিকে চেয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। ব্যাপারটা আমার জন্যে বেশ পীড়াদায়ক ছিলো। "হুম।"

"এটা কি মিনহাজ বুঝতে পেরেছিলো?"

কাঁধ তুললাম আমি। "কে জানে। হয়তো বুঝতে পেরেছিলো...হয়তো পারেনি।"

Gronthagaar.blogspot.com

অধ্যায় ৯

সন্দেহ

"কি বলেন?!"

হায়দারভাই যখন কথাটা বললো তখন প্রচণ্ড বিস্ময় আর হতাশার সাথে আমি বলে উঠেছিলাম। নিশ্চয় কোনো ভুল আছে এর মধ্যে।

"ভাই, আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না। এটা সম্ভব না," কথাটা আমি না-বলে থাকতে পারিনি।

ভেবেছিলাম হায়দারভাই রেগে যাবেন কিন্তু আমার কথা শুনে উনিও চুপ্‌সে গেলেন। দুই ভুরুর মাঝখানে তর্জনি দিয়ে ঘষতে লাগলেন চোখ বন্ধ করে। "এখনও পুরোপুরি নিশ্চিত করে বলা যাবে না কিছু," আস্তে করে বললেন তিনি। "কিন্তু ব্যাপারটা গুরুত্ব না দিয়েও পারছি না। এখন পর্যন্ত এই কেসে এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্লু...তারচেয়েও বড় কথা, আই-উইটনেস পাওয়া গেছে।"

আমি চুপ মেরে রইলাম কয়েক মুহূর্ত। যে দুটো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জোগাড় করেছেন হায়দারভাই সেটা আমাকে ভীষণভাবে ভাবিয়ে তুলেছিলো সেদিন।

মিলিদের দোতলার ভাড়াটিয়া যতো লুকোছাপাই করুক না কেন, আমি ভালো করেই জানতাম হায়দারভায়ের হাত থেকে ওরা নিস্তার পাবে না। ভেবেছিলাম ঐ পরিবারটি অন্য সবার মতো খুনখারাবির ঘটনায় ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। তারা এসব ঘটনা থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখার চেষ্টা করবে সেটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া, এখনকার মতো তখনও পুলিশ জনগনের বন্ধু হয়ে উঠতে পারেনি। বৃটিশ আমল থেকেই পুলিশবাহিনীকে ক্ষমতাসীনদের লাঠিয়াল হিসেবেই দেখে আসছে সাধারণ মানুষ। নিরীহ জনগণকে হয়রানি করাই যেন তাদের কাজ।

কিন্তু হায়দারভাই যা জানতে পেরেছেন সেটা খুবই মারাত্মক। মিলিদের দোতলার ভাড়াটিয়া তাদের একমাত্র সন্তানকে নানা-নানির বাসায় পাঠিয়ে দিয়েছিলো ঘটনার পর পরই। ছেলেটার মা, স্কুল-শিক্ষিকা বলেছিলো সপ্তাহখানেক পর সে নানু বাড়ি থেকে ফিরে আসবে। কথাটা হায়দারভাই বিশ্বাস করেননি। তিনি সন্দেহ করেছিলেন, বাচ্চা ছেলেটা কিছু একটা দেখে

gronthagaar.blogspot.com

ফেলেছে, সেজন্যেই ওর বাবা-মা উদ্বিগ্ন হয়ে ওকে আড়াল করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। তারা চাইছে না এইসব খুন-খারবির মতো ঘটনায় তাদের ছেলে জড়িয়ে পড়ুক। কিন্তু আগেই বলেছি, হায়দারভাই কেমন নাছোরবান্দা। তিনি সোজা ছেলেটার স্কুলে গিয়ে হাজির হোন। অল্পবয়সি ছেলেটাকে পটিয়ে-পাটিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনে নিয়েছেন। চার-আনা দামের একটা কুলফি-বরফ নাকি ছেলেটার মুখ খুলতে সাহায্য করেছিলো খুব সহজে। ঐ সময়কার বাচ্চাদের কাছে এই আইসক্রিমতুল্য দেশিয় খাবারটি ছিলো ভীষণ জনপ্রিয়।

যাই হোক, ছেলেটা বলেছে ঐদিন বিকেলে যখন বৃষ্টি নামতে শুরু করে তখন সে সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে জমে থাকা পানিতে কাগজের নৌকা ভাসাতে গিয়ে মিলির হাজব্যান্ডকে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলো।

আমি হতভম্ব হয়ে পড়লাম। কথাটা বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছিলো। "কিন্তু ওরকম একটা বাচ্চা ছেলের সাক্ষি তো রিলায়েবল হতে পারে না...কোর্টও গ্রহণ করবে না, তাই না?"

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন হায়দারভাই। "ছেলেটা আরো কি বলেছে জানো?" আমার জবাবের অপেক্ষা না করেই আবার বললেন, "ও যখন সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে দাঁড়িয়ে এটা দেখছিলো তখন ওর মা এসে ওকে টেনে ঘরে নিয়ে যায়।"

"ওহ্!" চুপসে গেলাম আমি। "তার মানে, ছেলেটার মা-ও দেখেছে!"

একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এলো আমার ভেতর থেকে। মিনহাজকে স্ত্রি-হত্যাকারি হিসেবে ভাবতে খুব কষ্ট হচ্ছিলো।

"আমি ছেলেটার মায়ের সাথে কথা বলেছি আজ। মহিলা অবশ্য বলছে ওটা মিনহাজ ছিলো কি-না নিশ্চিত করে বলতে পারছে না।"

"কেন?" নিজের চেয়ারে সোজা হয়ে বসলাম আমি।

"মাথার উপরে ছাতা থাকার দরুণ চেহারাটা সে দেখতে পায়নি। ছেলেটাও দেখতে পায়নি। তবে ভদ্রমহিলা বলেছে, 'মিলির বাসায় মিনহাজ ছাড়া আর কে ঢুকবে অমন সময়।' "

"তারপরও, ওটা যে মিনহাজ ছিলো সেটা কিন্তু নিশ্চিত করে বলা যায় না। আপনার সেই উটকো মেহমানও হতে পারে?" নিজের কাছেই কথাটা বড় বেশি আশাবাদি বলে মনে হলো।

"সেই সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। কিন্তু মিনহাজের ব্যাঙ্কে গিয়ে আরেকটা কথা জেনেছি আমি। সেটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ।"

"কি জেনেছেন?" আমি উদগ্রিব হয়ে জানতে চাইলাম।

gronthagaar.blogspot.com

"মিলি যেদিন খুন হয় সেদিন মিনহাজ ক-টা বাজে ব্যাঙ্ক থেকে বের হয়েছিলো, জানো?"

আমার দম বন্ধ হয়ে গেলো। "ক-টায়?"

"চারটার একটু আগে।" বলেই দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এসএম হায়দার। "অন্যসব দিনের চেয়ে বেশ আগেভাগে বের হয়ে গেছিলো। তার এক কলিগ বলেছে, কী একটা দরকারের কথা বলে নাকি একটু আগেই বের হয়ে যায় সে।"

"ওর ব্যাঙ্ক থেকে বাসার দূরত্ব?"

"হেটে গেলে দশ মিনিট। রিক্সায় করে গেলে আরো কম সময় লাগবে।" গম্ভীর হয়ে বললেন হায়দারভাই, "দুটো ইনফর্মেশন কিন্তু আমার কাছ খুব ভাইটাল মনে হচ্ছে।"

তার এ কথার সাথে আমি অবশ্য সায় দিতে বাধ্য হয়েছিলাম।

"এখন ইনফর্মেশন দুটো খতিয়ে দেখা দরকার।"

"কিন্তু এটা কিভাবে করবেন?"

"মিনহাজ ঐদিন ব্যাঙ্ক থেকে কেন তাড়াতাড়ি চলে গেছিলো আর সে ছাতা ব্যবহার করে কি-না সেটা জেনে নিতে হবে। আর এই কাজটা করবে তুমি।"

"আমি?!" কথাটা শুনে আঁতকেই উঠলাম।

"হুম। কারণ তোমার সাথে ও সহজে কথা বলে। আমাকে দেখলেই তো কেমনজানি করে। সহজই হতে পারে না।"

এটা আমিও বুঝি, কিন্তু অপ্রিয় কাজটা আমার ঘাড়ে এসে পড়ায় অস্বস্তি বোধ করলাম।

"মিনহাজের ছাতাটা কি রঙের সেটাও জেনে নিতে হবে।" হায়দারভাই বললেন।

"ওই মহিলা আর বাচ্চা ছেলেটা কি বলেছে, ছাতাটা কি রঙের ছিলো?"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন তিনি। "কালো।"

সমস্যা হলো, প্রায় নব্বইভাগ ছাতাই এ রঙের হয়ে থাকে। মিনহাজের যদি আদৌ কোনো ছাতা থেকে থাকে–একজন ব্যাঙ্ক অফিসার হিসেবে থাকাটাই স্বাভাবিক–তাহলে সেটার রঙ কালো হবার সম্ভাবনাই বেশি।

"ধরেন, খোঁজ নিয়ে দেখলাম মিনহাজের কাছে কালো রঙের ছাতা আছে, তাহলে কি প্রমাণ হয়ে যায় ঐদিন ভাড়াটিয়া মহিলা ওকেই দেখেছে?"

"প্রমাণ হবে আদালতে," আস্তে করে বললেন হায়দারভাই, "আমাদের

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

কাজ হলো সম্ভাব্য সব সাক্ষি-প্রমাণ জোগাড় করা," একটু থেমে আবার বললেন, "আমাদের তদন্তে এই দুটো ইনফর্মেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।"

* *

হায়দারভায়ের কথায় পরদিনই আমি আবারো মিনহাজের সাথে দেখা করতে গেলাম এক ধরণের অস্বস্তি নিয়ে। তার বাসার কাছে আসতেই পথে দেখা হয়ে গেলো আমাদের। জানতে পারলাম, অফিস থেকে ফেরার পথে পাশেই আজিমপুর কবরস্তানে গেছিলো মিলির কবরটা দেখতে।

মিনহাজের বাসায় গিয়ে ওর সাথে সাধারণ কিছু কথা বলার পরও সঙ্কোচের কারণে দরকারি প্রশ্নগুলো করতে পারছিলাম না। অবশেষে নিজের দুর্বল পুলিশ সত্তাকে জাগিয়ে তুললাম একটা ক্যাপস্টেন সিগারেটের বিনিময়ে। ভাগ্যভালো মিনহাজও সিগারেট খায়, তার ব্র্যান্ড অবশ্য ডানহিল। তো, দু-জনে সিগারেট ধরিয়ে কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে অনেকটা কথারছলে জিজ্ঞেস করে বসলাম, "আপনি সব সময় কয়টার দিকে অফিস থেকে বাসায় ফেরেন?"

আমার দিকে স্থিরচোখে চেয়ে থেকে বললো সে, "ছ'টা-সাতটা...বড়জোর সাড়ে সাতটা," একটু থেমে আবার বললো, "এটা কেন জানতে চাইছেন?"

তার কপালে হালকা ভাঁজ দেখতে পেলাম। "মনে হয় খুনি এটা জানতো। আমরা নিশ্চিত সে আপনাদের পরিচিত কেউই হবে," বললাম তাকে।

আমার কথা শুনে মিনহাজের কপালের ভাঁজ মিইঁয়ে গেলো। মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

"কিন্তু ঘটনার দিন মনে হয় একটু আগেভাগে চলে এসেছিলেন, তাই না?" খুব সতর্কতার সাথে প্রশ্নটা করলাম, পাছে না আবার মনে করে বসে আমি তাকেই সন্দেহ করছি।

"হ্যা।"

"কেন?"

প্রশ্নটা শুনেই মিনহাজের চেহারায় এমন অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো। বুঝতে পারলাম আমার সমস্ত সতর্কতা বিফলে গেছে। আবারো গুছিয়ে নিতে থাকলাম এরপর কি বলবো কিন্তু আমাকে রেহাই দিয়ে সে নিজে থেকেই বলতে লাগলো।

gronthagaar.blogspot.com

"ঐদিন অফিস থেকে একটু তাড়াতাড়ি বের হয়েছিলাম নিউমার্কেটে যাবো বলে। টেইলর থেকে ওর একটা ড্রেস তুলে আনার কথা ছিলো, গিয়ে দেখি মার্কেট বন্ধ। ঐদিন যে মঙ্গলবার ছিলো সে-কথা মনেই ছিলো না।" একটু থেমে দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে। "খুব বৃষ্টি হচ্ছিলো বলে কিছু সময়ের জন্য মার্কেটে আটকা পড়ে গেছিলাম। বৃষ্টি কমতেই সোজা বাসায় চলে আসি।"

আমি আর কিছু জানতে চাইলাম না। বাসায় এসে স্ত্রির লাশটা যে আবিষ্কার করেছে সেটা আমরা জানি।

"বৃষ্টি না থাকলে আরেকটু আগেই চলে আসতাম," দু-হাতে মুখ ঢেকে ফেললো চাপা কোনো আক্ষেপে। "হয়তো মিলিকে বাঁচাতে পারতাম।" এবার বেশ শব্দ করে আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ভদ্রলোক।

শোকাতুর কাউকে সান্ত্বনা দেবার গুণাবলী নেই আমার। এ কাজটা আমি করতেও পারি না। জোর করে করতে গেলে ভালোর চেয়ে খারাপই হয় বেশি।

"আমার মনে হয়, আমি বাসায় ঢোকার কয়েক মিনিট আগে খুনি সটকে পড়েছিলো।"

এবার মুখ তুলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালাম ভদ্রলোকের দিকে। আমাদের ঘরোয়া পরিবেশ থমথমে হয়ে গেলো। অনেকক্ষণ দু-জনের কেউ কোনো কথা বললাম না, চুপচাপ সিগারেট টেনে গেলাম। আমি পড়ে গেলাম মুশকিলে। ছাতার কথা জিজ্ঞেস করবো কিভাবে বুঝতে পারছিলাম না। খুবই অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেছিলাম। কিন্তু পুলিশের চাকরি করি, এসেছি হত্যা-মামলার তদন্ত করতে, আমাকে তো সঙ্কোচের মধ্যে পড়ে গেলে হবে না। আমি কেন মিনহাজের কাছে এটা জিজ্ঞেস করতে এতো কুণ্ঠিত বোধ করছি? সত্যি বলতে, মিনহাজকে স্ত্রি-হত্যাকারী হিসেবে ভাবতেই পারিনি। কেন পারিনি তার হয়তো অনেক কারণ আছে। তবে একটা কারণ কোনোভাবেই এড়িয়ে যেতে পারিনি আমি। অনেক স্বামিই নিজের স্ত্রিকে খুন করে কিন্তু খুন করার আগে ধর্ষণ করেছে এমন কোন কথা আমার জানা ছিলো না। তাছাড়া, হায়দারভায়ের 'উটকো মেহমান' তত্ত্বটাও আমার কাছে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়েছিলো। যদি তা-ই হয় তাহলে খুনি হিসেবে মিনহাজ কোনদিক থেকেই খাপ খায় না।

আমি যখন ভাবছি কিভাবে মিলির স্বামিকে ছাতার কথাটা বলবো তখনই ত্রাণকর্তা হয়ে হাজির হলো বৃষ্টি!

মিনহাজকে বললাম আমাকে এক্ষুণি থানায় ফিরে যেতে হবে কিন্তু যে

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

বৃষ্টি নেমেছে, বাইরে বেরোলেই ভিজে একাকার হয়ে যাবো। এই গলিটার শেষ মাথায় মেইনরোডে না গেলে আবার রিক্সা পাওয়া যায় না। তার কাছে কি একটা ছাতা হবে? মেইনরোড পর্যন্ত এগিয়ে দিলেই হবে। ওখান থেকে রিক্সা নিয়ে চলে যেতে পারবো।

আমাকে হতাশ করে মিনহাজ জানালো তার কাছে ছাতা আছে। সেটা আনতে ভেতরের ঘরে চলে গেলো সে, আর আমি প্রচণ্ড টেনশন নিয়ে বসে রইলাম ছোট্ট ড্রইংরুমটায়। হায়দারভায়ের একটি কথা বার বার মাথায় উচ্চারিত হতে লাগলো : স্ত্রি খুন হলে প্রাইম-সাসপেক্ট হয় স্বামি!

ছাতা নিয়ে ঘরে ফিরে এলো মিনহাজ। সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের ভেতর থেকে একটা ভারি পাথর যেন সরে গেলো। মিনহাজের হাতের ছাতাটা কালো রঙের ছিলো না। লাল-সাদা-নীলের মিশ্রণে মেয়েলি ধরণের একটি ছাতা।

"এটা মিলির ছাতা। আমি তো ছাতা ব্যবহার করি না, কেমনজানি লাগে।"

মুচকি হেসে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। নিজেকে খুব নির্ভার মনে হচ্ছিলো তখন। অপ্রীতিকর সন্দেহের ভার অনেক বেশি ওজনের হয়ে থাকে! সেটা থেকে মুক্তি পাওয়াটা স্বস্তিরই বটে। তবে সেই স্বস্তিটা শুধুমাত্র আমার নিজস্ব ছিলো।

তারপরও হায়দারভাই মিনহাজকে পুরোপুরি সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দিলেন না। আমার কাছ থেকে সব শুনে অনেকক্ষণ চুপ মেরে রইলেন। তারপর ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে বিচার করলেন বিষয়টা।

"নিউ মার্কেটে যাবার কথাটা বিশ্বাস করা যায় না, এটা হতে পারে মিনহাজের...কী যেন, বলে?" আমার দিকে সপ্রশ্ন চেয়ে রইলেন সাহায্যের আশায়।

আমি বুঝতে পারলাম না প্রথমে। "কিসের কথা বলছেন?"

"ঐ যে, আসামি যখন ইয়ে তৈরি করে...উফ্!" বিরক্ত হয়ে বললেন তিনি। "তুমি যে-সব গোয়েন্দা কাহিনী পড়ো সেখানে এটাকে কী যেন বলে?"

সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম উনি কি বলতে চাচ্ছেন। "অ্যালিবাই?"

"হ্যা-হ্যা, অ্যালিবাই। মিনহাজ এটাকে অ্যালিবাই হিসেবে দাঁড় করাতে পারে।"

gronthagaar.blogspot.com

"আর ছাতার ব্যাপারটা? মিনহাজ কিন্তু ছাতা ব্যবহার করে না।"

ঠোঁট ওল্টালেন এসএম হায়দার। "এটা তার টেস্টমেন্ট। কথাটা সত্যি কি-না খতিয়ে দেখতে হবে।"

একটু হতাশই হলাম আমি।

"মিনহাজ ছাতা ব্যবহার করতো কি-না ওর কলিগরা বলতে পারবে। পাড়ার লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেও জানা যাবে। ওর বাড়ির সামনে যে মুদি দোকানিটা আছে সে-ও বলতে পারবে।"

আমি চুপ মেরে রইলাম। হায়দারভায়ের কথায় যুক্তি আছে কিন্তু আমার মন সে-যুক্তি মানতে চাইছে না।

"মিনহাজ যদি খুনি হয়ে থাকে আর সে যদি বুঝে যায় দোতলার ভাড়াটিয়া ওকে ছাতাসহ দেখে ফেলেছে তাহলে ছাতাটা নিশ্চয় ভ্যানিশ করে দিয়েছে এতদিনে।"

"কিন্তু ভাই, মিনহাজ কেন তিনমাসের নতুন বউকে খুন করতে যাবে?" আমি আর ধৈর্য ধরে রাখতে পারলাম না। "নিজের বউকে খুন করার আগে ধর্ষণ করতে যাবে কোন্ দুঃখে? তার মোটিভটা কি?"

কাঁধ তুললেন হায়দারভাই। "মিনহাজ যদি খুনি হয়ে থাকে তাহলে একটা না একটা মোটিভ তো থাকবেই। হয়তো ঘরে ফিরে মিলিকে ইমতিয়াজের সাথে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে রাগের মাথায় খুন করে ফেলেছে?"

"কী যে বলেন না!" আমি কোনমতেই একমত হতে পারলাম না।

"আহা, সম্ভাবনার কথা বললাম। তুমি দেখি কোনভাবেই মেনে নিতে পারছো না মিনহাজ খুনি হতে পারে!" বিরক্ত হলেন তিনি। "শোন, তদন্ত করার সময় একটা কথা মনে রাখবে–কেউই সন্দেহের বাইরে নয়।"

হায়দারভায়ের কথায় মাথা নেড়ে সায় দিলেও আমি কোনভাবেই মিনহাজকে সন্দেহের তালিকায় ঠাই দিতে পারিনি।

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

অধ্যায় ১০

"তোমার মতো আমিও বিশ্বাস করি মিনহাজ কাজটা করেনি," আল্‌তো করে বললো রামজিয়া। "যতোদূর জানি, মিলির সাথে মিনহাজের চমৎকার সম্পর্ক ছিলো। এরকমটি স্যাটেলড ম্যারেজের বেলায় কমই দেখা যায়। ছেলে হিসেবে মিনহাজও কিন্তু দারুণ। ওরা ছিলো চমৎকার একটি জুটি।"

তার কথায় সায় দিলাম আমি। "হুম, আমারও তাই মনে হয়।"

"তবে কি জানো?" আমার জবাবের অপেক্ষা না করেই সে বলতে শুরু করলো, "স্টেট্‌সে এরকম অনেক কেস দেখেছি, হাজব্যান্ড নিজের হাতে স্ত্রিকে খুন করে এমন ভান করতো যে, ঘটনাটা নিছক কোনো বার্গরালি...ডাকাতি। শেষপর্যন্ত তদন্তে বেরিয়ে আসতো স্বামিই খুনটা করেছে।" দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে। "স্বীকার করছি, মাঝেমধ্যে আমারও সন্দেহ হতো খুনটা মিনহাজ করেনি তো। বিশেষ করে ওর অদ্ভুত আচরণের কারণে।"

চুপচাপ শুনে গেলাম তার কথা। এ বিষয়টা নিয়ে আমিও অনেক ভেবেছি কিন্তু সত্যি বলতে, কোনো কূলকিণারা করে উঠতে পারিনি। মাঝেমধ্যে এমন চিন্তা আমার মাথায়ও যে আসেনি তা নয়। রামজিয়াকে যে বইটার পাণ্ডুলিপি দিয়েছি সেখানেও এমন ইঙ্গিত আছে। অন্তত পাঠকের কাছে মনে হতে পারে এটা। যদিও আমি সচেতনভাবে মিনহাজের দিকে সন্দেহের আঙুল তুলিনি কখনও। বরং পরবর্তিতে একটি ঘটনায় মিনহাজের উপরে আমার বিশ্বাস আরো বেড়ে গেছিলো। দিনটার কথা স্পষ্ট মনে আছে আমার।

সাতদিনের পুরনো এক মহিলার লাশ কবর থেকে তুলে আবার পোস্টমর্টেম করার দরকার পড়েছিলো। নিহতের পরিবার থেকে অভিযোগ করা হয়েছিলো, ওদের মেয়ে আত্মহত্যা করেনি, পাষণ্ড স্বামি নিজের হাতে খুন করেছে। যাই হোক, ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে কাজটা করার সময় থানা থেকে আমাকে যেতে বলা হয়। পুলিশি জীবনে এরকম কাজ অবশ্য ওটাই আমার প্রথম ছিলো না, এর আগেও আরো একবার লাশ উত্তোলনের কাজ তদারকি করেছি। তো, আমি কয়েকজন কনস্টেবল, ডোম আর

gronthagaar.blogspot.com

ম্যাজিস্ট্রেটকে নিয়ে আজিমপুর কবরস্তানে চলে যাই। কবর থেকে লাশ তোলার সময় নাকে রুমাল চেপে একটু দূরে সরে যেতেই দেখি, বিশ-ত্রিশ গজ দূরে, একটি কবরের সামনে এক ভদ্রলোক বসে অঝোরে কেঁদে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পেরেছিলাম।

মিলির স্বামি!

প্রয়াত স্ত্রীর প্রতি মিনহাজের এমন ভালোবাসা আমাকে নাড়িয়ে দিয়েছিলো। মানুষটার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা তৈরি হয়েছিলো আমার মনে। হায়দারভায়ের মতো পক্ষপাতিত্বহীন থাকা আর সম্ভব হয়নি।

"তোমরা তো ওকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছিলে, তাই না?"

তার কথায় সম্বিত ফিরে পেলাম আমি। মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললাম, "হুম। যেকোন কেসেই একাধিক সন্দেহভাজন থাকে। তাদের মধ্যে হয়তো কেউ একজন কাজটা করেছে, আবার এমনও হতে পারে, সন্দেহভাজনদের কেউ কাজটা করেনি। যে করেছে সে আড়ালেই থেকে গেছে। তাকে আর ধরা যায় নি–এমন কেসও কিন্তু প্রচুর আছে।"

"তা ঠিক। ইউরোপ-আমেরিকার মতো উন্নত দেশের পুলিশও প্রচুর কেস সল্‌ভ করতে ব্যর্থ হয়। জ্যাক দ্য রিপারের কেসটা কিন্তু ওরকমই ছিলো।"

এটা আমি ভালো করেই জানতাম। এরকম আনসল্‌ভ মার্ডার কেসের উপরে বেশ কয়েকটি বই আমার পড়া ছিলো। এতোগুলো খুনের এই কুখ্যাত কেসটি তুখোড় গোয়েন্দারা আজো মিমাংসা করতে পারেনি।

"আচ্ছা, তোমাদের কি কখনও মনে হয়েছে, ইমতিয়াজ কাজটা করে নি?"

আমি রামজিয়ার দিকে চেয়ে রইলাম কিছুক্ষণ, তারপর বেশ জোর দিয়ে বললাম, "না। এটা আমাদের কখনও মনে হয়নি।"

কথাটা আমি জোর দিয়ে বললাম কারণ, এক পর্যায়ে হায়দারভাই ইমতিয়াজের ছবিটা নিয়ে মিলির বাসায় সামনে যে মুদি দোকানি আছে তাকে দেখিয়েছিলেন। দোকানি জানিয়েছিলো, মিলি খুন হবার আগে বেশ কয়েকদিন তার দোকানের সামনে এসে ঘুরঘুর করতো ছবির এই লোক। সিগারেট খেতো, গলির এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত পায়চারি করতো। আর এ কাজটা করার সময় তার হাতে ছাতাও দেখেছে দুয়েকবার।

তো, হায়দারভাই কথাটা শুনে খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। আমার অবশ্য ভালো লেগেছিলো তথ্যটা জেনে। মিনহাজ আর ছাতার মধ্যে যে

Grothagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

কানেক্শান সেটা পুরোপুরি দূর হয়ে গেলো বলে। ইমতিয়াজই খুনটা করেছে। সে ছাতা ব্যবহার করে। মুদি দোকানির কথা সত্যি না হয়ে উপায় নেই। তারপরও, পুরোপুরি নিশ্চিত হবার জন্য হায়দারভাই একটা কাজ করেছিলেন। একটা ছাতাসহ আমাকে নিয়ে ভরদুপুরে চলে গেছিলেন মিলিদের বাসায়। মিনহাজ আবার অফিস করতে শুরু করেছে তখন, নীচতলাটা খালিই ছিলো। দোতলার ভাড়াটিয়া আর তার বাচ্চা ছেলেটি সিঁড়ির যেখান থেকে মিলির ঘরের সদর দরজায় একজনকে ছাতাসহ দেখেছিলো ঠিক সেখানে দাঁড়ালেন হায়দারভাই। আমাকে ছাতা ফুটিয়ে মাথার উপরে ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে বললেন দরজার সামনে। নিঃসন্দেহে ব্যাপারটার মধ্যে নাটকিয়তা ছিলো কিন্তু পুরোপুরি নিশ্চিত হবার জন্য এছাড়া আর উপায়ও ছিলো না।

এই ডেমস্ট্রেশনের ফলও মিনহাজের পক্ষে গেলো। সিঁড়ির উপর থেকে ছাতা মাথায় দেয়া আমার মুখ দেখতে পাননি হায়দারভাই। বুঝতে পারলাম, দোতলার ভাড়াটিয়া মহিলা আর তার নাবালক ছেলেও একইভাবে খুনির মুখটা দেখতে পায়নি।

"আমি এখনও বিশ্বাস করি, খুনটা ইমতিয়াজই করেছে।" বেশ জোর দিয়ে বললাম।

রামজিয়া আল্‌তো করে মাথা নেড়ে সায় দিলো। তারপর কিছু একটা মনে পড়ে গেছে এমন ভঙ্গি করে বলে উঠলো, "ভালো কথা, তোমার বইগুলো কি নিউ মার্কেটে পাবো? পড়ার অভ্যাস তো হারিয়েই গেছে...ভাবছি তোমাকে দিয়ে শুরু করবো আবার।"

মুচকি হাসলাম আমি। "নিউ মার্কেটে কিছু বইয়ের দোকান এখনও আছে, ওখানে গেলে পাবে মনে হয়। তবে নীলক্ষেতের বইয়ের দোকানে গেলে অবশ্যই পাবে। ঢাকায় ওটাই সবচেয়ে বড় বইয়ের মার্কেট।"

"এখানে আসার পর আর ওদিকটায় যাওয়া হয়নি। আচ্ছা, বুক পয়েন্ট কি এখনও আছে?"

* * *

ইরাকি কবরস্তানের পাশে মিনহাজের বাসা থেকে ছাতা সংক্রান্ত ইনকোয়্যারি শেষে করে নির্ভার হয়ে বেরিয়ে আসতেই নিউমার্কেটের দক্ষিণ গেটের কাছে আমি থমকে গেছিলাম হঠাৎ করে।

gronthagaar.blogspot.com

“হ্যালো? আপনি এখানে?”

একটা নারীকণ্ঠ ডেকে উঠলে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি চোখে গগল্‌স আর শর্ট-পাঞ্জাবির সাথে বেলবটম পরা এক আপ-টু-ডেট তরুণী নিউ মার্কেটের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে অছে। দেখামাত্রই চিনতে পারলাম—রামজিয়া শেহ্‌রিন।

“আ-আপনি?” আমি কিছুটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছিলাম।

“এই তো, মার্কেটে এসেছিলাম।”

তার চোখে গগল্‌স, আকারে একটু বড়। ওটাই তখন হালফ্যাশন ছিলো। সত্যি বলতে, গগল্‌স পরা রামজিয়াকে দেখে আমার একটু অচেনা বলে মনে হলো। আমি তার চোখ দেখতে পাচ্ছিলাম না। গাঢ় খয়েরি রঙের কাঁচ আড়াল করে রেখেছিলো।

“ও,” আর কিছু না বলে একটু হাসি দিলাম শুধু।

“এদিকে কোথায় এসেছিলেন, মিনহাজের বাসায়?”

“উম?” নিউমার্কেট থেকে মিনহাজের বাসা হাটাদূরত্বে। সুতরং যৌক্তিকভাবেই আন্দাজ করতে পেরেছিলো সে। “হ্যা, কেসের ব্যাপারে একটু দরকার ছিলো।”

“মিলির কেসটার কোনো ডেভেলপমেন্ট?”

“আমরা কাজ করছি, আশা করি কয়েকদিনের মধ্যে কিছু একটা বের করতে পারবো।”

আমার জবাবে সন্তুষ্ট হলো কি-না বুঝতে পারলাম না। “ইমতিয়াজের কোনো খোঁজ পেয়েছেন? আপনি কিন্তু আমাকে আর কিছু জানাননি।”

সুন্দরি মেয়েরা যখন মিষ্টি করে অনুযোগ করে তখন পুরুষ মানুষ কাচুমাচু খেতে বাধ্য। আমিও কাচুমাচু খেলাম। “না...মানে...” কথা খুঁজে পেতে একটু কষ্টই হলো, “চেষ্টা করে যাচ্ছি...ধরতে পারবো আশা করছি। ওকে ধরতে পারলে আপনাকে ফোন করে জানাবো।”

“অবশ্যই জানাবেন,” রামজিয়া বললো।

“আপনি কি বই কিনতে এসেছিলেন?” বেমক্কা জিজ্ঞেস করে ফেললাম আমি। কেন করলাম জানি না। হয়তো কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে, কিংবা তার বাড়িতে বুকসেল্‌ফ দেখে ধরেই নিয়েছিলাম আমার মতো সে-ও বই পড়ে।

“মাই গুডনেস! আপনি কিভাবে জানলেন?”

তার বিস্ময় দেখে অবাকই হলাম একটু। বুঝতে পারলাম, খুব সহজেই বিস্মিত হয় মেয়েটি।

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

"আসলে আমি সব সময় নিউ মার্কেটে বই কিনতে আসি তো তাই," বোকার মতো হেসে বললাম।

"আপনি যে খুব বই পড়েন সেটা আমি বুঝতে পেরেছি," স্মিত হেসে বললো সে। "আই লাভ ইট।"

"জি?" আবারো বোকার মতো বলে ফেললাম।

"বই পড়ার কথা বলছিলাম...আই জাস্ট লাভ ইট।"

"ও।" আর কোনো কথা খুঁজে পেলাম না।

"কিন্তু যে বইটা কিনতে এসেছি সেটা পেলাম না," মন খারাপ করে বললো সে।

"কি বই?"

"নীরদচন্দ্র চৌধুরির 'বাঙালী জীবনে রমণী'।"

"ওটা তো বুক পয়েন্টে পাবেন না," আমি বেশ নিশ্চিত হয়েই বললাম। এই দোকানের নিয়মিত ক্রেতা আমি। ওদের প্রায় সব বইয়ের নামই আমার জানা। প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার ঢুঁ মারি ওখানে। এই বইটা পাঁচ-ছয় বছরের পুরনো, কয়েক মাস ধরেই বইটা ওদের কাছে নেই।

"তাই নাকি?" হতাশ হলো সে। "আপনার কাছ থেকে নামটা শোনার পর মনে হলো ওর এই বাঙলা বইটা পড়ি।"

তাকে আশাহত হতে দেখে আমি বলে ফেললাম, "বইটা আমার কাছে আছে, আপনি চাইলে আমার কাছ থেকে নিয়ে পড়তে পারেন।"

"তাই?" আবারো কপালে ভুরু তুলে বিস্মিত হলো সে। "সো নাইস অব ইউ।"

পরদিনই আমি 'বাঙালী জীবনে রমণী' নিয়ে হাজির হই রামজিয়াদের বাড়িতে। এক কাপ চা না খাইয়ে সে আমাকে বিদায় দেয়নি। সেই সঙ্গে নিজের বুকসেল্‌ফ থেকে পছন্দের কোনো বই নিয়ে যাবার জন্যেও বেশ পীড়াপীড়ি করলো। অগত্য বাধ্য হয়েই আমি গ্রাহাম গ্রিনের একটা ক্রাইম-ফিকশন ধার নেই।

এভাবেই শুরু রামজিয়া শেহরিনের সঙ্গে আমার বইয়ের লেনদেন পর্ব।

gronthagaar.blogspot.com

অধ্যায় ১১

"তোমার কি মনে হয়, ও বেঁচে আছে?"

রামজিয়ার দিকে চেয়ে রইলাম। "আমি নিশ্চিত নই। তবে আমার কেনজানি মনে হয় বেঁচে আছে।"

রামজিয়া কিছু না বলে শুধু মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"মিলিকে নিয়ে লেখা শুরু করার আগে ইমতিয়াজের খোঁজ করার চেষ্টা করেছিলাম। ওর কোন পরিচিত লোককে আমি চিনি না, কার কাছে গিয়ে খোঁজ করবো–তাই দীর্ঘদিন পর কাঠালবাগানে ওদের বাড়িতে চলে গেছিলাম।"

"আচ্ছা...তারপর?" আগ্রহি হয়ে উঠলো সে।

"ওখানে গিয়ে দেখি আশেপাশের বাড়িগুলো উধাও হয়ে গেছে। ওদের সেই একতলার পুরনো বাড়িটা নেই, ওখানে এখন নতুন ছয়তলার একটি বিল্ডিং। ইমতিয়াজের মা-বাবা কেউ বেঁচে নেই। ওর বড়বোন থাকে একটা অ্যাপার্টমেন্টে। সম্ভবত সে-ই এখন বাড়ির মালিক। কয়েক বছর আগে ডেভেলপারকে দিয়ে এটা ডেভেলপ করেছে। ভদ্রমহিলার কাছে ইমতিয়াজের ব্যাপারে জানতে চাইলে আকাশ থেকে পড়লেন যেন। এতোদিন পর ওর খোঁজ করছি! আমি কে? সঙ্গে সঙ্গে একটা মিথ্যে বলে দিলাম, ইমতিয়াজ আমার পুরনো বন্ধু, দুই যুগ পর বিদেশ থেকে দেশে এসেছি। একটা কাজে কাঠালবাগানে এসেছিলাম, ভাবলাম একটু দেখা করে যাই।"

মুচকি হাসলো রামজিয়া শেহরিন।

"ওর বোন জানালো, পঁচাত্তরের পর থেকে ইমতিয়াজ লাপাত্তা। ও বেঁচে আছে নাকি মরে গেছে সেটা তারা জানে না। মহিলার কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো আমার।"

"বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো কেন?"

"মরে গেলে এতোদিনে অন্তত ওর পরিবার জানতো, আর এটা লুকানোর চেষ্টা করতো না, করার দরকারও হতো না।"

"হুম," মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। "তোমার ধারণা ও ঢাকাতেই আছে?"

gronthagaar.blogspot.com

"হুম। মিলির কেসটা ম্যানেজ করে ফেলেছিলো, আর হায়দারভায়ের কেসে ওর নামটা পর্যন্ত অভিযোগপত্রে দেয়া হয়নি। ওর জন্য ঢাকা শহর ছাড়ার কোন কারণই ছিলো না। হয়তো দিব্যি সংসার করে সুখে আছে এখন।"

"আচ্ছা, ওর সাথে দেখা করতে চাইছো কেন? যদি দেখা হয়ে যেতো তাহলে কি করতে?" একটু থেমে আবার বললো, "এই বইটা ওকে পড়তে দিতে?"

স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে মাথা দোলালাম আমি। "না।"

"তাহলে?"

"লেখাটা শেষ করার জন্য...মানে, সমাপ্তির জন্য ইমতিয়াজের বর্তমান অবস্থা জানার দরকার।"

"হুম।"

"ও এখন কি করে, বিয়ে-থা করেছে কি-না, সন্তান আছে কি-না, বাবা হিসেবে কেমন, স্বামি হিসেবে কেমন...এসব জানার চেষ্টা করতাম। তাছাড়া, এই বইটা শেষ করার পর ওকে এক কপি দিতাম। ও হয়তো পড়বে না কিন্তু ওকে জানিয়ে দিতাম, সত্যটা পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি।"

স্থিরচোখে চেয়ে রইলো রামজিয়া।

তার চোখে চোখ রেখে আলতো করে মাথা দোলালাম। "আরেকটা কারণও আছে, কিন্তু তার আগে তোমার অগ্যানাইজেশন সম্পর্কে একটু জানতে চাই।"

কথাটা শুনে একটু অবাকই হলো সে। "কি জানতে চাও?"

"ইন্টারভিউতে তুমি বলেছিলে তোমার এই অগ্যানাইজেশন ভুলভাবে বিচার করা হয়েছে যাদের তাদের হয়ে কাজ করে?"

"হ্যা। আমরা রংলি কনভিক্টেড'দের সহায়তা দেই, এজন্যেই ফার্মের নাম অ্যাসোসিয়েশন ইন ডিফেন্স অব দি রংলি কনভিক্টেড–আমরা সংক্ষেপে বলি এইড-ডব্লিউসি।"

"এটা কিভাবে করো? মানে, কারা ভুল বিচারের শিকার হয়েছে বোঝো কিভাবে?"

"এখন আমরা কিছু কেস পিক-আপ করি, আর কিছু কেস ভিক্টিমের নিকটজনেরাই নিয়ে আসে আমাদের কাছে। মাত্র শুরু করেছি, আশা করি বছরখানেক পর হিউম্যান রিসোর্স বাড়াতে পারলে আমরা নিজেরাই বেশিরভাগ কেস খুঁজে বের করতে পারবো।"

gronthagaar.blogspot.com

আমি এ বিষয়ে আরো কিছু কথা শোনার জন্য মুখিয়ে থাকলাম।

“আমেরিকা-কানাডায় ওদের মেইন অফিস আছে, এশিয়ার কিছু দেশেও আছে। এবার আমরা বাংলাদেশে শুরু করলাম।”

“এরকম একটা প্রতিষ্ঠানের দরকার ছিলো এখানে।”

আমার কথায় আল্‌তো করে হাসলো সে।

“ইন্টারভিউতে তুমি বলেছিলে, তোমাদের এই ‘রংলি কনভিক্টেড’ টার্মটা দিয়ে শুধু ভুল বিচারকেই বোঝানো হয় না...যেসব কেস বিচার না করে ক্লোজ করা হয়েছে...বিশেষ করে হোমিসাইড...সেগুলোকেও রংলি কনভিক্টেড হিসেবে ট্রিট করো?”

“ওয়াও, আমার ইন্টারভিউটা দেখি বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়েছো। দ্যাটস গ্রেট,” প্রশংসার সুরে বললো সে।

নিঃশব্দে হাসি দিলাম কেবল।

“লাস্ট টেন ইয়ার্স আমি এই সংগঠনের সাথেই কাজ করে যাচ্ছি। ডিভোর্সের পর মনে হলো ওখানে আর থাকবো না, বাকি জীবনটা দেশেই কাটাবো। তাই অপারচুনিটা নিলাম বলতে পারো। আমি জানতাম, ওরা অনেকদিন ধরে এখানে ওদের কার্যক্রম শুরু করার চেষ্টা করছিলো কিন্তু রিলায়েব্‌ল কাউকে পাচ্ছিলো না। তাই যখন বললাম আমি ব্যাক করবো তখন ওরা খুশিমনেই রাজি হয়ে গেলো।”

“তোমার ইন্টারভিউটা পড়ার পর আমার মনে হলো, মিলির কেসটা হয়তো রি-ওপেন করা সম্ভব। তুমি কি বলো?”

একটু ভাবলো রামজিয়া। “স্টেট্‌সে হলে এটা করা যেত কিন্তু এ দেশে...ইউ নো, এখানে এতদিনের পুরনো কোনো কেস নিয়ে মাথা ঘামাবে না কেউ। লক্ষ-লক্ষ মামলা-মোকদ্দমা জমে আছে, সেগুলোরই সুরাহা করা যাচ্ছে না।”

কথাটা সত্যি। আমার চাওয়াটা হয়তো একটু বাড়াবাড়ি রকমের হয়ে যাচ্ছে। অনেকটা ছেলেমানুষি আব্দারের মতো।

“তারচেয়েও বড় কথা, প্রাইম সাসপেক্টেরই কোনো খবর নেই। মামলার বাদি, মিলির হাজব্যান্ডও ঢাকায় থাকে না। মনে হয় না কেসটা নিয়ে সে আর আগ্রহি। তার অনুমতি ছাড়া কেস রি-ওপেন করার কোন স্টেপও নেয়া যাবে না।”

“মিনহাজ যদি রাজি হয় তাহলে কি রি-ওপেন করা সম্ভব?” উদগ্রিব হয়ে জানতে চাইলাম আমি।

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

"থিউরিটিক্যালি সম্ভব, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি করা যাবে কি-না বুঝতে পারছি না।"

"কেন?"

"মিনহাজ অনুমতি দিলেও কেসটা কিভাবে এগোবে যদি ইমতিয়াজকে পাওয়া না যায়? তুমি তো বললে, ওর কোন খবর কেউ জানে না। এমন কি ওর পরিবারও কিছু জানে না এ ব্যাপারে।"

"হুম...তা ঠিক। ইমতিয়াজ যদি ঢাকায় থেকে থাকে আমার পক্ষে তাকে খুঁজে বের করাটা সহজ হবে না। শহরটা এখন অনেক বড়। তবে আমার বিশ্বাস, কেসটা রি-ওপেন করা হলে পুলিশের তদন্তকারি কর্মকর্তারা ওকে ঠিকই খুঁজে বের করতে পারবে।"

কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বললো সে, "ঠিক যেভাবে তোমরা ওকে খুঁজে পেয়েছিলে?"

Gronthagaar.blogspot.com

অধ্যায় ১২

শিকার পর্ব

ঢাকা শহর তখনও খুব ছোটো, জনসংখ্যাও আজকের তুলনায় অনেক কম, তারপরও ইমতিয়াজকে খুঁজে বের করতে না পেরে ক্রমশ হতাশ হয়ে উঠছিলেন হায়দারভাই। নাছোরবান্দার মতো লেগেছিলেন তিনি। এখানে ওখানে বহু জায়গায় খোঁজ করার পর আমরা বুঝে গেলাম ইমতিয়াজ সতর্ক হয়ে উঠেছে। এতে করে হায়দারভাই আরো বেশি নিশ্চিত হয়ে গেলেন, খুনটা সে-ই করেছে, নইলে তার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়েরের আগে কেন এতো সতর্ক হয়ে উঠলো।

বেশ কয়েকটা দিন নিষ্ফলা কেটে যাবার পর একদিন দেখতে পেলাম বিহারি কাশেম নামের এক লোক থানায় এসে হায়দারভায়ের সাথে কথা বলে গেলো। অন্য একটা কাজে ব্যস্ত ছিলাম বলে তাদের কথাবার্তা তেমন একটা শুনতে পাইনি, তবে হায়দারভাই যে ইমতিয়াজের ব্যাপারে কথা বলছিলেন সেটা বুঝতে পেরেছিলাম।

এর আগেও আমি বিহারি কাশেমকে কয়েকবার দেখেছি। লোকটা ঢাকা শহরের বেশ কয়েকটি থানায় ইনফর্মার হিসেবে কাজ করে। যেমনি ধুর্ত তেমনি ঘাগু। অন্যসব ইনফর্মাররা যেখানে একটি নির্দিষ্ট থানার নাড়িনক্ষত্রের খবর রাখে সেখানে এই লোক বলতে গেলে পুরো ঢাকা শহরের হাড়ির খবর রাখে। এটাই ওর একমাত্র পেশা। যতো খবর ততো ইনকাম।

"বিহারি কাশেমকে লাগিয়ে দিলাম, ও ঠিকই ইমতিয়াজের পাত্তা খুঁজে বের করতে পারবে।" ইনফর্মার লোকটা থানা থেকে চলে যাবার পর আমাকে বলেছিলেন এসএম হায়দার। "কতোদিন পালিয়ে থাকবে? ঠ্যালার নাম কাশেমবাবা!" কথাটা বলেই চোখ টিপে দিলেন তিনি।

নড়চড়ে বসলাম আমি। "কাশেম! এই লোকই কি আপনার সেই কাশেমবাবা?"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন তিনি। "আমি মজা করে ঠ্যালার নাম বাবাজি না বলে কাশেমবাবা বলি কেন জানো? জীবনে আমি এই শালার মতো ফাঁপড় মারতে কাউকে দেখিনি।"

gronthagaar.blogspot.com

বিহারি কাশেম কঠিন চিজ। এই ধুরন্ধর লোকটা পুলিশকে ভয় পয় না, মাঝেমধ্যে তাদেরকেও এমন ফাপড় দেয় যে, না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। তবে এসএম হায়দারকে কেনজানি খুবই সমীহ করে।

"কাশেম আপনাকে খুব মানে," কথাটা না বলে পারলাম না, "এর কারণ কি?"

একটা ভাবনায় ডুবে সিগারেটে টান দিয়ে বললেন তিনি, "যুদ্ধের পর পর ও মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়েছিলো, আমি ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলাম।"

"ও কি কোলাবরেটর ছিলো?" রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস–জঘন্য নামগুলো কোলাবরেটর শব্দে প্রকাশ করা হতো তখন।

"না।"

"তাহলে?"

"বিহারি ছিলো...শুধুই বিহারি।"

কথাটা শুনতে যেমনই লাগুক, ৭১-এ বাঙালি-বিহারী সম্পর্কটা চিরশত্রুর মতো হয়ে উঠেছিলো। অনেক বিহারি বাঙালি-নিধনে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলো তখন, বিশেষ করে বিহারী অধ্যুষিত এলাকায় বাঙালিদের জন্য আজরাইলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তারা। সব যুদ্ধের মতো আমাদের মুক্তিযুদ্ধও 'কোলাটেরল ড্যামেজ' থেকে মুক্ত ছিলো না। অনেক নিরীহ বাঙালি যেমন এর শিকার হয়েছে তেমনি কিছু বিহারীও বেঘোরে মারা পড়েছে শুধুমাত্র বিহারি বলেই। এটা অস্বীকার করা যাবে না।

যাই হোক, বিহারি কাশেম কয়েকদিন পরই তার 'ঠ্যালা' বুঝিয়ে দিলো। লেকু মিয়া নামের একজনের হদিস দিলো সে। মিলি খুন হবার আগে এই লেকু মিয়ার সাথেই নাকি ইমতিয়াজকে সব সময় দেখা যেত। ওকে ধরলে হয়তো জানা যাবে ইমতিয়াজ কোথায় আছে। লোকটা এখন তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে ধানমণ্ডিতে পাকিস্তানি ব্যবসায়ির পরিত্যক্ত এক বাড়িতে আস্তানা গেঁড়েছে। সরকার দলীয় প্রভাবশালী এক নেতা বাড়িটা নিজের দখলে রাখার উদ্দেশ্যে এটা করেছে। ঐ নেতার হয়েই কাজ করছে লেকু আর তার লোকজন।

খবরটা পাওয়ামাত্রই হায়দারভাই আমাকে নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন ধানমণ্ডির ঐ বাড়িতে।

"বুঝেছো, তোমার দলের নেতারা দেশ স্বাধীন করে এখন ভাগ-বাটোয়ারায় ব্যস্ত," পুলিশের জিপে বসতেই টিপ্পনি কাটলেন তিনি। "পাকিস্তানি ব্যবসায়িদের বাড়িগুলো কে কার আগে দখলে নিতে পারে সেটা

gronthagaar.blogspot.com

নিয়ে কামড়া-কামড়ি লেগে গেছে। যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় 'ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা' বলে কেঁদে ফেলতো তারাও এখন মাটি দখলে নেমে পড়েছে। বাকিদের কথা আর কী বলবো।"

আমি ততোদিনে এরকম টিটকারিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। হায়দারভায়ের এ কথায় কিছু বললাম না।

"সারা দেশেই এমন হচ্ছে," বলে চললেন তিনি। "এই এক ধানমণ্ডিতে কতো বাড়ি যে ঐ শালার চাটার দল দখল নিয়েছে তার কোনো হিসেব নেই!" ঘেন্নায় একদলা থুতু ফেললেন গাড়ির বাইরে।

"কিছু লোভি নেতার জন্য পুরো দলকে আপনি দায়ি করতে পারেন না," আস্তে করে বললাম আমি। যদিও এই যুক্তিটা বহুল ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে পড়েছিলো ততোদিনে।

"ছোটোভাই, এসব কথা বাদ দিয়ে নতুন কিছু থাকলে বলো," তিক্তমুখে বললেন এসএম হায়দার। "একটা পরিবারে যদি আটজন ভালো মানুষ থাকার পরও দু-জন ইতর, বদমাশ থাকে তাহলে পুরো পরিবারটি বদনামের ভাগিদার হয়। কেন হয়? কারণ তুমি বদমাশকে প্রশ্রয় দিয়েছো। তাকে থামানোর চেষ্টা করছো না। লাথি মেরে তাকে তাড়িয়েও দিচ্ছো না।"

আমি আবারো চুপ থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। ভালো করেই জানি আজিমপুর থেকে ধানমণ্ডির পথটা খুব অল্প সময়ের। জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকাটাই আমার জন্য ভালো হবে। আমার বোবানীতির কারণে রাজনৈতিক পেচালে সুবিধা করতে পারলেন না হায়দারভাই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা চলে এলাম ধানমণ্ডি লেকের পাশে একটি দোতলা বাড়ির সামনে। গেটে কোনো দারোয়ান নেই। এলাকাটি একদম নির্জন। হায়দারভায়ের মতে এই এলাকায় মোট তিনটি বাড়ি সরকার দলের লোকজন দখল করে রেখেছে।

গাড়ি থেকে নেমে মেইনগেটে জোরে জোরে টোকা মারলেন এসএম হায়দার। অনেকক্ষণ পর রোগাপটকা এক লোক গেট খুলে দিতেই ভিরমি খেলো আমাদের দেখে।

"লেকু মিয়া আছে?" জানতে চাইলেন হায়দারভাই।

"হ," বললো সেই লোক।

"সর্," লোকটাকে সরে দাঁড়াতে বলেই হায়দারভাই আমাকে নিয়ে ঢুকে পড়লেন ভেতরে।

বাড়ির সামনে এক চিলতে লন অযত্ন আর অবহেলায় নোংরা হয়ে

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

আছে। দোতলার বারান্দায় দড়ি টানিয়ে লুঙ্গি, আন্ডারওয়্যার, শার্ট, গেঞ্জি ঝুলিয়ে শুকানো হচ্ছে। বাড়ির বর্তমান বাসিন্দাদের সামাজিক অবস্থান এতেই বোঝা গেলো–একদল লোক দখলদারের পক্ষ নিয়ে আসন গেঁড়েছে এখানে।

"ওই কাঞ্চইন্যা...কে রে?" বাড়ির ভেতর থেকে লুঙ্গি পরা গাট্টাগোট্টা এক লোক এসে দাঁড়ালো আমাদের সামনে। তার চোখমুখে অবশ্য ভড়কে যাবার কোন চিহ্ন নেই। বিস্মিত সে। "আপনেরা?"

"তোমার নাম কি লেকু মিয়া?" অনেকটা ধমকের সুরে জানতে চাইলেন হায়দারভাই।

"হ।" তার চোখদুটো ধূর্ত শেয়ালের মতো। একবার আমার দিকে, আরেকবার হায়দারভায়ের দিকে তাকাচ্ছে। "এইটা কইলাম আমাগো লিডারের–"

"জানি জানি," লেকুর কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন এসএম হায়দার। "তোর লিডারে পেয়ারের বাড়ি নিয়ে আমাদের কোন মাথাব্যথা নেই।" তিক্তমুখে তুই-তোকারি করা শুরু করলেন তিনি।

"তাইলে?" লেকুর কপালে ভাঁজ পড়লো। লোকটার চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছে আমরা দু-জন অনধিকার প্রবেশ করেছি তাদের 'আস্তানায়।'

"আগে বল্, এখানে তোরা কে কে থাকিস?"

"আ-আমি, কাঞ্চন আর শেখুল," একান্ত অনিচ্ছায় বলে উঠলো সে।

বাড়ির চারপাশে চোখ বুলালেন হায়দারভাই। "আর কেউ না?"

"না।" কথাটা বলতে গিয়ে কেমন যেন করলো লেকু। "আপনারা কারে চান, কন তো?"

"ইমতিয়াজ।" বলেই তিনি বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন। লেকু আর আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেলাম।

"ই-ইমতিয়াজ তো এইহানে–"

"থাকে না?" হাটতে হাটতেই আবারো লেকুর কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললেন হায়দারভাই।

"না, থাকে না," জোর দিয়ে বললো সে।

"হুম।" বাড়িটার বারান্দার সামনে এসে দাঁড়ালেন এসএম হায়দার। "তাহলে ইমতিয়াজ এখন কোথায় থাকে?"

একেবারে আকাশ থেকে পড়লো যেন লেকু মিয়া। "ও কই থাকে আমি কেমনে জানমু?"

এবার লোকটার দিকে ফিরে তাকালেন তিনি। "ইয়ার-দোস্ত কই থাকে

gronthagaar.blogspot.com

তুই জানিস না?" মুচকি হাসলেন। "নাকি বলবি, ইমতিয়াজ নামের কাউকে চিনিসই না?"

লেকু বুঝে উঠতে পারলো না কী বলবে। ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো সে। "ও-ওরে আমি চিনি, কিন্তু ও আমাগো লগে থাকে না।"

"যাক, তাহলে চিনিস," বললেন হায়দারভাই। "তোরা কোন্ ঘরে থাকিস?"

প্রশ্নটা শুনে লেকু মিয়া একটু অবাক হলো। "দুতলায়," সংক্ষেপে জানালো সে। আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলো।

"আর শেখুল, সে কই?"

"দুতলায়।"

আমার দিকে তাকালেন হায়দারভাই। "চলো।" কথাটা বলেই লেকু মিয়াকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন তিনি। আমিও তার পেছন পেছন ছুটলাম।

ডুপ্লেক্স বাড়ির ভেতরটা পুরোপুরি নোংরা। তেমন কোনো আসবাবপত্র চোখে পড়লো না। ফ্লোর আর সিঁড়িটা মোজাইক করা। আমরা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় চলে গেলাম। ছোট্ট একটা হলওয়ে পেরিয়ে দরজা খোলা একটি রুমের সামনে দাঁড়ালেন হায়দারভাই।

"এটা?"

"হ," বললো লেকু মিয়া।

ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়লেন এসএম হায়দার, তার পেছন পেছন আমি।

ঘরটা বলতে গেলে ফাঁকা। মেঝেতে একটি পুরনো শীতল পাটি বিছানো, তাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাস। সিগারেটের গন্ধে ভরে আছে ঘরটা। একটা ভাঙা চায়ের কাপ অ্যাস্ট্রে হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কাপ ভর্তি সিগারেটেরে উচ্ছিষ্ট। সম্ভবত আমরা আসার আগে লেকু মিয়ারা তাস খেলছিলো।

লেকুর দিকে ফিরলেন এসএম হায়দার। হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করে হাতে নিয়ে নিলেন তিনি। দাঁতে দাঁত পিষে লোকটার দিকে তাকালেন। "পুলিশের সাথে ফাজলামি করিস! ইমতিয়াজ কই?"

তার কথা শুনে লেকুর মতো আমিও ভড়কে গেলাম। হায়দারভাই কী করে বুঝলেন এখানে ইমতিয়াজ আছে? নাকি ফাপড় দিয়ে কথা বের করার চেষ্টা করছেন?

"কইলাম না, এইহানে থাকে না।" কথাটা বলেই ঢোক গিললো

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

গাট্টাগোট্টা লোকটি।

"শূয়োরেরবাচ্চা!" বলেই একটা চড় মেরে বসলেন হায়দারভাই।

চড় খেয়ে রীতিমতো বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলো লেকু।

"চারজনে মিলে তাস খেলছিলি...অন্য একজন কই, অ্যা?"

হায়দারভায়ের কথা শুনে আমি শীতল পাটির দিকে তাকালাম আবার। চারজন মানুষ যে তাস খেলছিলো সেটা এবার চোখে ধরা পড়লো। পাটির চারদিকে চার পেটি তাস, বাটা শেষ করে খেলা শুরু করেছিলো মাত্র।

"কই?"

ঠিক এমন সময় বারান্দা থেকে ঘরের ঢুকলো পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের এক যুবক। বাবরি চুল আর পুরু গোঁফ। চোখদুটো লালচে। আমাদের দেখে আলগোছে ঢোক গিললো সে।

"তুই কে?" ঝাঁঝের সাথে বললেন হায়দারভাই।

"আ-আমি শেখুল," তোতলালো সেই যুবক।

"ইমতিয়াজ কই?"

হায়দারভায়ের প্রশ্নটা শুনে ঢোক গিলে লেকু মিয়ার দিকে তাকালো শেখুল।

"আরে শূয়োরেরবাচ্চা, ওর দিকে তাকাস কেন? আমার কথার জবাব দে!" চটে গেলেন তিনি।

"আ-আপনেরা আসার আগেই পলাইছে!"

ভুরু কুচকে তাকালেন এসএম হায়দার। "ও এখানে ছিলো?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ছেলেটা।

"আমরা যে আসছি ও এখান থেকে কিভাবে বুঝলো, অ্যা?"

"বারিন্দা থেইকা দেখছে।"

হায়দারভাই সঙ্গে সঙ্গে বারান্দায় চলে গেলেন। নিচের দিকে তাকিয়ে মেইনগেটটা দেখতে পেলেন তিনি। বুঝতে পারলেন, এখান থেকে ইমতিয়াজ আমাদের দেখেই ভেগেছে।

"কোন্ দিক দিয়ে পালিয়েছে?" চট করে লেকুর দিকে ফিরে বললেন। পিস্তল উঁচিয়ে ধরলেন লোকটার মুখের কাছে। "বল্!"

"পি-পিছনের দেয়াল দিয়া–"

হায়দারভাই আর পুরো কথাটা শোনার জন্য অপেক্ষা করলেন না। আমাকে নিয়ে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলেন।

বাড়ির পেছনদিকে এক চিলতে খালি জায়গা, সম্ভবত এর মালিক এখানে

gronthagaar.blogspot.com

বাগান করেছিলো কিন্তু এখন সেটা আগাছায় পরিপূর্ণ। প্রচুর ভাঙাচোরা জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ফুলের কোনো গাছ আর অবশিষ্ট নেই, তবে বড় বড় বেশ কয়েকটি নাম না-জানা গাছ দাঁড়িয়ে আছে দেয়াল ঘেষে। আটফুট উঁচু সীমানা প্রাচীর কিন্তু হতাশার সাথেই আমরা আবিষ্কার করলাম, সেটা টপকে যাওয়া তেমন কঠিন কিছু না—একটা পরিত্যক্ত সাদা রঙের টয়োটা কোরোলা পড়ে আছে সেই দেয়াল ঘেঁষে। ওটার ছাদের উপর উঠে দাঁড়ালে যেকোনো প্রাপ্তবয়স্ক লোকের পক্ষে দেয়ালটা টপকানো খুবই সহজ।

হায়দারভাই পিস্তল হাতে গাড়িটার উপরে উঠতেই থমকে গেলেন। আক্ষেপে মাথা দোলালেন তিনি। গাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে দেয়ালের ওপাশটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। আমি তখনও গাড়ির নীচে দাঁড়িয়ে আছি।

“কি হয়েছে?”

আমার প্রশ্নে ফিরে তাকালেন। দাঁতে দাঁত পিষে বললেন, “ভেগেছে!” গাড়ির ছাদ আর বুটের দিকে নজর দিলেন তিনি। শীতকাল বলে ধুলোর আস্তরণ পড়ে আছে তাতে। “দেখো!” বুটের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

আমি দেখতে পেলাম ধুলোর আস্তরণে কিছু পায়ের ছাপ। একটু আগে কেউ গাড়িটার উপরে উঠেছিলো।

রেগেমেগে গাড়ি থেকে নেমে এলেন হায়দারভাই। আমার দিকে তাকালেন। তার চোখেমুখে হতাশা দেখতে পেলাম। সত্যি বলতে আমি নিজেও হতাশ হয়েছিলাম খুব। এভাবে হুট করে ইমতিয়াজকে পেয়েও হাতছাড়া করবো সেটা আশা করিনি।

লেকু, কাঞ্চন আর শেখুলকে আরো কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করে তেমন কিছু জানা গেলো না। একসঙ্গে থাকলেও ইমতিয়াজ সম্পর্কে খুব বেশি কিছু বলতে পারলো না তারা। যতোটুকু বোঝা গেলো, লেকু আর ইমতিয়াজ এক সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে। এখানে সেখানে চাঁদাবাজি করে, সম্ভবত রাত-বিরাতে ভাসমান পতিতা নিয়ে এসে মউজ-ফূর্তি করে এখানে।

লেকু আরো জানালো, সপ্তাহ দুয়েক আগে ইমতিয়াজ এসে তাকে বলেছিলো এই বাড়িতে সে কয়েকদিন থাকবে। তার বাড়িতে নাকি কী একটা সমস্যা হয়েছে। এ নিয়ে লেকু কিছু জিজ্ঞেস করেনি। তারা মাত্র তিনজন প্রাণী বাড়িটাতে থাকে, আরেকজন যোগ দিলে ভালোই হবে, তাস খেলার পার্টনার পাওয়া যাবে।

হায়দারভাই আমাকে নিয়ে আবারো চলে গেলেন দোতলায়। তার উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারলাম, ইমতিয়াজ যে ঘরে থাকে সেখানে ভালোমতো

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

তল্লাশি চালাবেন। খুব দ্রুত আর তাড়াহুড়ো করে সে ভেগেছে, নিশ্চয় অনেক কিছু রেখে গেছে ঘরে। ইমতিয়াজের ঘরে ঢুকেই চারপাশে চোখ বুলাতে শুরু করলেন তিনি। তার চোখ ঘরের বিভিন্ন অংশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

একটা সিঙ্গেল খাট, উন্মুক্ত ময়লা ম্যাট্রেস আর বালিশ। যথারীতি এই ঘরটাও নোংরা। ঘরে আর কোনো আসবাব নেই।

পুরো ঘরে তল্লাশি চালালেও তেমন কিছুই পেলাম না। এটা ইমতিয়াজের অস্থায়ি আস্তানা। আপদকালিন আবাস। প্রয়োজনীয় কিছু কাপড়-চোপর ছাড়া ঘরে কিছুই নেই। ইমতিয়াজের দুটো শার্ট, একটা প্যান্ট, স্যান্ডো গেঞ্জি আর আন্ডারওয়্যার দেয়ালে পেরেক গেঁথে হ্যাঙ্গারে টাঙানো আছে।

ঠিত তখনই ঘরের এককোণে কালো রঙের একটি ছাতা দেখতে পেলাম আমি। হায়দারভায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

আলামত!

তল্লাশি যখন প্রায় শেষ তখন কী মনে করে যেন ইমতিয়াজের শার্ট আর প্যান্টটা হ্যাঙ্গার থেকে নামিয়ে নিলেন হায়দারভাই। পকেটে হাত ঢুকিয়ে খুঁজে দেখলেন। প্যান্টের বাম পকেট থেকে সিনেমার টিকেটের মতো একটা দোমড়ানো মোচড়ানো কাগজ বের করে আনলেন তিনি। কাগজটা মেলে ধরে দেখলেন ওটা সিনেমার টিকেট নয়। দরজার দিকে ফিরে লেকু মিয়ার দিকে তাকালেন এবার। লোকটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

"ইমতিয়াজ কি ফুটবল খেলা দেখতে গেছিলো কয়েকদিন আগে?"

"হ। নতুন টিম আবাহনীর কুনো খেলা মিস্ করে না। কঠিন সাপোর্টার।"

gronthagaar.blogspot.com

অধ্যায় ১৩

মানুষ অভ্যাসের দাস

এভাবে আরো কিছুদিন চলে গেলো কিন্তু কেসটার কোনো অগ্রগতি হলো না। ঐ এক ইমতিয়াজেই সব থমকে রইলো। দিন যেতে লাগলো আর হায়দারভাইও হতাশ হতে শুরু করলেন। একটু ফুরসত পেলেই তিনি আমার সাথে এই কেসটা নিয়ে আলাপ করতেন। আমি তাকে বোঝাতাম, ইমতিয়াজ সম্ভবত ঢাকায় নেই, থাকলে এতোদিনে আমরা তাকে ধরতে পারতাম। এই সম্ভাবনাটি যে হায়দারভাইও খতিয়ে দেখেননি তা নয়, তিনিও ভালো করে জানতেন ঢাকা শহরে থাকলে খুনি ধরা পড়তোই। ধানমিণ্ডর ঐ বাড়ি থেকে পালানোর পর ইমতিয়াজ সম্ভবত ঢাকায় থাকার ঝুঁকি নেয়নি। আর ঢাকার বাইরে যদি সে গিয়ে থাকে তাহলে একটা জায়গায় যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

তাই হায়দারভাই আবারো গেলেন ইমতিয়াজদের কাঠালবাগানের বাড়িতে। ওর মায়ের কাছ থেকে জেনে নিলেন ওদের দেশের বাড়ি কোথায়।

হায়দারভায়ের জন্য এটা বিরল ব্যাপারই বটে। উনি কখনও কারোর দেশের বাড়ি কোথায় জানতে চাইতেন না। আমার স্পষ্ট মনে আছে তার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সেই ঘটনাটার কথা। টুকটাক কথা হবার পর আমি জানতে চেয়েছিলাম উনার দেশের বাড়ি কোথায়। আমার প্রশ্নটা শুনে কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে তিনি যা বলেছিলেন তা আমি জীবনেও ভুলিনি।

"বাংলাদেশ।"

প্রথমে আমি ভেবেছিলাম উনি আমার সাথে মজা করছেন। আমি হেসে আবারো জানতে চাইলাম উনার গ্রামের বাড়ি কোন্ জেলায়।

"এটা কেন জানতে চাইছেন?"

পরিচয়ের প্রথমদিন থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত উনি আমাকে 'আপনি' করে সম্বোধন করতেন।

"না, মানে এমনি," কাচুমাচু খেয়ে বলেছিলাম ঐদিন।

এসএম হায়দার মাথা দুলিয়ে গম্ভীর মুখে বলেছিলেন, "শোনেন ছোটোভাই, আমাদের দেশটা অনেক ছোটো। এই ছোটো দেশটাকে আমরা আর ছোটো না করি, কি বলেন?"

gronthagaar.blogspot.com

আমি লজ্জায় কুকড়ে গিয়েছিলাম কথাটা শুনে। এ দেশে শিক্ষা-দীক্ষা পাওয়া লোকজনের মধ্যেও আঞ্চলিকতার নোংরা রোগটি বিরাজমান। আমিও এর ব্যতিক্রম ছিলাম না।

"আমি যদি আপনার জেলার লোক না-হই তাহলে কি আপনার সাথে আমার খাতির হবে না?" একটু থেমে আবার বলেছিলেন তিনি, "আর আপনার জেলার লোক হলে কি বেশি খাতির হয়ে যাবে?"

লজ্জায় দু-কান গরম হয়ে গেছিলো আমার।

"এইসব নোংরা আঞ্চলিকতা আমার ঘেন্না লাগে। আমার দেশ একটাই–বাংলাদেশ। এটাই আমার জন্মস্থান। এটাকে টুকরো টুকরো করে নিজের পরিচয় বানানোর কোনো ইচ্ছে আমার নেই। "

এই ঘটনার পর আমি আর এ জীবনে কাউকে তার দেশের বাড়ি কোথায় জানতে চাইনি।

যাই হোক, ইমতিয়াজের পৈতৃকবাড়ি কোথায় সেটা জানার পরও কোনো লাভ হলো না। ওখানকার থানায় তার ব্যাপারে খোঁজ নিতে বলা হলেও সপ্তাহখানেক পর জানানো হলো অনেক বছর ধরে ইমতিয়াজ গ্রামের বাড়িতে যাওয়া-আসা করে না। যুদ্ধের পর নাকি মাত্র একবার গিয়েছিলো ওখানে।

মিলির হত্যাকাণ্ডের তদন্ত এভাবে থমকে থাকে কিছুদিন। হায়দারভাই অন্য অনেক কেস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেও আমি বুঝতে পারতাম তার মাথা থেকে এই কেসটা একদিনের জন্যেও তিরোহিত হয়নি। মিলির মতো একটি মেয়ে নতুন জীবন শুরু করতে গিয়ে ওভাবে খুন হবে এটা তিনি কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিলেন না। যে করেই হোক, খুনিকে ধরে উপযুক্ত শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।

আমার দিক থেকেও এই কেসটি ছিলো বেশ হতাশাজনক। কারণ কেসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র আমিই বের করেছিলাম। মনে মনে আশা করেছিলাম খুব সহজেই আসামিকে ধরতে পারবো, কেসটার সাফল্যে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারবো। সেটা তো হলোই না, বরং মিলির স্বামি মিনহাজ তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে থানায় চলে এলে যারপরনাই বিব্রত বোধ করতে শুরু করে দিয়েছিলাম।

তো, একদিন আমি থানায় বসে অলস সময় পার করছিলাম। হাতে তেমন কোনো কাজ না থাকায় অতুল সুরের একটি নন-ফিকশন পড়তে শুরু করি। থানায় হায়দারভাই উপস্থি থাকলে আমার বইপড়া নিয়ে কেউ টিটকারি মারার সাহস দেখাতো না। সবাই জানতো, তিনি আমাকে কেমন স্নেহ করতেন।

gronthagaar.blogspot.com

তো, বইটাতে খুব একটা মনোযোগ ছিলো না, শুধু সময় পার করার জন্যই পড়ছিলাম বলা চলে। এমন সময় হায়দারভাই আমার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

"বুঝলে, তোমাকে এখানে বসে বই পড়তে দেখে হঠাৎ করে একটা জিনিস আমার মাথায় এলো।"

"কি?" বাধ্য হয়ে বইটা নামিয়ে রাখলাম আমি।

"ইমতিয়াজ সবকিছু বদলে ফেলেছে।"

আমি বুঝতে পারলাম না। "মানে?"

"এই যে, থাকার জায়গা, পরিচিত লোকজন, এমন কি শহরটাও।"

"ও।" *এ আর এমন কি!* মনে মনে বললাম। এটা তো নতুন কোনো কথা নয়। আমিও ঠিক তাই মনে করি।

এসএম হায়দার আমার টেবিলের উপর বাম-উরু তুলে দিয়ে ডান পা-টা মাটিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। "কিন্তু মানুষ সবকিছু বদলাতে পারলেও অভ্যাস বদলাতে পারে না। মানুষ হলো অভ্যাসের দাস!"

আমি হায়দারভায়ের দিকে তাকালাম। যেন একটা ঘোরের মধ্যে ডুবে আছেন তিনি। নিজের মনেই কথা বলে যাচ্ছেন।

"অভ্যাস বদলানো খুব কঠিন, ব্রাদার।"

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলেও হায়দারভাই সেটা দেখলেন না। তিনি গাল চুলকাতে চুলকাতে ফাঁকা দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছেন।

"এই যে ধরো আমি," এবার আমার দিকে নজর দিলেন, "কতো চেষ্টাই না করলাম, বউয়ের কাছে প্রতি সপ্তাহে প্রতীজ্ঞাও করি, মদ আর ছাড়তে পারি না।"

মুচকি হাসি দিলাম। এভাবে অকপটে নিজের বদঅভ্যাসের কথা বলাতে মজাই পেলাম আমি। "আপনি কিন্তু সত্যি সত্যি চেষ্টা করলে অবশ্যই পারবেন।"

আমার দিকে স্থিরচোখে চেয়ে রইলেন তিনি। "সত্যি সত্যি চেষ্টা?"

এই সেরেছে! মনে মনে প্রমাদ গুণলাম। এখন আবার এটা নিয়ে শুরু হয়ে যাবে।

"বিশ্বাস করো, সত্যি সত্যি চেষ্টা করেও আমি পারি না। অভ্যাস বদলানো আসলেই কঠিন।" তার চোখমুখ বেশ গুরুগম্ভীর।

আমি হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। যাক, আজকে তর্ক করার মতো মেজাজে নেই এসএম হায়দার।

gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

"এই যে তুমি আদারে-পাদারে বই নিয়ে বসে পড়ো, এটা কি তুমি সহজে ছাড়তে পারবে?"

"আমি আদারে-পাদারে বই নিয়ে বসে পড়ি?" তার শব্দচয়নে একটু কষ্ট পেলাম।

"অবশ্যই। নইলে কেউ থানায় বসে বই পড়ে," বলেই তিনি আসল প্রসঙ্গে চলে গেলেন, "যেটা বলছিলাম, অভ্যাস এতো সহজে ছাড়া যায় না।"

"বুঝলাম এবং মানলান," তাকে আশ্বস্ত করে বললাম আমি। "তো, আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?"

"ইমতিয়াজও তার অভ্যাস বদলাতে পারেনি। আমি নিশ্চিত। ওর মতো ছেলের পক্ষে অভ্যাস বদলানো আরো কঠিন।"

আমি শেষ কথাটা বুঝতে পারলাম না। "ওর পক্ষে কঠিন হবে কেন?"

"আ-হা," একটু বিরক্ত হলেন। "বুঝতে পারছো না কেন, একটা মেয়েকে একা পেয়ে যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি তার চরিত্র আর যাই হোক শক্ত বলা যাবে না।"

"হুম, তা ঠিক।"

"ওরকম একজনের পক্ষে অভ্যাস বদলানো খুব কঠিন।"

এবার বুঝলাম। মাথা নেড়ে সায়ও দিলাম। "ঠিক আছে, ইমতিয়াজ তার অভ্যাস বদলাতে পারেনি। তো? আমরা কি ওর কোনো অভ্যাসের কথা জানি?"

আমার দিকে স্থিরচোখে তাকিয়ে বললেন তিনি, "অবশ্যই জানি।"

"কি?"

"ফুটবল।"

"ফুটবল?" আমার মাথায় কিছুই ঢুকলো না।

"ইমতিয়াজ ফুটবল খেলা দেখে। নতুন টিম আবাহনীর কট্টর সাপোর্টার, মনে আছে?"

"হুম।" মাথা নেড়ে সায় দিলাম। এটা ঐ দখল করা বাড়িতে যাবার পর আমরা জেনেছিলাম।

"ও যেখানেই থাকুক, যেভাবেই থাকুক, খেলা দেখতে আসবেই। ঢাকার বাইরে থেকে হলেও আসবে।"

আচ্ছা! কথাটা শোনামাত্র আমারও মনে ধরলো। আমি দেখতে পেলাম হায়দারভায়ের মুখে হাসি।

"আগামিকাল ঢাকা ওয়ান্ডারাসের সাথে আবাহনীর খেলা।" আমার দিকে চেয়ে রইলেন প্রতিক্রিয়া জানার জন্য।

gronthagaar.blogspot.com

"হুম। আবাহনী নতুন টিম হলেও বেশ ভালো করছে।"

"দু-দলের জন্যই খেলাটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ।"

মাথা নেড়ে সায় দিতেই হলো।

"সুতরাং আমাদের আসামি আগামিকাল খেলা দেখতে ঢাকা স্টেডিয়ামে যাবে। আমি একদম নিশ্চিত।"

আমিও অনেকটা নিশ্চিত কিন্তু প্রশ্ন অন্য জায়গায়, আর সেটা না করে পারলাম না। "আপনি কি তাকে স্টেডিয়ামে গিয়ে খোঁজার কথা ভাবছেন?"

"অবশ্যই।" বেশ জোর দিয়ে বললেন হায়দারভাই। "এরকম সুযোগ হাতছাড়া করার কোনো মানেই হয় না।"

আমি না হেসে পারলাম না। "ভাই, আপনি কি আজ সকালেও ওসব খেয়ে থানায় এসেছেন?"

ভুরু কুচকে তাকালেন তিনি।

"আমি তো জানি আপনি সব সময় সন্ধ্যার পরই ওসব জিনিস খান।"

"আরে, ফাইজলামি রাখো তো, ব্যাপারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট।"

"ওকে," আমিও সিরিয়াস হয়ে উঠলাম। "আপনি স্টেডিয়ামে গিয়ে ওকে কিভাবে খুঁজে বের করবেন? বড় দুটো দলের গুরুত্বপূর্ণ খেলা, কম করে হলেও পনেরো-বিশ হাজার দর্শক থাকবে গ্যালারিতে।"

"তা থাকবে। তাতে কি?"

"বাহ্," আমি অবাক না হয়ে পারলাম না। "আপনি পনেরো-বিশ হাজার দর্শকের মধ্য থেকে ইমতিয়াজকে খুঁজে বের করবেন?" যাকে আপনি সামনাসামনি কখনও দেখেননি?"

"আজব কথা বললে তো! আমি একা খুঁজবো নাকি, তুমিও আমার সাথে থাকবে।"

"দারুণ আইডিয়া!" অবিশ্বাসে মাথা দোলালাম আমি। "তাহলে আমার ভাগে পড়বে সাড়ে সাত থেকে দশ হাজার দর্শক, তাই না?"

মুচকি হাসলেন হায়দারভাই। "ব্রাদার, তুমি মনে হয় কখনও ঢাকা স্টেডিয়ামে গিয়ে খেলা দেখোনি।"

কথাটা সত্যি, আমি কখনও স্টেডিয়ামে গিয়ে খেলা দেখিনি। আমি হলাম বইয়ের মানুষ। খেলাধূলার খবর পত্রিকার খেলার পাতা দেখেই সেরে নেই। মাঠে গিয়ে খেলা দেখার মতো ক্রীড়ামোদি আমি ছিলাম না কোনকালেই। "দেখিনি তো কি হয়েছে?"

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

"এজন্যেই তুমি জানো না, দু-দলের সাপোর্টাররা দুই গ্যালারিতে বসে। ভুল গ্যালারিতে বসলে ওই সাপোর্টারের খবর হয়ে যায়। একেবারে মগা না হলে কেউই ভুল গ্যালারিতে বসবে না। বুঝলে?" কথাটা বলেই মিটি মিটি হাসলেন হায়দারভাই।

ও, মনে মনে বললাম আমি। "তার মানে আমরা শুধু আবাহনীর গ্যালারিতে খোঁজ করবো?"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন এসএম হায়দার।

"তাহলে আমার ভাগে পড়বে তিন থেকে পাঁচ হাজার?"

"অতো হবে না।"

"কেন?"

"আবাহনী নতুন টিম, তাদের সাপোর্টার আস্তে আস্তে বাড়ছে। কিন্তু ওয়ান্ডারাস পুরনো টিম। ওদের প্রচুর সাপোর্টার।"

"আচ্ছা, ধরে নিলাম আবাহনীর সাপোর্টার পাঁচ হাজার...তাহলে আমাদের এক একজনের ভাগে কতোজন দর্শক পড়লো?"

আবারো মাথা দোলালেন হায়দারভাই। "শোনো, গ্যালারিতে সাপোর্টারদের কিন্তু রকমফের আছে। কট্টর সাপোর্টাররা একদিকে, আলাদা জায়গায় বসে। বাকি জায়গায় বসে সাধারণ সাপোর্টাররা। ইমতিয়াজ হলো কট্টর সাপোর্টার, বুঝলে?"

মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

"তাছাড়া, নব্বই মিনিটের খেলায় আমরা দু-জনে মিলে কয়েক হাজার দর্শকের মধ্য থেকে একজনকে বের করতে পারবো না?"

আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না হায়দারভায়ের কথাটা তাই চুপ মেরে রইলাম। এটা যে সাগর সেচার মতো কঠিন কিছু নয় তা জানতাম, তবে পুকুর সেচাও তো সহজ কাজ নয়!

"দর্শকরা সবাই একদম নিজের জায়গায় চুপ মেরে বসে খেলা দেখছে; তাদের সবার মনোযোগ মাঠের দিকে। আর তুমি-আমি চুপচাপ ওদের দেখে যাবো। আমাদের মনোযোগ থাকবে ওদের দিকে।"

বুঝতে পারলাম, একেবারে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার চেয়ে এটা অনেক ভালো। একটা চেষ্টা করে দেখা যেতেই পারে।

"আমাদের যে সব দর্শক দেখতে হবে তা নয়, ভাগ্য ভালো থাকলে খুব সহজেই ও চোখে পড়ে যেতে পারে।"

gronthagaar.blogspot.com

এটাও আমার কাছে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হলো। "ওর একটা ছবি আমাদের হাতে থাকলে ভালো হয়। কিছু দর্শককে দেখিয়ে জানতে চাইলাম...কি বলেন?"

একটু ভেবে নিলেন হায়দারভাই। "গুড। আইডিয়াটা আমার পছন্দ হয়েছে। ঝালমুড়ি আর সিগারেট বিক্রি করে যারা তারা নিয়মিত সাপোর্টারদের চিনতে পারে। কিছু দর্শককেও দেখানো যেতে পারে।"

কথাটা শুনে খুব ভালো লাগলো। আমার প্রস্তাব গৃহিত হয়েছে।

"তাহলে আগামিকাল বিকেলে আমরা ওয়ান্ডারাস আর আবাহনীর খেলা দেখতে যাচ্ছি।"

"ওকে, বস্।" হেসে বললাম আমি।

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

অধ্যায় ১৪

খেলা

জীবনে প্রথম স্টেডিয়ামে গেলাম খেলা দেখতে নয়, আসামি ধরতে!

তার মানে এই নয় ঢাকা স্টেডিয়াম আমার কাছে অপরিচিত জায়গা। মাঝেমাঝে ওখানে ঢু মারতাম আমি, কিন্তু সেটা অবশ্যই মাঠের বাইরে। ঐ সময় ঢাকা শহরে নিউ মার্কেট ছাড়াও স্টেডিয়ামের নীচে বড় বড় কয়েকটি বইয়ের দোকান ছিলো। সেকেন্ডহ্যান্ড ইংরেজি বইও পাওয়া যেত কিছু দোকানে।

তো, হায়দারভাই আর আমি একদিনের জন্য আবাহনীর সাপোর্টার হয়ে গেলাম!

পশ্চিম-গ্যালারিতে ঢুকে দেখি একেবারে কাণায় কাণায় পূর্ণ। হায়দারভাই বলেছিলেন নতুন দল আবাহনীর সপোর্টার অতো বেশি হবে না। কিন্তু গ্যালারি চিত্র সে-কথা বলছিলো না। আবাহনীর সাপোর্টাররা সংখ্যায় যেমন বেশি তেমনি তারা সুসংগঠিত। অনেকেই দলের জার্সি পরে এসেছে। কারো কারো হাতে দলের পতাকা। অন্যদিকে পুব-গ্যালারিতে পুরনো দল ঢাকা ওয়ান্ডারাসের কয়েক হাজার সমর্থক-দর্শক দেখে মনে হলো, দীনহীন এক জমিদার বসে আছে! যার সমস্ত গৌরব আর জৌলুস ম্রিয়মান। যেন দলটির সাপোর্টাররা দীর্ঘদিনের অভ্যাসবশত চলে এসেছে স্টেডিয়ামে!

কট্টর সাপোর্টারদের গ্যালারিতে ঢুকে শুরু করে দিলাম মানুষের মুখ দেখার কাজ। শতশত, হাজার-হাজার মানুষের মুখ দেখা যে কী পরিমাণ বিরক্তিকর আর যন্ত্রণাদায়ক কাজ সেটা ভুক্তভোগি ছাড়া কেউ বুঝবে না।

খেলা শুরু হবার আগে পনেরো মিনিটে ইমতিয়াজের খোঁজ পেলাম না। খেলা শুরু হবার পর পনেরো-বিশ মিনিট অতিক্রান্ত হতেই আমাদের হতাশা বাড়তে শুরু করলো। হায়দারভাই দুই ঠোঙা চিনাবাদাম কিনে আনতে গেলেন। আমি জানি ইমতিয়াজের ছবি দেখিয়ে তিনি বাদামওয়ালাদের কাছে জানতে চাইবেন চেনে কি-না। ওদের কাছ থেকে কিছু না পেয়ে ফিরে এসে একটা বাদামের ঠোঙা আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন তিনি। ভাবখানা এমন, খাও আর দেখো!

gronthagaar.blogspot.com

কিন্তু কী দেখবো, জনসমুদ্র?

এক একটা সুদীর্ঘ গ্যালারি ধরে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মানুষের মুখ পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছি। ততোক্ষণে চোখ, ঘাড় আর মাথাব্যথা শুরু হয়ে গেছে আমাদের। সত্যি বলতে, খেলার হাফ-টাইমের একটু আগেই আমি হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। বাদাম চিবোতে চিবোতে মানুষের মুখগুলো আর দেখছিলাম না। শুধু ভান করছিলাম আমি ইমতিয়াজকে খুঁজে যাচ্ছি।

প্রথম আশার আলোটা দেখলেন হায়দারভাই-ই। হাফ-টাইম হবে হবে, ঠিক অমন সময় খপ্ করে আমার হাতটা ধরে বললেন, "ঐযে!"

আমি চমকে তাকালাম তার দিকে। "কোথায়?"

আমার কথার জবাব না দিয়ে তিনি ছুটে গেলেন সামনের একটা গ্যালারির দিকে। অগত্যা তাকে অনুসরণ করতে বাধ্য হলাম আমি।

গ্যালারি ভর্তি দর্শকের মধ্য দিয়ে ঠেলেঠুলে এগোনোটা যে কতো দুরুহ ব্যাপার সেটা হাঁড়ে হাঁড়ে টের পেলাম। ফুটবলপ্রেমিদের মনোযোগ বিঘ্ন ঘটিয়ে, গালাগালি হজম করে এগিয়ে গেলেন এসএম হায়দার, আর তার পিছু পিছু আমি। তাকে যে কিছু বলবো তার কোনো উপায় নেই। তবে জিজ্ঞেস করার খুব একটা দরকারও পড়েনি, ভালো করেই জানতাম ইমতিয়াজকে দেখতে পেয়েছেন!

নিবিষ্টমনে খেলা দেখতে থাকা এক যুবককে কলার ধরে টেনে ওঠাতে যাবেন অমনি থমকে গেলেন এসএম হায়দার। যুবক ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো। আমি তার পেছনে এসেই বুঝতে পারলাম কি হয়েছে।

ভুলে ইমতিয়াজ মনে করে এক যুবককে ধরেছেন তিনি!

ছেলেটা দেখতে ইমতিয়াজের মতো। মানে, ছবিতে যে ইমতিয়াজকে আমরা দেখি। সন্দেহভাজনকে আমরা তখনও সামনাসামনি দেখিনি। সুতরাং বাস্তবের ইমতিয়াজ কেমন তা জানতাম না, ভুল হওয়াটা একদম স্বাভাবিকই ছিলো।

যাই হোক, সঙ্গে সঙ্গে কলার ছেড়ে দিয়ে হাসিমুখে যুবককে এসএম হায়দার বললেন, "সরি ভাই। আমি ভেবেছিলাম আমার বন্ধু ইমতিয়াজ।" বলেই তিনি আমার দিকে ফিরলেন।

বিরক্ত হয়ে সেই যুবক বিড়বিড় করে কিছু বললেও সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই আমাদের।

আক্ষেপে মাথা দোলালেন এসএম হায়দার। আমি তার বাহু ধরে ওখান থেকে টেনে নিয়ে এলাম অপেক্ষাকৃত কম ভিড়ের একটি জায়গায়।

gronthagaar.blogspot.com

"ভাই, এভাবে যাকে তাকে ধরলে তো গণপিটুনি দেয়া শুরু করবে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন তিনি, "হুম।"

কিন্তু আমার মনে হলো না হায়দারভাই বুঝেছেন। তিনি যে ছবির ইমতিয়াজকে গ্যালারিতে থাকা হাজার-হাজার দর্শকের ভেতর থেকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে মরিয়া সেটা তার চোখমুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো।

"চলো, একটা সিগারেট ধরাই," বলে তিনি আমাকে আরেকটু কম ভিড়ের জায়গায় নিয়ে গেলেন। "এটা কোনো ব্যাপার না, বুঝলে।" আমি কিছু বলার আগেই আবার বললেন, "এরকম মিসটেক হতেই পারে। আমরা তো ঐ রেপিস্টটাকে সামনাসামনি কখনও দেখিনি, তাই না?"

আমি আর কী বলবো। চুপচাপ তার বাড়িয়ে দেয়া সিগারেটটা ধরিয়ে বার কয়েক টান দিলাম। আমাদের চারপাশে উত্তেজিত দর্শক। নিজের দলের অলস, অকর্মণ্য আর অযোগ্য সব খেলোয়াড়দের মা-বাপ তুলে গালাগালি করছে। এদের দিয়ে কাজ হবে না। খালি পোস্ট পেলেও বল বাইরে দিয়ে মারবে এরা! একেকটার নল্লি ভেঙে লুলা করে দেয়া দরকার। হারামজাদারা ফুটবল খেলতে এসেছে নাকি জাম্বুরা!

এরকম কথার ফুলঝুরি ছুটছে চারপাশে। ভালো করে কান পাতলে অনেক মজার মজার কথাও শোনা যেত কিন্তু আমরা ওখানে গেছি আসামি ধরতে, খেলা দেখতেও নয়। ক্ষুব্ধ দর্শক হয়ে মনের আশ মিটিয়ে গালাগালি করতে তো নয়-ই।

হায়দারভাই উদাস হয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে সিগারেট টেনে যেতে লাগলেন। আমিও কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে মাঠের দিকে নজর দিলাম।

"এই যে, এরা গালাগালি করছে, এদের একটু ভালো করে দেখো তো।"

হায়দারভায়ের এমন অপ্রাসঙ্গিক কথা শুনে আমি তার দিকে ফিরে তাকালাম। তারপর গালাগালি করতে থাকা লোকজনের দিকেও চোখ বোলালাম একটু। "বুঝলাম না...কী বলছেন?"

"এই যে এরা প্লেয়ারদের মা-বাপ-চৌদ্দগুষ্টি তুলে গালি দিচ্ছে, এরা কারা?"

প্রশ্নটা এমনই যে প্রথমে আমার মনে হয়েছিলো হায়দারভাই বুঝি মজা করছেন। কিংবা হেয়ালি করছেন অন্য কিছু বলার জন্য। এসএম হায়দারকে আমি যতোদিন ধরে চিনতাম, তাতে এটা স্পষ্ট, উনি এরকম সহজ প্রশ্ন করছেন অন্য একটা কারণে। তবে সেই কারণটা আমি তখনও জানতাম না।

gronthagaar.blogspot.com

"এরা সাপোর্টার।" আমিও তার সহজ প্রশ্নে সহজ জবাব দিলাম।

মাথা নেড়ে সায় দিলেন তিনি। "হুম। কোন্ দলের?"

একেবারেই বালখিল্য প্রশ্ন। "কেন, আবাহনীর!"

"তাই?"

আমি এবার সত্যি সত্যি অবাক হলাম। এখানে ঢোকার আগে হায়দারভাই আমাকে এ বিষয়ে জ্ঞান দিয়েছিলেন। দু-দলের সমর্থক বসে দুটো আলাদা গ্যালারিতে। এখানে ভুল করলে বিপদ। এটা যেন অনেকটা শত্রু-শিবিরে ঢুকে পড়ার মতোই বিপজ্জনক কাজ।

"আশ্চর্য, আবাহনীর গ্যালারিতে কি অন্যদলের সাপোর্টার বসবে নাকি!" বিরক্ত হয়ে আবার বললাম, "আপনিই না একটু আগে জ্ঞান দিলেন আমাকে?"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন এসএম হায়দার। "একদম ঠিক। কিন্তু এরা যেভাবে গালি দিচ্ছে...একেবারে মা-বাপ তুলে...আমার তো মনে হচ্ছে না এরা কেউ আবাহনীর সমর্থক।"

আমি চারপাশে আবারো তাকালাম। উদ্বিগ্ন আর ক্ষিপ্ত সমর্থকদের শত শত মুখ আর সেই মুখ থেকে বের হচ্ছে ভয়ঙ্কর সব খিস্তি।

"আমি আসলে বুঝতে পারছি না, আপনি কী বলতে চাচ্ছেন?"

"আমি বলতে চাচ্ছি, যারা প্লেয়ারদের এভাবে গালাগালি করছে তারা কিভাবে এই দলের সমর্থক হয়? আমার তো ঘোরতর সন্দেহ হচ্ছে।"

"কিসের সন্দেহ?" এবার আমি সিরিয়াস হয়ে উঠলাম।

"আমি নিশ্চিত, এরা আবাহনীর সমর্থক না...ওয়ান্ডারাসের হবে বোধহয়।"

আমি বেকুবের মতো আবারো চারপাশে গ্যালারির দিকে তাকালাম। শত শত, হাজার-হাজার মুখ দেখে মনে হচ্ছে না এরা প্রতিপক্ষ দলের সমর্থক। কয়েকজন খিস্তিবাজ লোকের হাতে আবাহনীর পতাকা পর্যন্ত আছে।

"না, ভাই, এরা সবাই আবাহনীর সমর্থক। নিজের দলের খেলা পছন্দ না হলে সবাই এমন করে। তার মানে এই না, এরা অন্যদলের।"

"ঠিক বলছো। আমারও তাতে কোনো সন্দেহ নেই।"

হায়দারভায়ের এমন হেয়ালিপূর্ণ কথায় আমি সত্যি সত্যি হতভম্ব হয়ে গেলাম।

"এরা সবাই আবাহনীর সমর্থক। এই গ্যালারিতে আবাহনীর বিরুদ্ধে সমর্থন করলে তার হাড্ডি-গুড্ডি এক করে ফেলবে সাপোর্টাররা।"

Gronthagar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

"আশ্চর্য, আপনি একবার বলছেন এরা আবাহনীর সমর্থক না...আবার এখন বলছেন এরা..."

হায়দারভায়ের মুখে যে চওড়া আর নিঃশব্দ হাসি দেখতে পেলাম সেটা আমাকে পরিষ্কার বলে দিচ্ছে উনি এখন সমস্ত প্রহেলিকা বাদ দিয়ে আসল কথায় চলে আসবেন।

"তাহলে কেউ যদি শেখসাহেবের সমালোচনা করে, তার দলের সমালোচনা করে তাকে তুমি প্রতিপক্ষ ভাববে নাকি সমর্থক ভাববে?"

বুঝতে পারলাম আমি। হায়দারভাই যে সব সময় সরকারের সমালোচনা করে, বঙ্গবন্ধুর সমালোচনা করে সে কারণে আমি তাকে বঙ্গবন্ধু আর আওয়ামী বিরোধি হিসেবে মনে করি। কিন্তু উনি যে এই স্টেডিয়ামে আসামি ধরতে এসে আমাকে ঈসপের মতো গল্পেরছলে শিক্ষা দেবেন, চোখে আঙুল দিয়ে আমার ভুল ধরিয়ে দেবেন সেটা আশা করিনি। স্বাভাবিকভাবেই আমি লা-জওয়াব হয়ে ছিলাম। এসএম হয়দারের খুরধার যুক্তিতে আমি পর্যুদস্ত। আমার আর কিছুই বলার ছিলো না।

"বুঝেছি। এখন চলেন...মনে হচ্ছে আসামি ধরার আশা বাদ দিয়েছেন," আমি তাকে বললাম।

মাথা দোলালেন তিনি। "এতো সহজে ধৈর্যহারা হলে চলে না, বুঝেছো?" সিগারেটে জোরে জোরে টান দিয়ে বললেন এসএম হায়দার। "ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন খুব টাফ জব।"

কথাগুলো যে আমার উদ্দেশ্যে সেটা বুঝতে পারলাম। "ভাই, আমি ধৈর্যহারা হচ্ছি না, শুধু বলতে চাচ্ছি কাণ্ডজ্ঞানহীনভাবে খোঁজাখুঁজি করা ঠিক হবে না।"

আমাকে অবাক করে দিয়ে হায়দারভাই মাথা নেড়ে সায় দিলেন। "ঠিক বলছো।"

কিন্তু আমার মনে হলো না তিনি এই খড়ের গাদায় সূঁচ খোঁজা বাদ দেবেন। "আমরা কি আরো কিছুক্ষণ থাকবো নাকি চলে যাবো?"

বিস্মিত হলেন এসএম হায়দার। "কি বলো? খেলার তো হাফটাইমও হলো না এখনও।"

"আপনি খেলা শেষ হওয়ার পর্যন্ত এখানে থাকতে চাইছেন?" আঁতকে উঠলাম আমি।

"আজব কথা বললে," সিগারেটে জোরে জোরে টান মেরে বললেন, "খেলা শেষ হবার পরই তো আসল খোঁজাখুঁজি শুরু হবে।"

gronthagaar.blogspot.com

পাগলে কয় কি! মনে মনে বলে উঠেছিলাম। "আসল খোঁজাখুঁজি মানে?"

"আহা, খেলা শেষ হলে কি সবাই হুটহাট করে বাড়িতে চলে যায়? আড্ডাবাজি করে, স্টেডিয়ামের বাইরে রেস্টুরেন্টগুলোতে ঢুকে হালকা খাওয়া-দাওয়া করে। এখানে সেখানে জটলা পাকিয়ে আড্ডা মারে।"

"আপনি কি ওইসব জায়গাতেও ঢু মারবেন?"

"মারবো না?" পাল্টা বলে উঠলেন। "এই সুযোগ কি বার বার পাবো? আবার কবে না কবে খেলা হয়।"

কিছু বলতে যাবো অমনি টের পেলাম সব দর্শক উঠে যাচ্ছে। খেলার হাফটাইম হয়ে গেছে ততোক্ষণে। আমি আর হায়দারভাই দু-জনেই টয়লেটে চলে গেলাম। ফিরে এসে আরো দুই প্যাকেট বাদাম কিনে বসে পড়লাম গ্যালারিতে। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হবার আগে আবারো তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দর্শকদের মধ্যে একটা মুখ খুঁজে গেলাম দু-জনে।

খেলা আবার শুরু হলো। কোনো দলই গোল করতে পারেনি তখনও। সমর্থকদের মধ্যে টানটান উত্তেজনা। কিন্তু আমি আর এসএম হায়দার সেই উত্তেজনা থেকে মুক্ত। আমাদের উত্তেজনা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের।

প্রায় ষাট মিনিট অতিক্রম হয়ে গেলেও খেলার মতোই নিষ্ফল রইলো আমাদের প্রচেষ্টা। দু-দল যেমন হন্যে হয়েও গোলের দেখা পায়নি তেমনি আমরাও ইমতিয়াজের দেখা পেলাম না গ্যালারির কোথাও। ততোক্ষণে একটা ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেলাম–আমাদের সন্দেহভাজন ঢাকা শহরে নেই। প্রিয় দলের খেলা দেখার জন্য ঢাকায় আসার ঝুঁকিও সে নেয়নি।

হায়দারভায়ের দিকে তাকালাম। বেচারা এক মিনিটের জন্যেও মাঠের দিকে তাকাচ্ছেন না। তাকে যদি কেউ খেয়াল করতো দেখতে পেতো, তিনি মাঠের দিকে চোখ না রেখে দর্শকদের দেখে যাচ্ছেন নিবিষ্টমনে। নিজের হতাশা দূর করতেই যেন একের পর এক সিগারেট ধ্বংস করে যাচ্ছেন। আমি অবশ্য তার সাথে পাল্লা দিয়ে সিগারেট খাইনি। চুপচাপ গ্যালারিতে বসে নিষ্ফল খেলাটাই দেখতে শুরু করে দিয়েছিলাম ততোক্ষণে। আমার দিকে তাকানোরও ফুরসত নেই হায়দারভায়ের। তিনি হাজার হাজার মুখ দেখার কাজে ডুবে থাকলেন।

সম্ভবত খেলা শেষ হবার দশ-বারো মিনিট আগে, যখন আবাহনীর সমর্থকেরা গালাগালি আর উল্লাস করা বাদ দিয়ে আমাদের মতোই হতাশ

Granthagar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

হয়ে বসে আছে ঠিক তখনই তাদের দলের দশ নাম্বার জার্সির স্ট্রাইকার আরেকটি সহজ সুযোগ নষ্ট করে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে টের পেলাম আমার চারপাশে ক্ষিপ্ত সমর্থকদের গালাগালির ফোয়ারা ছুটে যাচ্ছে। কিন্তু অজস্র মানুষের অজস্র গালাগালির মধ্যে একজনের বিক্ষুব্ধ কণ্ঠ আমার মনোযোগ আকর্ষণ করলো। আমি জানি না কেন, মাথাটা ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম সেই বিশিষ্ট গালিবাজকে।

"চুতমারানির পোলা! লোপ্পা পায়াও গোল দিবার পারে না! বালের স্ট্রাইকার একটা!"

সত্যি বলতে কোনো রকম প্রচেষ্টা ছাড়াই, একেবারে ঘটনাচক্রে কিংবা ঝড়ে বক মরার মতো, আমার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো গালাগালি করতে থাকা লোকটার উপরে। আমার পেছনে, বামদিকে এক রো উপরে বসে আছে সে। রেগেমেগে চোখমুখ খিচে সিগারেটে জোরে জোরে টান দিচ্ছে আর খিস্তির ফোয়ারা ছোটাচ্ছে। মুখটা আস্ত শয়তানের মতোই দেখাচ্ছে যেন!

ইমতিয়াজ?

আমি নিশ্চিত হতে না পারলেও কয়েক মুহূর্তের জন্য হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। পুরোপুরি নিশ্চিত হবার জন্য তড়িঘড়ি পকেট থেকে সাদা-কালো একটি ছবি বের করে দেখে নিলাম। মিলিয়ে নিলাম ছবির সাথে কয়েক হাত দূরে বসা মানুষটিকে। সাদা-কালো গ্রুপফটো থেকে একজন মানুষকে দেখে বাস্তবের কারো সাথে মিলিয়ে নেয়াটা খুবই দুরুহ ব্যাপার। আমি দ্বিধায় পড়ে গেলাম। বিদ্যুৎগতিতে তাকালাম হায়দারভায়ের দিকে। উনি আমার থেকে বেশ খানিকটা দূরে চলে গেছেন। নাছোরবান্দার মতো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন গ্যালারির প্রতিটি রো। একটু জোরেই ডাকলাম।

"হায়দারভাই!"

চমকে তাকালেন তিনি। আমার চিৎকারের মধ্যে কিছু একটা ছিলো হয়তো, সম্ভবত একটা তাড়না। তার সাথে চোখাচোখি হতেই তিনি বুঝে গেলেন আমি সম্ভবত ইমতিয়াজকে দেখেছি। দেরি না-করে দর্শকদের ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসতে লাগলেন। তার চোখ ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার চারপাশে।

"কোথায়!?" তাড়া দিয়ে জানতে চাইলেন তিনি।

আমি আস্তে করে তাকে দেখিয়ে দিলাম আমার পেছনে বামদিকে বসা ক্ষিপ্ত আর খিস্তি আউড়াতে থাকা লোকটার দিকে।

হায়দারভাইও যেন নিশ্চিত হতে পারলেন না। আমার হাত থেকে

gronthagaar.blogspot.com

ইমতিয়াজের ছবিটা ছোঁ মেরে নিয়ে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করলেন। একবার ছবির দিকে, আরেকবার খিস্তিবাজের দিকে চোখ কুচকে তাকিয়ে নিশ্চিত হতে চাইছেন। একটু আগে ভুল করে একজনকে ধরেছিলেন, সেজন্যে তিনি বেশি সতর্ক এখন।

আমার দিকে তাকালেন হায়দারভাই। "ইমতিয়াজই তো মনে হচ্ছে, তাই না?"

কিন্তু আমি তার অনিশ্চয়তা দূর করতে পারলাম না, এটা করলো ইমতিয়াজ নিজেই!

সম্ভবত আমাদের দিকে চোখ গেছিলো বদমাশটার, সে কিছুটা আঁচ করতে পেরে ভড়কে গেলো। চোরের মন পুলিশ পুলিশ–কথাটা অবশ্যই সত্যি। হায়দারভাই আর আমার সাথে তার কয়েক মুহূর্তের চোখাচোখি হতেই দৌড় দিলো সে।

"শূয়োরেরবাচ্চা!" দাঁতে দাঁত পিষে বললেন হায়দারভাই।

সন্দেহের আর কোনো অবকাশ নেই। আমার জন্য অপেক্ষা না করেই উপরের রো-তে ওঠার জন্য পা বাড়ালেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে পুরো গ্যালারিটা আন্দোলিত হয়ে উঠলো একসঙ্গে। সেইসাথে গগনবিদারি উল্লাস-ধ্বণি!

গোল!!

কোন্ দল দিয়েছে সেটা মাঠের দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারলাম। খেলা শেষ হবার মাত্র দশ মিনিট আগে আবাহনী সত্যি সত্যি তাক লাগিয়ে দিয়েছে গোল করে। পুরো গ্যালারিটা যেন সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো তরঙ্গায়িত হতে লাগলো। একজনও নিজের আসনে বসে নেই। সবাই লাফাচ্ছে অভূতপূর্ব এক উল্লাসে। সেই প্রথম আমি দেখলাম স্টেডিয়ামে খেলার দেখার কী উন্মাদনা।

হায়দারভাই আর আমার পক্ষে উন্মাতাল দর্শকদের ডিঙিয়ে ইমতিয়াজের নাগাল পাওয়া সম্ভব হলো না। নিরূপায় হয়েই কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হলো। লাফালাফি করা সমর্থকদের ফাঁকফোকড় দিয়ে দেখার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলাম।

সুদীর্ঘ এক মিনিট পর দর্শকদের উন্মাদনা নিস্তেজ হয়ে আসতেই হতাশার সাথে দেখতে পেলাম ইমতিয়াজ নেই! আশেপাশে চোখ বুলালাম উদভ্রান্তের মতো, শতশত মুখের ভিড়ে খুঁজে পেলাম না তাকে।

হায়দারভাই আমার দিকে তাকালেন। তার চোখের ভাষা বুঝতে

gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

অসুবিধা হলো না। আমাদের সন্দেহভাজন হাত ফস্‌কে পালিয়ে গেছে। আর খুনির জন্য আশির্বাদ হয়ে নাজেল হয়েছে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত একটি গোল! সেই গোলটা যেন ওয়ান্ডারাসের বিরুদ্ধে নয়, আমাদের বিরুদ্ধে করা হয়েছে! আবারো পিছিয়ে গেলাম আমরা। দ্বিতীয়বারের মতো!

কিন্তু এসএম হায়দার হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নন। কী মনে করে যেন গ্যালারির উপরের দিকে রো-গুলো ডিঙিয়ে উঠতে শুরু করলেন আমাকে কোনো কিছু না বলেই। তার ভাবসাব দেখে আমি নিশ্চিত বুঝে গেলাম তিনি কতোটা মরিয়া। একজন ধর্ষক-খুনি তার হাত ফস্‌কে চলে যাবে–এটা তিনি মেনে নিতে পারছেন না। কয়েক বছর আগে যুদ্ধ করেছেন। তার রক্তে তখনও যোদ্ধার তেজ বিরাজ করছিলো পূর্ণমাত্রায়। অগত্যা আমিও তার সাথে পাল্লা দিতে বাধ্য হলাম।

হায়দারভাই গ্যালারির উপরের দিকে রো-তে উঠতেই ঘটনা ঘটে গেলো। ইমতিয়াজ, যে কি-না দর্শকদের মধ্যে নীচু হয়ে ঘাপটি মেরে বসে ছিলো, সে বুঝে গেলো এভাবে ধোঁকা দেয়া যাবে না। উঠেই দৌড় লাগালো সে। তার গন্তব্য গ্যালারির আরো উপরে। আমি দেখতে পেলাম হায়দারভাই তার দিকে ছুটে যাচ্ছে। আমিও প্রাণপণে চেষ্টা করলাম তাদের কাছে পৌঁছাতে। গ্যালারির দর্শক গোলের আবেগে আপ্লুত, তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই আমাদের দিকে। কয়েকজন হয়তো ব্যাপারটা খেয়াল করে অবাক হয়ে চেয়ে ছিলো কিন্তু তাদের দিকে তাকানোর ফুরসতও আমাদের ছিলো না।

ইমতিয়াজ গ্যালারির উপরে উঠে অন্যদিক দিয়ে আবার নেমে যেতে শুরু করলো। তার থেকে দুটো রো নীচে ছিলাম বলে হায়দারভাই চকিতে আমার দিকে তাকিয়ে ইশারা করলেন। আমি দ্রুত সরে গিয়ে ইমতিয়াজের পথরোধ করে দাঁড়ালাম। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সে থমকে দাঁড়ালো কয়েক মুহূর্ত, তারপরই বামদিকে অনেকটা ঝাঁপিয়ে কিছু দর্শকের গায়ে গিয়ে পড়লো। কোণঠাসা বেড়ালের মতো মরিয়া সে। পড়িমরি করে উঠে দাঁড়াতেই আবার দৌড় লাগালো। বেশ কিছু দর্শক বুঝতে না পেরে গালাগালি শুরু করলে স্টেডিয়ামে ছোটোখাটো একটি হল্লা তৈরি হয়ে গেলো মুহূর্তে। কিন্তু আবাহনীর আরেকটি আক্রমণ শুরু হলে তাদের সবার মনোযোগ চলে গেলো সেদিকে। ইমতিয়াজের জন্য দারুণ সুযোগ তৈরি করলো এটা। প্রতিটি রো লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে যেতে শুরু করলো সে। তার কারণে কিছু দর্শক ধাক্কা খেয়ে হুরমুর করে পড়েও গেলো। আমি অবশ্য

gronthagaar.blogspot.com

তার মতো করে এগোতে পারলাম না। হায়দারভাইও না।

আমরা দু-জনেই দেখতে পেলাম চোখের সামনে দিয়ে ইমতিয়াজ স্টেডিয়াম থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। আমাদের থেকে তার দূরত্ব খুব বেশি ছিলো না কিন্তু দর্শকভর্তি গ্যালারি দিয়ে দ্রুত নেমে যাওয়াটা সত্যি কঠিন কাজ। ইমতিয়াজ যখন একদম নীচের রো-তে তখন আমি আর হায়দারভাই তিন রো উপরে। এটা বুঝতে আর বাকি রইলো না, তার নাগাল পাওয়াটা প্রায় অসম্ভব।

স্টেডিয়ামের আট নাম্বার গেট দিয়ে দৌড়ে বের হয়ে গেলো আমাদের শিকার।

হায়দারভাই তখনও হাল ছেড়ে না দিয়ে প্রাণপণে দৌড়ে যাচ্ছেন। আমরা যখন আট নাম্বার গেটটা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম তখন ইমতিয়াজের টিকিটাও দেখতে পেলাম না। আউটার স্টেডিয়ামের দিকে তাকালাম আমি–এখন যেটা মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়াম হিসেবেই সবাই চেনে। বিশাল খোলা প্রাঙ্গন। সেখানে কিছু টোকাই ছেঁড়া-ফাঁটা ফুটবল নিয়ে খেলছে। আর কেউ নেই। হায়দারভাই সম্ভবত আগেই এটা দেখেছে, তিনি সোজা দৌড়ে গেলেন পশ্চিম-দিকের মেইনগেটটার কাছে। একটু পরই খেলা শেষ হয়ে গেলে হাজার-হাজার দর্শক গেট দিয়ে বেরিয়ে আসবে। এরইমধ্যে আশাহত ওয়ান্ডারাসের সমর্থকেরা বেরিয়ে আসছে একে একে। স্টেডিয়ামের বাইরে কোলাহল বাড়ছে ক্রমশ।

দম ফুরিয়ে প্রায় কুপোকাত আমি। একটু থেমে জিরিয়ে নিলাম। কিন্তু হায়দারভাইকে দেখতে পেলাম হঠাৎ করেই তিনি স্টেডিয়ামের ডানদিকে, বায়তুল মোকারমের পাশ দিয়ে দৌড়ে গেলেন। আমি বাধ্য হয়েই তাকে অনুসরণ করলাম।

কিছুটা সামনে গিয়েই দেখি আমার থেকে বিশ-ত্রিশ গজ সামনে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। তার সামনে দু-জন মানুষ ধরাশায়ি হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। তাদের একজনকে চিনতে ভুল হলো না আমার–ইমতিয়াজ।

স্টেডিয়ামের উত্তর-দিকে পুরানা পল্টনের যে গেটটা আছে সেখান দিয়ে বের হয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলো ইমতিয়াজ। কিন্তু এক ঘুমনিওয়ালার সাথে ধাক্কা লাগতেই তারা দু-জন হুরমুর করে পড়ে যায়। রাস্তায় ছিটকে পড়ে ঘুমনির বোলসহ বাকি জিনিসপত্র।

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

হায়দারভাই দ্রুত পিস্তল বের করে তাক্ করে ফেলে ইমতিয়াজের দিকে। বেচারা মাটি থেকে উঠে আর দৌড়ানোর সাহস করেনি।

আমি তার কাছে এগিয়ে যেতেই দেখতে পেলাম দম ফুরিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে নিচ্ছেন। ইমতিয়াজ উঠবে-কি-উঠবে না একরকম দ্বিধায় পড়ে ফ্যালফ্যাল চোখে চেয়ে আছে। তাকে শেষ ওয়ার্নিং দেবার জন্য গর্জে উঠলেন এসএম হায়দার।

"শূয়োরেরবাচ্চা, পালানোর চেষ্টা করলেই গুলি করবো!"

Gronthagaar.blogspot.com

অধ্যায় ১৫

স্বীকারোক্তি

ভেবেছিলাম ইমতিয়াজকে থানায় নিয়ে আসার পর হায়দারভাই তার উপরে চড়াও হবেন কিন্তু দেখা গেলো তিনি একদম শান্ত হয়ে গেলেন। ব্যাপারটা আমার কাছে অস্বাভাবিক বলেই মনে হলো। মনে মনে প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলাম মিলির খুনির উপরে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লে তাকে কিভাবে বিরত রাখবো।

থানায় লকাপের পাশে একটা খালি ঘর, ওটাকেই আমরা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ব্যবহার করি, ইমতিয়াজকে ওই ঘরে বসিয়ে রেখে হায়দারভাই আমাকে নিয়ে বাইরে চলে এলেন। আমি নিজের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে তার দিকে বাড়িয়ে দিলে তিনি সেটা ধরিয়ে উদাস হয়ে টানতে লাগলেন।

"এখন মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে হবে," কিছুক্ষণ পর ধোঁয়া ছেড়ে বললেন।

আমিও একটা ধরিয়ে টান দিলাম। "হুম।"

"আমরা মোটামুটি নিশ্চিত খুনটা ও-ই করেছে, কিন্তু এটা ওর মুখ দিয়ে বের করতে হবে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলাম। "এতো সহজে মুখ খুলবে বলে তো মনে হয় না।"

"কেউই সহজে মুখ খোলে না, খোলাতে হয়।" উদাস হয়ে সিগারেটে টান দিতে দিতে বললেন এসএম হায়দার।

"আপনি টর্চার করবেন নাকি?"

আমি অবশ্য এর আগে মাত্র একবারই হায়দারভাইকে আসামি ধরে এনে টর্চার করতে দেখেছি। তবে সেটার কারণ ছিলো একদমই ভিন্ন। গত বছর সরকারের কড়া নিষেধ থাকা সত্ত্বেও আকালের সময় এক ব্যবসায়ি খাদ্যদ্রব্য স্টক করে রেখেছিলো। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে এলে হায়দারভাই হঠাৎ করেই তার উপরে চড়াও হন। নিজের বেল্ট খুলে

gronthagaar.blogspot.com

আচ্ছামতো পেটান লোকটাকে। আমরা দু-তিনজন তাকে ধরে নিবৃত্ত করেছিলাম। পরে হায়দারভায়ের কাছে যখন জানতে চেয়েছিলাম আচমকা তার এমন আচরণের কারণ, তখন তিনি বলেছিলেন, এই ব্যবসায়ি সরকারি দলের স্থানীয় এক নেতা। ওর বিরুদ্ধে কোনো কেস করা যাবে না। করলেও লাভ নেই। কোর্ট থেকে জামিন নিয়ে বেরিয়ে পড়বে। তাছাড়া একটু পরই যে দলের নেতারা ফোন করে ছেড়ে দিতে বলবে সেটা তিনি নিশ্চিত জানতেন। আদতে তা-ই হয়েছিলো। সেজন্যেই ছেড়ে দেবার আগে একটু 'ধোলাই' করে দিয়েছিলেন।

লম্বা করে ধোয়া গিলে মাথা দোলালেন তিনি। "না। প্রথমে কিছুই করবো না।"

"কিন্তু ও যদি কোনো কিছু না বলে, তখন?"

আমার দিকে তাকালেন। "যখন যেটা করতে হবে সেটাই করবো, ব্রাদার।"

আমি কিছু না বলে সিগারেটের দিকে নজর দিলাম।

"যেভাবেই হোক ওর কাছ থেকে কথা বের করতে হবে।"

"ছেলেটা তো রাজনীতি করে, নেতারা ফোন করতে পারে।"

"কোনো ফোনেই কাজ হবে না," কথাটা বেশ জোর দিয়ে বললেন তিনি। "যে ফোন করবে তাকে আমার স্পেশাল গালি খেতে হবে আজ।"

এসএম হায়দারের স্পেশাল গালাগালিগুলোর সম্পর্কে সম্যক ধারণা ছিলো আমার।

সিগারেট শেষ করে আমি আর হায়দারভাই ঢুকলাম সেই ঘরে।

ইমতিয়াজ চেয়ারে বসে আছে। চোখেমুখে ভড়কে যাবার লক্ষণ। আমাদের দেখে মুখ তুলে তাকালো সে।

হায়দারভাই তার সামনে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসলো। "ওঠ্," আদেশের সুরে বললেন তিনি।

ঢোক গিলে আস্তে করে উঠে দাঁড়ালো আমাদের সন্দেহভাজন।

ইমতিয়াজ যে চেয়ারে বসেছিলো এতোক্ষণ সেটায় বসে পড়লেন হায়দারভাই। "বস্," আসামিকে বসার নির্দেশ দিলেন তিনি।

ইমতিয়াজ আশেপাশে একটু তাকালো। ঘরে আর কোনো চেয়ার নেই।

"মাটিতে বস্," হায়দারভাই শীতলকণ্ঠে বললেন।

ইমতিয়াজ মাটিতে বসে পড়লো চুপচাপ। তার চোখমুখ দেখে মনে হলো অপমানিত বোধ করছে। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম হায়দারভায়ের পাশে।

gronthagaar.blogspot.com

"তোর নাম কি?"

ইমতিয়াজ সম্ভবত এমন প্রশ্ন আশা করেনি। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থেকে বললো, "ই-ইমতিয়াজ।" একটু ঢোক গিলে নিলো এবার। "ইমতিয়াজ শফিক।"

"কি করিস?"

অধৈর্য হয়ে উঠলো সন্দেহভাজন। "আ-আমাকে ধরে এনেছেন কেন? আমি কি করেছি?"

হায়দারভায়ের অভিব্যক্তি একটুও বদলালো না। নির্বিকার ভঙ্গিতে তিনি বললেন, "কেন ধরে এনেছি সেটা তুই ভালো করেই জানিস। এখন যা জানতে চাইবো আমাকে বলবি।" একটু থেমে আবার বললেন, "কি করিস? মানে, কাজ-কামের কথা বলছি।"

ঘন ঘন চোখের পাতা ফেললো ইমতিয়াজ। একটু সময় নিলো প্রশ্নের জবাব দিতে। "কিছু করি না।" অবশেষে বেশ তিক্ততার সাথে বললো সে।

"থাকিস কোথায়?"

"কাঠালবাগানে।"

"হারামির বাচ্চা, তাহলে দখল করা বাড়িতে থাকিস কেন?!"

ইমতিয়াজ চুপ মেরে গেলো।

"ইতর-বদমাশ নেতাদের চামচা নাকি লাঠিয়াল? কোন্‌টা বলবো?"

ইমতিয়াজ রেগেমেগে বলে উঠলো, "আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, আমাকে এখানে কেন ধরে এনেছেন? আমি কি করেছি?"

মুচকি হাসলেন হায়দারভাই। "জান্নাতুল ফেরদৌস মিলিকে চিনিস তো?"

সন্দেহভাজন দ্রুত ভেবে যেতে লাগলো, সে বুঝতে পারছে না কী বলবে।

হায়দারভাই তার চোখের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। এমন অন্তর্ভেদি দৃষ্টিতে বিদ্ধ হয়ে ইমতিয়াজ একটু ভড়কেই গেলো। "চিনিস ওকে?"

"হুম," আস্তে করে বললো সে।

"কিভাবে চিনিস? কতোদিন ধরে চিনিস?"

ইমতিয়াজ বেশ সময় নিলো এই প্রশ্নের জবাব দিতে। "আমাদের দুরসম্পর্কের আত্মীয় হয়। কিন্তু মিলির কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন?"

হায়দারভাই পায়ের উপর পা তুলে দিলেন। "কেন জিজ্ঞেস করছি বুঝতে পারছিস না?"

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

"না। আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। আমি কি করেছি?"

"কিছু না করলে নিজের বাড়িতে কেন থাকিস না? আমাদের দেখে ওভাবে পালালি কেন?"

ইমতিয়াজ জোর করে অবাক হবার ভঙ্গি করলো। "আরে, আপনারা দু-জন আমাকে দেখে দৌড়ানি দিলেন...ভয় পাবো না?"

"আচ্ছা। আর বাড়িতে কেন থাকিস না?"

"বাবার সাথে রাগারাগি করে থাকি না। কাজকর্ম কিছু করি না...বাবা এটা নিয়ে সব সময় কথা শোনায়।"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন হায়দারভাই। "ভালো। খুব ভালো।"

ইমতিয়াজ কিছু বুঝতে না পেরে চেয়ে রইলো।

"মিলি তো তোর আত্মীয় হয় তাহলে মেয়েটা খুন হবার পর ওর বাড়িতে গেলি না কেন? ওর অনেক আত্মীয়-স্বজনই গেছিলো...তোরও তো যাওয়ার কথা, তাই না?"

"মিলি খুন হয়েছে?" তার অভিনয়টা বেশ কাঁচা বলে মনে হলো আমার কাছে। "কই, আমি তো জানি না!"

"তোর মা জানে আর তুই জানিস না?"

"মিলি খুন হবার পর তো বাসায় যাইনি, জানবো কিভাবে?"

হায়দারভাই পাশে ফিরে আমার দিকে তাকালেন। "ও তো কিছু জানে না...কাকে ধরে আনলাম?" তারপর বাঁকাহাসি দিয়ে তাকালেন খুনির দিকে। "শূয়োরেরবাচ্চা! আমি কি তোকে বলেছি মিলি কবে খুন হয়েছে?"

ইমতিয়াজ বুঝতে পারলো বেফাঁস কিছু বলে ফেলেছে। একটু ঘাবড়ে গেলো সে।

"অথচ বলছিস, মেয়েটা খুন হবার পর আর বাড়িতে যাসনি! তার মানে মিলি কবে মারা গেছে তুই জানিস।" মাথা দোলালেন হায়দারভাই। "দারুণ। বুঝতে পারছি তুই অনেক স্মার্ট।"

রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছিলো। ইমতিয়াজ যে খুনি সে-ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ নেই।

"মিলির সাথে কি তোর কোনো সম্পর্ক ছিলো?"

"আমাদের আত্মীয় হয়।"

"আর কিছু?"

অনেকক্ষণ পর মাথা দুলিয়ে জানালো ইমতিয়াজ, "না।"

একটু সময় নিয়ে হায়দারভাই বললেন, "ও যেদিন খুন হয় সেদিন তুই কোথায় ছিলি? কার সাথে ছিলি?"

gronthagaar.blogspot.com

"পার্টি অফিসে ছিলাম।"

"কখন?"

মনে করার চেষ্টা করলো সে। "চারটার দিকে?"

"চারটার দিকে? মিলি যখন খুন হয় ঠিক তখনই?" কথাটা বলেই আমার দিকে তাকালেন হায়দারভাই। এরপর আরো শীতলকণ্ঠে বললেন, "তুই কেমনে জানলি ঠিক ঐ সময়ই মিলি খুন হয়েছিলো?"

ফ্যালফ্যাল চোখে চেয়ে রইলো ইমতিয়াজ শফিক। "মা-মানে?" তোতলালো একটু।

"মানে, তুই তো জানতি না মিলি কখন খুন হয়েছে, তাহলে নিজেকে বাঁচানোর জন্য কিভাবে বলছিস ঐদিন চারটর দিকে পার্টি অফিসে ছিলি। এত সময় থাকতে ঠিক ঐ সময়ের কথা বলছিস কেন? টাইমটা তো একেবারে মিলে যাচ্ছে! অ্যালিবাই তৈরি করতে চাচ্ছিস, সেটা না-হয় বুঝলাম কিন্তু এভাবে বোকার মতো সব কিছু সাজিয়ে বললে তো ধরা খেয়ে যাবি।"

"আপনি কি বলছেন, বুঝতে পারছি না," ইমতিয়াজ না বোঝার ভান করলো।

"তোর বোঝার দরকার নেই, আমার যা বোঝার বুঝে গেছি।"

আমি অনেক আগেই নিশ্চিত হয়ে গেছিলাম খুনটা ইমতিয়াজ করেছে, সেই মুহূর্তে আমার এই শক্তপোক্ত বিশ্বাস আরো জোড়ালো হয়ে উঠতে শুরু করলো। খুনিকে সামনে বসে থাকতে দেখে রাগে-ঘৃণায় কাঁপতে লাগলো আমার সারা শরীর।

Gronthogar.blogspot.com

"তাহলে শোন। একটা কালো ছাতা নিয়ে তুই মিলিদের বাড়িতে গেছিলি," একদম শান্তকণ্ঠে বললেন হায়দারভাই, "তুই মিলির ঘরের দরজার সামনে যখন কলিংবেল বাজাচ্ছিলি তখন দোতলার সিঁড়ি থেকে তোকে একজন দেখে ফেলেছে।"

কথাগুলো ইমতিয়াজের মধ্যে কি রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে দেখার জন্য একটু বিরতি দিলেন এসএম হায়দার।

আমাদের সামনে বসে থাকা মিলির খুনি পুরোপুরি ভড়কে গেলো কথাটা শুনে। সে অনেক চেষ্টা করেও অভিব্যক্তি লুকিয়ে রাখতে পারলো না।

"মিলিদের বাড়ির সামনে যে মুদি দোকানটা আছে, সেই মুদি আমাদের বলেছে ঘটনার কয়েকদিন আগে থেকে তুই নিয়মিত ঐ বাড়ির সামনে ঘুরঘুর করতি।"

gronthagaar.blogspot.com

ইমতিয়াজ রীতিমতো অস্থির হয়ে উঠলো। তার শ্বাসপ্রশ্বাস যে দ্রুত হয়ে গেছে সেটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা।

"তোর মা আমাদের বলেছে, মিলির খুন হবার পর থেকে তুই বাড়িতে থাকা বন্ধ করেছিস। ধানমণ্ডির একটা দখল হওয়া বাড়িতে থাকিস তুই। পুলিশ যে তোর বাড়িতে গেছিলো সেটা জানার পর কাপড়-চোপর নিয়ে বাড়ি থেকে চলে গেছিলি। আমরা ধানমণ্ডির ঐ বাড়িতে ঢোকার আগে দোতলা থেকে দেখে দেয়াল টপকে পালালি। একটুর জন্যে তোকে আমরা ধরতে পারিনি।"

ইমতিয়াজের মুখে কোনো রা নেই। তার চোখেমুখে অস্থিরতা। একটু ঘেমেও উঠলো তার কপাল।

"খুন হবার আগে শেষ কবে মিলির সাথে তোর দেখা হয়েছিলো?" একেবারে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন হায়দারভাই।

ইমতিয়াজ শফিকের কপালে হালকা ভাঁজ পড়লো এ সময়।

"ওর সাথে শেষ কবে তোর কথা হয়েছে?"

ঢোক গিললো খুনি। "অ-অনেকদিন আগে।"

"অনেকদিন বলতে কতোদিন?"

আবারো ঢোক গিললো ইমতিয়াজ। "এ-এক দেড়-বছর...বেশিও হতে পারে।"

হায়দারভাই কিছু বলার আগেই আমি পকেট থেকে একটা ছবি বের করলাম। মিনহাজের কাছ থেকে এটা আমি নিয়েছিলাম–গায়েহলুদ অনুষ্ঠানে তোলা একটি গ্রুপ ছবি।

সম্ভবত চোখের কোণ দিয়ে হায়দারভাই আমাকে ছবিটা বের করতে দেখেছিলেন, তিনি ইমতিয়াজের দিকে তাকিয়ে থেকেই হাত বাড়িয়ে ছবিটা নিয়ে নিলেন আমার হাত থেকে। মেঝেতে বসে থাকা ইমতিয়াজের চোখের সামনে মেলে ধরলেন ওটা।

"হুটহাট করে এভাবে মিথ্যে বললে আদালতের বিচারক বুঝে যাবেন তুই একটা পাক্কা বদমাশ। তোর উকিল তখন কিছুই করতে পারবে না। ফাঁসি ঠেকানো সম্ভব হবে না রে, হারামখোর।"

ইমতিয়াজের দৃষ্টিতে ভয় আর অবিশ্বাস মিলেমিশে একাকার। চোখ পিটপিট করে চেয়ে রইলো ছবিটার দিকে। হায়দারভায়ের প্রতিটি কথায় যেন চমকে উঠলো সে।

"তোকে পিটিয়ে কথা বের করার কোনো দরকারই নেই...ফাঁসিতে ঝোলানোর জন্য শক্ত প্রমাণ আছে আমাদের হাতে।"

gronthagaar.blogspot.com

বুঝতে পারলাম, হায়দারভাই চাইছেন ইমতিয়াজকে মানসিকভাবে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে।

"তুই অস্বীকার করলি নাকি স্বীকার করলি তাতে কিছুই যায় আসে না," কথাটা একটু হেসেই বললেন তিনি। "এটা নিয়ে আমরা মোটেও ভাবছি না। আমরা শুধু তোকে কিভাবে ধরা যায় সেটা নিয়ে টেনশনে ছিলাম।" হাফ ছাড়লেন এবার। "অবশেষে বহুকষ্টে তোকে ধরতে পেরেছি। এখন আর চিন্তা নেই।"

ইমতিয়াজের মধ্যে রাগ-ভয় আর উত্তেজনা দেখা দিলো। দম ফুরিয়ে যেন হাফাচ্ছে সে। হায়দারভাই তাকে আর কিছু না বলে চুপচাপ বসে রইলেন। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সামনে বসে থাকা খুনির দিকে। এভাবে কয়েক মিনিট চলে গেলো। আমি মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম সব। ইমতিয়াজ চেষ্টা করে গেলো তার এলোমেলো চিন্তাভাবনাগুলো গুছিয়ে নিতে। স্পষ্টতই সে বিপর্যস্ত।

"সব কিছু ভালোমতো স্বীকার করলে হয়তো বিচারক দয়া করে তোকে ফাঁসি না-ও দিতে পারে।"

ভালো করেই জানতাম হায়দারভায়ের কথাটা মোটেও সত্যি নয়। সিনেমায় এসব নাটকিয় ডায়লগ থাকে। প্রচুর মানুষ আছে যারা এমন কথায় বিশ্বাসও করে। তাদের ধারণা, খুনের কথা, অপরাধের কথা স্বীকার করলে শাস্তি কমে যায়। বাস্তবতা হলো, এতে একবিন্দুও শাস্তি কমে না। কমে শুধুমাত্র মামলা আর আদালতের মূল্যবান সময়।

"হত্যা-ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, তবে যাবজ্জীবনও দেয়া হয় অনেককে। ভাগ্য ভালো থাকলে তোর কপালে ফাঁসি না-ও জুটতে পারে।"

ইমতিয়াজ চোখমুখ কুচকে চেয়ে রইলো হায়দারভায়ের দিকে।

"ফাঁসিতে ঝুলে মরে যাওয়ার চেয়ে যাবজ্জীবন অনেক ভালো। অন্তত বেঁচে থাকা যায়।"

আমার দিকে তাকালো ইমতিয়াজ। আমি যে তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছি সেটা দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মুখটা সরিয়ে নিলো। কিন্তু ততোক্ষণে একটা জিনিস আমার চোখে পড়ে গেছে। সামনের দিকে ঝুঁকে ইমতিয়াজের বাম-কানের দিকে ভালো করে তাকালাম আমি। একটা পুরনো আঁচড়ের দাগ! শুধু কানের উপরেই নয়, কানের ঠিক পেছনেও আছে আরেকটা।

"ভাই, এটা দেখছেন?" আসামির বাম-কানটা দেখিয়ে বললাম।

gronthagaar.blogspot.com

হায়দারভাইও ঝুঁকে এলেন ইমতিয়াজের দিকে। ছেলেটা মুখ সরিয়ে নেবার চেষ্টা করতেই আমি তার চুল মুঠি করে ধরে ফেললাম শক্ত করে।

"এটা কেমনে হয়েছে, বল্?"

আমার প্রশ্নে কোনো জবাব দিলো না ইমতিয়াজ।

হায়দারভাই মুচকি হাসলেন। "আলামত আর সাক্ষি-প্রমাণ তো দেখছি বেড়েই চলছে।"

ইমতিয়াজকে ছেড়ে দিয়ে আবার আগের জায়গা চলে এলাম আমি। "ওর শরীরে নিশ্চয় আরো কিছু চিহ্ন আছে, হায়দারভাই।"

আমার কথায় মাথা নেড়ে সায় দিলেন তিনি। "অবশ্যই আছে। থাকারই কথা। মেয়েটার সাথে জবরদস্তি করার সময় হয়েছে।" একটু থেমে আবার বললেন, "মিলির হাতের নখ দেখেছিলে? বেশ বড় বড়। মেয়েটা নিশ্চয় বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। এই শূয়োরটার গায়ে অনেক খামচির দাগ থাকার কথা।"

"আমি কি ওর শার্টটটা খুলে দেখবো?"

"আস্তে, ব্রাদার," হাত তুলে আমাকে নিবৃত্ত করলেন তিনি। "আমাদের হাতে অনেক সময় আছে। আগে দেখি, ও নিজে থেকে কিছু বলে কি-না।"

"আমি কিচ্ছু বলবো না!" গর্জে ওঠার চেষ্টা করলো ইমতিয়াজ। "আমি কোনো খুন করিনি! কিচ্ছু করিনি।"

হায়দারভায়ের অভিব্যক্তিতে কোনো পরিবর্তন হলো না, নির্বিকারভাবে চেয়ে রইলেন তিনি।

"তাহলে এই দাগগুলো কিসের? কিভাবে হলো?" আমি রেগেমেগে বলে উঠলাম।

"আ-আমি যুদ্ধ করেছি..." একটু তোতলালো ইমতিয়াজ। "মি-মিলিটারির কাছে ধরা পড়েছিলাম...ও-ওরা টর্চার করেছে।"

বাঁকাহাসি ফুটে উঠলো এসএম হায়দারের ঠোঁটে। "এটা মিলিটারির মারের দাগ! ওরা বাঙালিদের ধরে ধরে খামচি দিতো?! শালা!" বলেই চোখমুখ তিক্ত করে ফেললেন তিনি। "তিন-চার বছরের পুরনো পাকিদের খামচির দাগ?!"

ইমতিয়াজ কোনো জবাব দিলো না।

"কোন্ সেক্টরে যুদ্ধ করেছিস, তুই?"

একটু ঢোক গিললো খুনি। "আ-আমি বিএলএফ-এ ছিলাম।"

সঙ্গে সঙ্গে হায়দারভায়ের চোখমুখ কুচকে গেলো। পায়ের উপর থেকে পা-টা নামিয়ে নিলেন তিনি। "তুই মুজিববাহিনীতে ছিলি?"

gronthagaar.blogspot.com

ইমতিয়াজ কিছু বললো না। তবে তার চোখমুখ দেখে আমার মনে হলো সে প্রাথমিক ধাক্কা আর বিপর্যস্ততা কাটিয়ে উঠতে শুরু করেছে।

"তোরা আবার যুদ্ধ করেছিস নাকি?! তোরা তো মুক্তিযোদ্ধাদের পেছনে লেগে থাকতি...যুদ্ধ করলি কবে? কয়টা পাকি মেরেছিস, অ্যা? কয়টা গুলি করেছিস ফ্রন্টিয়ারে গিয়ে? তোরা হলি সিক্সটিন্থ ডিভিশনের ফাইটার!" এতোক্ষণ ধরে নিজেকে শান্ত রেখেছিলেন হায়দারভাই, সেটা যেন নিমেষে ভেঙে পড়লো এবার।

"না, আমরা যুদ্ধ করিনি! তোরা যুদ্ধ করেছিস!" রাগে ফুসে উঠলো ইমিতিয়াজ। "শালার কোলাবরেটর! ভেবেছিস আমরা জানি না? ঢাকায় বসে বসে পাকিস্তানিদের ফয়ফরমাশ খেটেছিস নয়টা মাস! এখন বড় বড় কথা বলছিস্!"

ইমতিয়াজের কাছ থেকে এমন জবাব আমি কিংবা হায়দারভাই, কেউই আশা করিনি। নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলেন না এসএম হায়দার। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। আমাকে বললেন ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতে। আমি দ্বিধাগ্রস্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে ধমক দিয়ে উঠলেন।

"দরজা বন্ধ করতে বললাম না!"

দরজার দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় মনে মনে প্রমাদ গুনলাম আমি। ভালো করেই জানি ইমতিয়াজ কতো বড় ভুল করে ফেলেছে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এসএম হায়দারকে কটাক্ষ করা! তাকে কোলাবরেটর বলা! ইমতিয়াজ যদি জানতো এই মানুষটি কতো বড় মুক্তিযোদ্ধা তাহলে নিশ্চয় এমন ভুল করতো না।

Gronthagaar.blogspot.com

আমি যে-ই না দরজার ছিটকিনি লাগাবো অমনি পেছন থেকে শুনতে পেলাম তীব্র একটা আর্তনাদ। ঘুরে দেখি ততোক্ষণে কোমরের বেল্ট খুলে ফেলেছেন হায়দারভাই। ইমতিয়াজকে সেটা দিয়েই সমানে পেটাতে শুরু করেছেন।

"শূয়োরেরবাচ্চা! আমি কোলাবরেটর!? আমি ঢাকায় বসে বসে পাকিদের..." রাগে আর ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিলেন, দম ফুরিয়ে হাপাচ্ছেন তিনি। সপাং করে বেল্ট দিয়ে আরেকটা আঘাত করলেন।

"ওই! গায়ে হাত তুলবি না!" ইমতিয়াজ গর্জে উঠলো আবার। "খবরদার! একটারেও ছাড়বো না! ভালো হবে না কিন্তু!"

হায়দারভায়ের বেল্টের আঘাত থেকে বাঁচতে নিজেকে কোনোরকমে

gronthagaar.blogspot.com

সরিয়ে নিয়ে ঘরের এককোণে কুকড়ে থাকলো সে। তার হাতে-পিঠে-পায়ে বেল্টের আঘাত লাগছে।

"যুদ্ধ শুধু তোরা করেছিস, না? আর আমরা সব কোলাবরেটর!" আবারো আঘাত। বিশাল বদ্ধঘরে সেটা আরো বেশি জোড়ালো শোনালো।

আমি পেছন থেকে হায়দারভাইকে মৃদুস্বরে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেও তিনি আমার কথাগুলো শুনতেই পেলেন না। কী করবো বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে রইলাম কয়েক মুহূর্ত।

তৎকালীন আওয়ামী লীগ দলের অনেকেরই ভাবসাব এমন ছিলো, ভারতে আশ্রয় নেয়া এককোটির মতো শরণার্থি ছাড়া বাকিরা সবাই হয় কোলাবরেটর নয়তো সুবিধাবাদী ছিলো। এ নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে এক ধরণের ক্ষোভও ছিলো।

ইমতিয়াজের চিৎকারে প্রকম্পিত হলো ঘরটা। সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে হায়দারভাইকে জাপটে ধরে নিবৃত্ত করলাম। বেল্ট রেখে তিনি এবার পা ব্যবহার করতে শুরু করেছেন।

হায়দারভাইকে রুম থেকে বের করতে গিয়ে আমাকে ঘাম ঝরাতে হয়েছিলো সেদিন। বাইরে এসে তাকে শান্ত করতে একটা সিগারেট ধরিয়ে দেই। সেই সিগারেট কয়েক টানে শেষ করে আরেকটা চেয়ে বসেন। রাগে-ক্ষোভে গজ গজ করছিলেন। আমি তাকে না থামালে ইমতিয়াজকে মেরেই ফেলতেন হয়তো।

যাই হোক, অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে শান্ত করি তাকে। ইমতিয়াজকে জিজ্ঞাসাবাদ করার বাকি কাজটুকু আমি নিজের কাঁধে তুলে নেই। আমার সিগারেটের প্যাকেটটা হায়দারভায়ের হাতে ধরিয়ে দিয়ে ঢুকে পড়ি সেই ঘরে।

ইমতিয়াজের সারা শরীরে প্রহারের চিহ্ন। শেষের দিকে এসএম হায়দারের লাথি তার নাক-মুখের অবস্থাও কাহিল করে দিয়েছে। দু-হাত আর পিঠে বেল্টের দাগগুলো ডলে যাচ্ছে সে চোখমুখ খিচিয়ে।

পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে দিলে ইমতিয়াজ অবিশ্বাসে চেয়ে রইলো আমার দিকে, তারপর চুপচাপ রুমালটা নিয়ে নাক-মুখের রক্ত মুছতে লাগলো। ঘরের একমাত্র চেয়ারে বসে পড়লাম আমি।

"আমি ওই শালাকে ছাড়বো না," ইমতিয়াজ বলে উঠলো। "ও জাসদ করে, আমি শিওর। ওর কথা শুনেই বোঝা যায়। আমার গায়ে হাত তুলেছে...কতো বড় সাহস!"

gronthagaar.blogspot.com

"চুপ!" আমি রেগে গিয়ে বলে উঠলাম। আমার ধমক খেয়ে ফ্যালফ্যাল চোখে চেয়ে রইলো সে। "একদম চুপ! একটা মেয়েকে বিয়ের মাত্র তিনমাসের মাথায় রেপ করে মার্ডার করেছিস...এখন আবার বড় গলায় কথা বলছিস!" আমার চোখেমুখে তিক্ততায় ভরে উঠলো। "ভেবেছিস সব অস্বীকার করলেই বেঁচে যাবি?" মাথা দোলালাম আমি। "কক্ষনো না! এসএম হায়দার তোকে ফাঁসিতে ঝোলানোর আগপর্যন্ত থামবে না।"

"আমি কিচ্ছু করিনি! আমি কিচ্ছু জানি না। আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে ওই শালার পুলিশ!" ইমতিয়াজ চেঁচিয়ে উঠলো।

তাকে আমার আস্ত একটা শয়তান বলে মনে হচ্ছিলো তখন। "তুই এখন পর্যন্ত একটাও সত্যি কথা বলিসনি। সব মিথ্যে বলেছিস। তাতে কোনো সমস্যা হবে না। যে প্রমাণ আমাদের হাতে–"

"আরে রাখ্ তোর প্রমাণ!" এবার চোখমুখ খিচে বললো সে। "আমার বালটাও ছিঁড়তে পারবি না তোরা!"

আমি স্থিরচোখে চেয়ে রইলাম মিলির খুনির দিকে।

"একবার খালি আমার নেতা জানুক, তারপর দেখবি কি হয়। তোদের সবাইকে আমি ভুরুঙ্গামারিতে পাঠামু!"

শেষ কথাটা আঙুল উঁচিয়ে বললো ইমতিয়াজ। স্বাধীনতার পর থেকেই পুলিশকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বদলির হুমকি দিয়ে কাবু করার রেওয়াজ চালু হয়ে গেছিলো। আর হুমকিটা শুধু বড় বড় নেতারাই নয়, ইমতিয়াজের মতো পাতিরাও দিতে কসুর করতো না। পরবর্তিতে ভুরুঙ্গামারির জায়গায় বান্দরবান-খাগড়াছড়ি ব্যবহৃত হতে শুরু করেছিলো, এই যা।

আমার ইচ্ছে করছিলো হায়দারভায়ের মতো বেল্ট খুলে হারামজাদাকে পেটাই, কিন্তু এ কাজ আমি জীবনেও করিনি। পুলিশে যোগ দেবার পরও না। এরকম আগ্রাসি আচরণের কথা আমি শুধু ভাবতেই পারি, কিন্তু সত্যি সত্যি কোনো মানুষকে পেটানো যে আমার পক্ষে সম্ভব নয় সেটা বহুকাল আগেই বুঝে গেছিলাম। সম্ভবত এ কারণেই উপযুক্ত বয়স থাকার পরও, মনে প্রবল ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে পারিনি। কারণ যুদ্ধে মানুষ হত্যা করতে হয়!

ইমতিয়াজের আচরণে রাগে আমার গা রি রি করে উঠলো। আমি কিছু বলতে যাবো অমনি ঘরে ঢুকে পড়লেন হায়দারভাই। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। সম্ভবত বাইরে থেকে ইমতিয়াজের তর্জন-গর্জন উনার কানে গেছে। মিলির খুনিও একটু ভড়কে গিয়ে চুপ মেরে গেলো হঠাৎ করে। কিন্তু এসএম

Gronthogaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

হায়দারের মধ্যে কোনো উত্তেজনা দেখতে পেলাম না। তাকে খুব শান্ত আর স্বাভাবিক মনে হলো আমার কাছে।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালে তিনি আমাকে বসার জন্য ইশারা করলেন। "বসো।" তারপর আমার পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু স্বীকার করেছে?"

"না," আস্তে করে বললাম তাকে।

কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে হায়দারভাই বলে উঠলেন, "মনে হচ্ছে বিরাট বড় একটা ভুল করে ফেলেছি আমরা।"

আমি তার কথার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে না পেরে চেয়ে রইলাম। "ভুল করেছি? কি?"

"এই ছেলেটা মনে হয় না একা একা মিলিকে ধর্ষণ করে খুন করেছে।"

আমি যেন আক্ষরিক অর্থেই আকাশ থেকে পড়লাম। "কি?!" এরইমধ্যে কি খুনির নেতা থানায় ফোন করে ফেলেছে? আর সেই ফোন পেয়ে মুক্তিযোদ্ধা এসএম হায়দার বেড়ালের মতো চুপসে গেছেন? মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগলো কথাগুলো।

"আহ্, ওকে ভালো করে দেখো।" ইমতিয়াজকে ইঙ্গিত করে বললেন তিনি।

আমি কোনো কিছু বুঝতে না পেরে তাকালাম মেঝেতে বসে থাকা খুনির দিকে।

"ওর মতো রোগাপটকা আর পাঁচফুটি সাইজের একটা ছেলের পক্ষে মিলির মতো মেয়েকে ধর্ষণ করা সম্ভব না।"

"আপনি এসব কী বলছেন?" কথাটা আমার মুখ দিয়ে বের হয়ে গেলো।

"ভেবে দেখো, আমাদের ভিক্টিমের হাইট কতো...পাঁচফিট পাঁচ। মেয়ে হিসেবে বেশ ভালো উচ্চতা। আর এটাকে দেখো, পাঁচফুট তিন-চারের বেশি হবে না। তার উপরে শরীরে কিছু নেই...রোগাপটকা। দেখলেই মনে হয় দিনে তিনবার গাঞ্জা খায়। এর পক্ষে কি একা একা মিলিকে ধর্ষণ করে খুন করা সম্ভব?"

"আপনি বলতে চাইছেন...?"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন এসএম হায়দার। "কাজটা ও একা করেনি।"

"কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন, একজন মেহমান–"

হাত তুলে আমার কথার মাঝখানে বাধা দিলেন তিনি। "ভুলটা তো সেখানেই করেছি।" এবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "গোড়ায় গলদ হয়ে

gronthagaar.blogspot.com

গেছে। তখন তো এই হারামজাদাকে সামনাসামনি দেখিনি। ছবি দেখে কি বোঝা যায়? এখন আমি নিশ্চিত, ওর পক্ষে মিলিকে ধর্ষণ করে খুন করা সম্ভবই না।”

সত্যি বলতে আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম কথাটা শুনে। আরো একবার ইমতিয়াজের দিকে ভালো করে তাকালাম। রাগে-অপমানে সে কাঁপছে। কথাগুলো হজম করতে বেগ পাচ্ছে যেন।

“তাছাড়া, ময়নাতদন্তের রিপোর্টের কথাটা ভাবো,” হায়দারভাই আমার কাঁধে হাত রাখলেন। “ভিক্টিমের ভ্যাজাইনার যে কন্ডিশন হয়েছিলো সেটা এর পক্ষে করা কি সম্ভব?”

আমার মুখের জবান বন্ধ হয়ে গেলো। ফ্যালফ্যাল করে হায়দারভায়ের দিকে চেয়ে রইলাম।

“এই বগা-টাইপের ছেলেটার ওই জিনিস আর কতো বড় হবে, অ্যা?” তর্জনি আর বুড়ো আঙুল দিয়ে আকৃতিটা দেখালেন তিনি, “দাঁড়ালেও তিন ইঞ্চির বেশি হবে না। এরকম সাইজ দিয়ে কি ওটা করা যাবে?” মাথা দোলালেন এসএম হায়দার। “অসম্ভব!”

ঢোক গিললাম আমি, “তাহলে ওর সাথে আরেকজন ছিলো? সে কে?”

“সেটাই এখন বের করতে হবে। এই শালা অবশ্যই ছিলো কিন্তু কাজটা করেছে ওর সঙ্গে থাকা বলশালী আর তাকত আছে এমন কেউ। এই শালা হলো পাহারাদার। ছাগলের তিন নাম্বার বাচ্চা। বুঝলে? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখেছে। খচ্চরটার জন্মই হয়েছে পাহারা দেবার জন্য। কাজ করার মুরোদ ওর নেই।”

আমার মাথায় ঢুকলো না হায়দারভাই হঠাৎ করে এসব কেন বলছেন! কিন্তু রোগাপটকা, ছোটোখাটো ইমিতিয়াজকে আমার সামনে বসে থাকতে দেখে মনে হলো, হায়দারভায়ের কথাটা উড়িয়ে দেয়াও যায় না। তার কথা শোনার পর আমারও মনে হলো, এই ছেলের পক্ষে মিলির মতো মেয়েকে ধর্ষণ করে খুন করাটা আসলেই কঠিন।

হায়দারভাই এগিয়ে গেলেন ইমতিয়াজের দিকে। ওর একটা হাত ধরে বললেন, “দেখো, মেয়েমানুষের মতো নরম হাত...আমাদের সামনে নার্ভাস হয়ে কেমন কাঁপছে...ও তো মিলির সামনে গিয়ে দাঁড়ানোরই সাহস রাখতো না। এই টাইপের ছেলেগুলো মেয়েদের সাথে জোর-জবরদস্তি করার হিম্মত রাখে না, ব্রাদার। আমি নিশ্চিত, ওর সাথে আরেকজন ছিলো।” এবার ইমতিয়াজের দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি, “বল্, কে ছিলো তোর সাথে?”

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

ইমতিয়াজ নিজের হাতটা ঝাড়া মেরে ছাড়িয়ে নিলো এসএম হায়দারের কাছ থেকে। "কেউ ছিলো না! আমি একাই খুন করেছি! আর আমার ওটা দেখতে চাস্?" কেমনজানি উন্মাদগ্রস্ত হয়ে পড়লো সে। প্যান্টের জিপার খুলে গোপনাঙ্গটা বের করে বিশ্রিভাবে দেখালো আমাদের। "দেখ্ শূয়োরেরবাচ্চা! তিন ইঞ্চির নুনু নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াই না! তোদের চেয়েও বড় আছে! এটা দিয়ে ওই মেয়ের জন্মের সাধ মিটিয়ে দিয়েছি! ফাটায়া দিছি শালিরে!"

কথাটা শুনে আমার গায়ের পশম দাঁড়িয়ে গেলো। চট করে তাকালাম এসএম হায়দারের দিকে, উনার ঠোঁটে তখন প্রচ্ছন্ন বাঁকাহাসি। সঙ্গে সঙ্গে উনার কৌশলটা ধরতে পারলাম, বুঝতে পারলাম মিলির খুনির স্বীকারোক্তি পেয়ে গেছি আমরা!

Gronthagaar.blogspot.com

অধ্যায় ১৬

"আরেক কাপ চা খাবে?"

রামজিয়ার দিকে তাকিয়ে মাথা দোলালাম। এতোদিন পর দেখা হতেই সোজা তার বাসায় চলে এসেছি। নিরিবিলি বাসায় বসে আড্ডা দিচ্ছি অথচ ব্যাপারটাকে মোটেও অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না। বয়স শুধু আক্ষেপই বাড়ায় না, এরকম কিছু সুবিধাও নিয়ে আসে। মাঝবয়সি দু-জন নারী-পুরুষ বিরাণ বাড়িতে বসে গল্প করলে কেউ কিছু মনে করে না। এটা যেন প্রাকৃতিকভাবেই স্বাভাবিক আর নিরাপদ একটি ব্যাপার!

"না, আজ উঠি," বললাম তাকে। "তুমি ওটা পড়া শেষ করে আমাকে জানিও।"

"খুব তাড়া আছে নাকি?"

"ঘরে ফিরে একটু বিশ্রাম নেবো। লিখতেও পারি...ইচ্ছে করলে।"

"এখন কি লিখছো? নতুন কোনো উপন্যাস?"

"নতুন কিছু না। পুরনো একটা উপন্যাসের নতুন সংস্করণ হবে, ওটার কিছু অংশ নতুন করে লিখবো।"

"ও," কপালে ভুরু তুলে সে বললো। "এ কাজ প্রায়ই করো মনে হয়?"

"হুম। পুরনো লেখাগুলো দেখলে নতুন করে আবার কিছু অংশ লিখতে ইচ্ছে করে। মনে হয় অনেক কিছু বাদ দিয়েছি, যেভাবে চেয়েছি সেভাবে লিখতে পারিনি।"

আমার দিকে স্থিরচোখে চেয়ে রইলো। "জীবনটা যদি এভাবে রি-রাইট করা যেতো!"

মুচকি হাসলাম আমি। "জীবনটা রি-রাইট করা যায় না দেখেই তো গল্পগুলো বার বার রি-রাইট করি।"

মনে হলো রামজিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো আস্তে করে।

"মিনহাজ কোথায় থাকে, জানো?" কাজের কথায় চলে এলাম আমি।

মাথা দোলালো সে। "না। তবে তার ঠিকানা জোগাড় করে দিতে পারবো। ওর ঘনিষ্ঠ কিছু লোকজনকে আমি চিনি। শুনেছি, কয়েকদিন আগে নাকি রিটায়ার করেছে। বিয়ে-টিয়ে আর করেনি।"

gronthagaar.blogspot.com

কথাটা শুনে অবাক হলাম। আমার ধারণা ছিলো সে পুণরায় বিয়ে করেছে। বয়স কম ছিলো ওর। মাত্র তিনমাসের সংসার। ধরেই নিয়েছিলাম মিলির শোক কেটে যাবে বছর না ঘুরতেই, তারপর হয়তো আবার বিয়ে করে সংসারি হবে।

"অবাক হলে নাকি?"

"হুম।"

"অবাক হওয়ার কি আছে," আস্তে করে বললো সে, "তুমিও তো একই কাজ করেছো।"

মুচকি হাসলাম আমি। এ প্রসঙ্গটা উঠলে কখনওই স্বস্তি বোধ করি না। রামজিয়ার সঙ্গে তো আরো বেশি অস্বস্তি লাগলো। "আমি কখনও সংসার করিনি, কিন্তু মিনহাজ করেছে...অল্পদিনের হলেও করেছে। একজন লেখক বলেছিলেন, যারা একবার দ্বৈত জীবন-যাপন করে ফেলে আর সেই জীবনে সুখি থাকে, তাদের পক্ষে খুব বেশিদিন একা থাকা সম্ভব হয় না। ভালোবাসা যতোই গাঢ় থাকুক, স্বামি কিংবা স্ত্রী বিয়োগ হলে তারা দ্রুত একাকীত্ব ঘোচাতে চায়।" একটু থেমে আবার বললাম, "আমার মনে হয়েছিলো মিনহাজ আবার বিয়ে করে সংসারি হয়েছে।"

"আমারও সে-রকম ধারণা ছিলো, কিন্তু কয়েক বছর আগে আমেরিকাতে ওর এক আত্মীয়ের সাথে দেখা হয়েছিলো, তখনই জানলাম ও আর বিয়ে করেনি।"

"আত্মীয়-স্বজনদের সাথে একদমই যোগাযোগ রাখে না?"

"খুব একটা রাখে না। একা থাকতেই বেশি পছন্দ করে। পরিচিতরাও ওকে বিরক্ত করে না। এরকমটিই শুনেছি।" একটু থেমে আবার বললো, "আচ্ছা, তুমিও তো গ্রামে চলে গেছিলে, তাহলে ঢাকায় আবার ফিরে এলে যে?"

"আসতে বাধ্য হয়েছি।"

"কেন? ওখানে থেকে কি লেখালেখি করা যেতো না?"

"ঠিক তা নয়। আমার প্রথম তিনটা বই গ্রামে থাকতেই পাবলিশ হয়েছে। কিন্তু সমস্যা হয়েছিলো অন্য জায়গায়।"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো সে।

"গ্রামের বাড়িতে কয়েকটা বছর ভালোই ছিলাম। ভিলেজ পলিটিক্সের ব্যাপারটা আমি জানতাম, তাই ওসবের ধারেকাছেও যাইনি। স্কুলে পড়াতাম,

gronthagaar.blogspot.com

লেখালেখি করতাম, বই পড়তাম, টুকটাক মাছ চাষও শুরু করেছিলাম," বলেই বিব্রতকর হাসি দিলাম আমি। "সমস্যা বাধলো একটা পাঠাগার করতে গিয়ে।"

"লাইব্রেরি করতে গিয়ে সমস্যা হলো?" বিস্ময়ে বলে উঠলো রামজিয়া। "স্ট্রেইঞ্জ।"

"শহীদস্মৃতি পাঠাগার নাম দিয়েছিলাম...ব্যস, শুরু হয়ে গেলো ঝামেলা। স্থানীয় এমপি চাইলেন তারা মরহুম বাবার নামে নাম করা হোক ওটা, আমি কোনভাবেই রাজি হলাম না।"

"কেন?"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। "এমপির বাবা একাত্তরে রাজাকার ছিলো।"

"ও," আস্তে করে বললো রামজিয়া।

"ভিলেজ পলিটিক্স কতোটা নোংরা হতে পারে তোমার ধারণা নেই। এমপির মতো ক্ষমতাবান লোক আমার পেছনে লেগে গেলো। এদিকে ততোদিনে আমার দু-তিনটা বই বেরিয়ে গেছে, রেসপন্সও ভালো পাচ্ছিলাম। প্রকাশক চাইছিলো আমি নিয়মিত লিখি, ঢাকায় থাকি। তাই আবারো গ্রাম ছেড়ে চলে এলাম। প্রথমে একটা পত্রিকায় কিছুদিন কাজ করেছি, পরে আর চাকরিটা কন্টিনিউ করিনি, পুরোদমে লেখক হয়ে যাই।"

"ভালোই করেছো। তোমাকে লেখক হিসেবেই বেশি মানায়।"

কথাটা শোনামাত্রই দুই যুগ আগের একজন মানুষের একটি কথা মনে পড়ে গেলো। হায়দারভাই-ই প্রথম আমাকে বলেছিলেন। আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে। একদিন দু-জনে বসে সিগারেট খাচ্ছি, একটা কেস নিয়ে কথা বলছি, এমন সময় হুট করেই তিনি বলে উঠলেন, পুলিশ হিসেবে নাকি আমাকে ঠিক মানায় না। আমিও পাল্টা জানতে চাইলাম, তাহলে কি হিসেবে মানায়। উনি কোনোরকম সময়ক্ষেপন না করেই বলে দিলেন, আমাকে লেখক হিসেবে বেশি মানায়। কথাটা শুনে খুব অবাক হয়েছিলাম। সত্যি বলতে, বই পড়ার নেশা ছোটোবেলা থেকেই, কিন্তু লেখক হবার কথা কখনও মাথায় আসেনি। অন্তত হায়দারভাই বলার আগপর্যন্ত তো নয়-ই। স্বীকার করতেই হয়, কথাটা শোনার পর থেকে আমার মনের গহীনে লেখক হবার সুপ্ত বাসনা জন্মেছিলো।

"কি হলো, ভুল কিছু বললাম নাকি?"

রামজিয়ার কথায় সম্বিত ফিরে পেলাম। "না। মানে, মিনহাজের

gronthagaar.blogspot.com

ঠিকানাটা জোগাড় করে দিলে ভালো হয়।" আমি প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে ফেললাম।

"এ নিয়ে চিন্তা কোরো না। দুয়েকদিনের মধ্যেই জোগাড় করে দিতে পারবো।"

"থ্যাঙ্কস।"

"আচ্ছা, একটা কথা আমাকে বলবে?"

"কি?"

"মিনহাজের সাথে কি কেসটা রি-ওপেন করার জন্য দেখা করতে চাইছো নাকি আরো কিছু আছে?"

"তা আছে," বললাম আমি। "মিলির খুনাটা নিয়ে বই লিখেছি, মিনহাজের জানার অধিকার আছে না, কি লিখেছি?"

আল্‌তো করে মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। "আই মিন, ওর কোনো অবজেকশান আছে কি-না জেনে নিতে চাইছো?"

"হুম।"

"ধরো, ও যদি কোনো কারণে আপত্তি জানায়?"

আমি এটা আগে থেকেই ভেবে দেখেছি। কাঁধ তুলে বললাম, "তাহলে আর কি, আসল নামগুলো পাল্টে শুধু কাহিনীটা ঠিক রাখবো। তাতে মনে হয় না কারোর আপত্তি থাকবে। আইনগতও বাধা থাকবে না তখন।"

"ধরো, মিনহাজ তোমাকে এ বইটা পাবলিশ না করার জন্য অনুরোধ করলো, তখন কি করবে?"

একটু চিন্তায় পড়ে গেলাম। এমন অনুরোধ আমার পক্ষে রাখা সম্ভব হবে না। কারণ আমি চাই মিলির গল্পটা সবাই জানুক। তার প্রতি যে নির্মম আচরণ করা হয়েছে সেটার কোনো বিচার হয়নি। অন্তত তার কাহিনীটা লোকে জানুক। একটা গল্পের মধ্যে সে বেঁচে থাকুক। পুরোপুরি বিস্মৃতির অতল গহ্বরে তলিয়ে না গিয়ে পাঠকের কোমল হৃদয়ে তার একটু ঠাঁই হোক।

"মিনহাজ যদি এমন অনুরোধ করে তাহলে বোধহয় আমি সেটা রাখতে পারবো না। ঐ যে বললাম, নামগুলো শুধু বদলে দেবো।"

"আমার নামও?" কৌতুহলভরে জানতে চাইলো রামজিয়া শেহরিন।

"যদি তোমার আপত্তি না থাকে তাহলে বদলাবো না।"

"আমার কোনো অবজেকশ নেই। ইউ মাস্ট ফিল ফ্রি টু ইউজ মাই নেম।"

gronthagaar.blogspot.com

হেসে ফেললাম আমি। "আগে লেখাটা পুরোপুরি পড়ো, তারপর সিদ্ধান্ত নিও। বলা তো যায় না, পুরোটা পড়ার পর মত বদলেও ফেলতে পারো।"

"তাই নাকি?" কৃত্রিম অবাক হবার ভান করলো সে। "ওরকম কিছু থাকতে পারে?"

কাঁধ তুললাম। "থাকতেই পারে।"

হা-হা করে হেসে উঠলো রামজিয়া। তার সঙ্গে যোগ দিলাম আমিও। একটু বিরতি দিয়ে আবার বললাম, "মিনহাজ কেন ঢাকা ছেড়ে চলে গেলো; মিলির ঘটনাটা এখন সে কিভাবে দেখে; ঐ ঘটনাটা তাকে কিভাবে বদলে দিলো; খুনির যে বিচার হলো না, এটা তাকে এখনও কতোটা যন্ত্রণা দেয়। মাত্র তিনমাসের সম্পর্কটাকে সে এখনও কিভাবে লালন করে, এসব জানার খুব ইচ্ছে আমার। ঠিক করেছি, বইটা শেষ করবো মিনহাজকে দিয়ে।"

আলতো করে মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। "যখন শুনলাম তোমরা ইমতিয়াজকে ধরেছো তখন কী যে ভালো লেগেছিলো আমার! ঐ দিনের কথা এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে।"

একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এলো আমার ভেতর থেকে। দুই যুগ আগের দগদগে ঘায়ের মতো এখনও উপশম না-হওয়া স্মৃতিগুলো ভেসে উঠলো মনের পর্দায়। ইমতিয়াজের কাছ থেকে সুকৌশলে খুনের কথা স্বীকার করিয়ে নেবার পর হায়দারভাই কতোটা খুশি হয়েছিলেন সেটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। তাকে যারা চেনে তারা ভালো করেই জানে, এসএম হায়দার সমস্ত খুশি একভাবেই উদযাপন করতেন!

Gronthagar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

অধ্যায় ১৭

উদযাপন আর উপহার

"আমি তোমাকে বলেছিলাম না," তর্জনি উঁচিয়ে আমার মুখের খুব কাছে নিজের মুখ এনে বললেন হায়দারভাই, "ওই শালারে আমি ধরবোই!" তারপরই একটা ঢেকুর তুললেন তিনি।

সন্ধ্যার পর আমরা দু-জন থানা থেকে বের হয়ে চলে এসেছি কলাবাগান মাঠের এককোণে। হায়দারভাই এখানে আসার আগেই যা খাওয়ার খেয়ে নিয়েছেন। এখন একের পর এক সিগারেট ধ্বংস করে যাচ্ছেন। এ কাজে অবশ্য আমি ভালো সঙ্গই দিচ্ছি তাকে।

মদের কটু গন্ধের কারনে আমি আমার মুখটা সরিয়ে ফেললাম। "কী সব খান...এতো বাজে গন্ধ!" সত্যি বলতে মদের গন্ধ আমার কাছে বিশ্রি মনে হতো। এই জিনিস মানুষ কী করে খায় মাথায় ঢুকতো না। তখনও আমি জানতাম না, আর ক-দিন পর গোগ্রাসে গিলবো এ জিনিস।

"ধুর মিয়া!" হাত নাড়িয়ে বলে উঠলেন তিনি, "এখনও পোলাপানের মতো কথা বলো। এই জিনিস না খেলে পুরুষ মানুষ হওয়া যায় নাকি!"

মাথা দোলালাম আমি। "আমার ওসব হওয়া লাগবে না। এখন বলেন, পুরো বোতল সাফ করে দিয়েছেন নাকি? আপনার অবস্থা তো সুবিধার মনে হচ্ছে না।"

"আহ্!" একটু চটে গেলেন। "মদ আমাকে গিলতে পারে না, ব্রাদার...আমি ওরে গিলি!" এবার লম্বা করে সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন।

"আপনার কি আজ বাড়িতে যাবার ইচ্ছে নেই? ভাবি তো মনে হয় লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে ফেলবে।"

হা-হা-হা করে হেসে ফেললেন তিনি। "ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ বাপের বাড়ি চলে গেছে...নো চিন্তা, ব্রাদার!"

"আবার ঝগড়া করেছেন?"

"আহ্!" বিরক্ত হলেন যেন। "আবিয়াত্তা পোলাপান, কিস্‌সু বোঝো না। ঝগড়া না-হলে কি মেয়েমানুষ বাপের বাড়ি যাবে না?"

gronthagaar.blogspot.com

আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম।

"নাইওর গেছে," বলেই একটা চোখ টিপে দিলেন।

আমি অনেকটা হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। "তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে বউ বাপের বাড়ি চলে যাওয়ায় খুব খুশি?"

মাথা দোলালেন এসএম হায়দার। "এটা খুশি-অখুশির ব্যাপার না। মেয়েরা মাঝেমধ্যে বাপের বাড়ি যাবেই...হাজব্যান্ডদের এটা মেনে নিতে হয়, বুঝলে?"

"আমি সেটার কথা বলছি না, আপনাকে মনে হচ্ছে খুব খুশি। বউকে তো মনে হয় মিস্ করেন না?"

বাঁকাহাসি দিলেন তিনি। "কী করি না করি সেটা জানে আমার মন। বাইরেরটা দেখে বুঝবে না, ব্রাদার।"

আমি প্রসঙ্গ বদলে ফেলতে চাইলাম। "আপনার যা অবস্থা, কাল সকালে কোর্টে যেতে পারবেন তো? ওই হারামজাদার জামিন কিন্তু ঠেকাতে হবে।"

"ওটা নিয়ে ভাববে না, আমি ঠিক সময়েই চলে যাবো।"

"শুধু ঠিক সময়ে গেলেই তো হবে না, আপনাকেও ঠিক থাকতে হবে।"

"আমি ঠিক থাকবো, চিন্তা কোরো না।"

"ঠিক থাকলেই ভালো।" কথাটা বলেই সিগারেটের দিকে নজর দিলাম।

"এই কেসে কিন্তু তোমার কন্ট্রিবিউশন অনেক," নতুন আরেকটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন এসএম হায়দার। "তুমি না থাকলে কেসটার যে কী অবস্থা হতো!"

আমি বিনয়ী হবার চেষ্টা করলাম। "কী যে বলেন, আপনার সাথে থেকে থেকেই তো একটু-আধটু শিখেছি।"

মুচকি হাসলেন তিনি। "ভালোই শিখছো। তোমার মাথাটা খুব ভালো, আমার মতো গরম না।"

কথাটা অবশ্য সত্যি। ছোটোবেলা থেকেই আমি শান্তশিষ্ট।

"চলো, পুরান ঢাকায় যাই। আজ কমপক্ষে দুইটা হাজি মারতে হবে।"

"কি?" বুঝতে না পেরে বলে উঠলাম। "দু-জন হাজি মারবেন?"

"হাজিসাব না, হাজির বিরিয়ানি।" বলেই হেসে ফেললেন।

"এতো রাতে কি পাওয়া যাবে? শুনেছি, সন্ধ্যার পরই শেষ হয়ে যায়।"

"আরে, কী আর রাত হয়েছে...চলো তো।"

হায়দারভাই আমাকে টেনে দাঁড় করালেন। আমিও তাকে বাধা দিলাম

gronthagaar.blogspot.com

না। হাজির বিরিয়ানি আগেও দুয়েকবার খেয়েছি, এর দুর্নিবার আকর্ষণ থেকে মুক্ত রাখতে পারলাম না নিজেকে, হাজার হলেও, উদযাপন করার মতো একটা ঘটনা তো ঘটেছেই!

*

পরদিন কোর্টে একটু দেরি করে হাজির হলেও হায়দারভাইকে দেখে মনে হলো না তিনি গতরাতে পুরোপুরি মাতাল ছিলেন, বরং তাকে একটু বেশিই ফ্রেশ মনে হলো আমার কাছে। বেশ ফুরফুরে মেজাজে ছিলেন। আমি অবশ্য আশঙ্কা করছিলাম, ইমতিয়াজের জামিন হয়ে যেতে পারে ভেবে। সে যে রাজনীতি করে সেটা আমরা জানি। সেই প্রভাব খাটিয়ে জামিন করার চেষ্টা করতেই পারে।

কিন্তু ইমতিয়াজের হয়ে যে উকিল জামিনের আবেদন করেছিলো তাকে দেখেই হায়দারভাই আমাকে নীচুস্বরে বলেছিলেন, "এইসব পাঁচানি কেসের উকিল কি জীবনে কখনও খুনের মামলায় জামিনের জন্য কোর্টে দাঁড়িয়েছে?"

তার ঠোঁটের বাঁকাহাসি দেখে বুঝেছিলাম আসামিপক্ষের উকিল সম্পর্কে তিনি মোটেও ভালো ধারণা পোষণ করেন না। তারচেয়েও বড় কথা, আসামির জামিন না হবার ব্যাপারে তিনি প্রায় নিশ্চিত ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তা-ই হলো। আদালত তার জামিন আবেদন প্রত্যাখ্যান করে জেলহাজতে পাঠিয়ে দেন।

কোর্ট থেকে বের হয়ে হায়দারভাই আর আমি সোজা ঢুকে পড়লাম রাস্তার ওপাড়ে প্রসিদ্ধ দিল্লী মুসলিম নামের একটি রেস্তোরাঁয়। দুপুরের খাবার ওখানেই খেয়ে নিলাম। মামলাটার পরবর্তি কার্যক্রম কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবো সেটা নিয়েও অল্পবিস্তর আলাপ করলাম। হায়দারভাই বললেন, মিলির স্বামি মিনহাজকে খবরটা দেয়া দরকার। আমি যেন আজ বিকেলের পর ওর সাথে দেখা করি।

বিকেলের দিকে, ব্যাঙ্ক ছুটি হবার একটু আগে আমি মিনহাজের সাথে দেখা করি ওর অফিসে। আমার কাছ থেকে খবরটা শুনতে পেয়ে মিনহাজের চোখ দিয়ে টপটপ করে অশ্রু ঝরতে শুরু করলো। বিব্রত হয়ে আমি কী করবো বুঝতে পারলাম না। এক পর্যায়ে সে আমার হাতদুটো ধরে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলো।

"আপনি আর আপনার ঐ সিনিয়র অফিসারের কাছে আমি আজীবন

gronthagaar.blogspot.com

কৃতজ্ঞ থাকবো, ভাই," চোখ মুছতে মুছতে বলেছিলো সে। "আপনাদের ঋণ আমি কোনোদিনও শোধ করতে পারবো না।"

"এটা ঋণ হতে যাবে কেন, মিনহাজসাহেব?" আমি বিনয় দেখিয়ে বললাম। "এটা তো আমাদের দায়িত্ব।"

কয়েক মুহূর্ত নিজেকে স্বাভাবিক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো মিলির স্বামি। "আচ্ছা, এখন মামলা শেষ হতে কতোদিন লাগতে পারে?"

আমি একটু কাচুমাচু খেলাম। এ দেশের আদালতের দীর্ঘসূত্রিতা বহু পুরনো একটি ঐতিহ্য। বছরের পর বছর পার হয়ে গেলেও মামলা শেষ হয় না। এইসব রুঢ় বাস্তবতা কাউকেই স্বস্তি দেবে না, আর আমিও চাইছিলাম না এমন মুহূর্তে মিনহাজকে অপ্রিয় সত্যিটা জানাতে।

"মনে হয় বছরখানেকের বেশি লাগবে না।" সত্যি বলতে, নিজের কাছেই কথাটা অসাড় বলে মনে হলো।

হালকা ভাঁজ পড়লো মিনহাজের কপালে। "তাই নাকি?" ঢোক গিলে বললো সে, "আমি তো শুনেছি, বছরের পর বছর পার হয়ে যায়, অনেক সময় লাগে?"

"সেটা দেওয়ানি মামলা-মোকদ্দমায়। ফৌজদারি মামলা একটু দ্রুতই শেষ হয়," আবারো প্রবোধ দেবার চেষ্টা করলাম।

"দেওয়ানি-ফৌজদারি মানে?"

সাধারণ জনগণের মতো মিনহাজও এটা জানতো না। জীবনে যে ব্যক্তি আদালতে পা রাখেনি, যার পরিবারের কেউ মামলা-মোকদ্দমায় জড়িত ছিলো না তার পক্ষে এইসব আইনী প্রভেদ বোঝা সম্ভব নয়।

"জমি-জমা, সম্পত্তি নিয়ে যে মামলা হয় সেটা দেওয়ানি," মিনহাজকে বললাম। "আর খুন-রাহাজানি, চুরি-ডাকাতি, ওগুলো ফৌজদারি," ইচ্ছে করেই ধর্ষণের কথাটা উল্লেখ করলাম না।

"ও," মাথা নেড়ে সায় দিলো সে, তারপর অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলো। "খেয়াল রাখবেন, ঐ হারামজাদার যেন ফাঁসি না-হয়।"

আমি দ্বিতীয়বারের মতো অবাক হয়েছিলাম মিনহাজের কাছ থেকে এমন কথা শুনে।

"আমি চাই শূয়োরেরবাচ্চাটা জেলে পচে মরুক। আস্তে আস্তে...ধীরে ধীরে!"

আমি তার মনোভাবটা বুঝতে পেরে চুপ থাকলাম।

"সারাটা জীবন জেলে কাটাক। জীবনে যেন জেলের বাইরে পা রাখতে

gronthagaar.blogspot.com

না পারে। মরে যাবার পর ওর লাশ জেলে বাইরে নেয়া হবে, তার আগে নয়।"

এ সময় নম্র-ভদ্র মিনহাজের চেহারাটা কেমন উন্মাদগ্রস্ত বলে মনে হলো আমার কাছে, তবে সেটা একেবারেই অল্প সময়ের জন্য। পরক্ষনেই নিজেকে ফিরে পেলো সে। "এখন মিলির কবরের সামনে গিয়ে আর কাঁদবো না। ওকে বলবো, ওর খুনি ধরা পড়েছে...ওর শাস্তি হবে।"

আমি জানি মিনহাজ প্রায় প্রতিদিন ওর স্ত্রীর কবরের সামনে গিয়ে কিছুটা সময় কাটিয়ে আসে। এরকম ভালোবাসা, এমন প্রেম আমি গল্প-উপন্যাসেও পড়িনি। সত্যি বলতে, মিনহাজের প্রতি আমার যে পক্ষপাতিত্ব তার অনেকগুলো কারণের মধ্যে এটাও অন্যতম।

*

মিনহাজের ওখান থেকে থানায় ফিরে এসেই আমি রামজিয়াকে ফোন করলাম। কিন্তু ও তখন বাসায় ছিলো না। কাজের লোক জানালো ওদের আপা বাইরে গেছে, সন্ধ্যার দিকে ফিরবে। তবে সন্ধ্যায় আর আমাকে ফোন করতে হলো না, রামজিয়া নিজেই ফোন করলো।

"ইমতিয়াজকে গতকাল অ্যারেস্ট করেছি আমরা।"

"তাই?" খুবই অবাক হলো, সেইসঙ্গে অবশ্যই আনন্দিত। "মাই গড! কিভাবে ধরলেন ওকে? কোথায় পেলেন?"

"স্টেডিয়াম থেকে ধরেছি। খেলা দেখতে গেছিলো।"

"স্টেডিয়াম থেকে? বলেন কি?!"

"একেবারে ডিটেক্টিভ উপন্যাসের মতো ঘটনা," বেশ গর্বের সাথেই বললাম।

"ওয়াও," তার বিস্ময় যেন শেষই হয় না। "প্লিজ, একটু ডিটেইল বলেন না? আমার খুব শুনতে ইচ্ছে করছে।"

আমি বিপাকে পড়ে গেলাম। টেলিফোনে পুরোটা বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে। তখনকার দিনে খুব কম লোকেই টেলিফোনে এতো সময় নিয়ে কথা বলতো। তাছাড়া থানায় বসে এটা করা প্রায় অসম্ভব। জরুরি দরকার ছাড়া একটা ফোন দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখার কথা চিন্তাও করা যায় না। প্রচুর লোকজন আমার আশেপাশে, তাদের কানে ঠিকই যাবে আমি কাউকে গল্প বলছি।

gronthagaar.blogspot.com

"ইয়ে, মানে...লম্বা কাহিনী।"

ভাগ্য ভালো সে বুঝতে পেরেছিলো সঙ্গে সঙ্গে। "ঠিক আছে, তাহলে এক কাজ করুন, কাল বিকেলে নিউ মার্কেটে চলে আসুন, বুক পয়েন্টের সামনে। কফি খেতে খেতে শোনা যাবে।"

রামজিয়ার এমন প্রস্তাবে রাজি না-হয়ে উপায় ছিলো না। আমরা দু-জন নিউ মার্কেটের ভেতরে একটি খাবারের দোকানে গিয়ে বসলাম পরদিন বিকেলে। দু-কাপ কফি খেতে খেতে পুরো ঘটনাটা তাকে বলতে বাধ্যই হলাম বলা যায়। আমার গল্প বলার ভঙ্গি নাকি কাহিনীটার জন্য, মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনে গেলো সে।

"ওয়াও! আনবিলিভেবল!"

আমার কথা বলার মধ্যে বেশ কয়েকবার এ কথাটা উচ্চারণ করলো। বুঝতে পারলাম, সচ্ছল পরিবারে বড় হয়েছে, আর্থিক অনিশ্চয়তা কি জিনিস জানে না। তার জীবনটা একেবারে নিস্তরঙ্গ কেটেছে। খুব কমই উত্থান-পতন দেখেছে সে, মিশেছে আরো কম মানুষের সাথে। আর যাদের সাথে মিশেছে তাদের বেশিরভাগই তার সমগোত্রীয়, তাই খুব সহজেই বিস্মিত হয়ে যায়। আমাদের মতো তার কিছু কিছু অনুভূতি এখনও ভোতা হয়ে যায়নি।

আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না।" সব শোনার পর আবারো নিজের বিস্ময় প্রকাশ করলো সে। "আগে ভাবতাম, বিদেশি গোয়েন্দারা অসাধারণ হয়, আমাদের দেশেও যে এমন কেউ আছে সেটা বিশ্বাস করতাম না।" মাই গড! ইউ আর অ্যা জিনিয়াস!"

রামজিয়ার শেহরিনের মতো আপ-টু-ডেট সুন্দরি মেয়ের কাছ থেকে প্রশংসা পেতে কে না চাইবে, কিন্তু আমি ভীষণ বিব্রত বোধ করলাম সব কৃতিত্ব একা আমাকে দিয়ে দিচ্ছে বলে।

"আসলে, কেসটা তদন্ত করেছেন এসএম হায়দার, উনি আমার সিনিয়র," বললাম তাকে। "খুবই অসাধারণ মানুষ, এয়ারকুল পোইরোর মতো।"

আগাথা ক্রিস্টির পোইরোর কিছু গল্প পড়ে বেশ ভালো লেগেছিলো, তাই হয়তো তুলনাটা দিয়েছিলাম।

"কিন্তু ছবি থেকে সাসপেক্ট খুঁজে বের করেছেন তো আপনিই?" নিস্পাপ চাহনি দিয়ে বললো রামজিয়া। তার প্রশ্নটা শিশুর মতোই সরল।

"হ্যা, সেটা ঠিক। হায়দারভায়ের সহকারি হিসেবে একটু কন্ট্রিবিউট করেছি বলতে পারেন। এর চেয়ে বেশি কিছু না।"

gronthagaar.blogspot.com

"আপনি যে ছবি থেকে ইমতিয়াজকে সাসপেক্ট হিসেবে ধরে নিলেন, এটা কিন্তু আমার কাছে ইউনিক আইডিয়া বলে মনে হয়েছে। একদম গল্পের মতো।"

বিনয়ী আর বিব্রত হাসি দেয়া ছাড়া আমি আর কিছুই করতে পারলাম না।

"শেষ পর্যন্ত আপনার সন্দেহই ঠিক বলে প্রমাণিত হলো। দ্যাটস গ্রেট।"

আবারো বিব্রত হাসি দিয়ে আশেপাশে তাকালাম। নিউ মার্কেটের ভেতরে লোকজন যাওয়া-আসা করার সময় আমাদের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে। এটা দেখে আমার খুব ভালো লাগলো। আপনি যদি দেখেন কোনো সুন্দরির সাথে বসে আড্ডা দিচ্ছেন আর লোকজন আপনার দিকে ঈর্ষার চোখে তাকাচ্ছে তখন ভালো না লেগে উপায় নেই। আমি হল্‌ফ করে বলতে পারি, কোনো সুন্দরি তরুণীর সাথে নির্জন কোনো সৈকতে কিংবা জনবিরল স্থানে বসে গল্প করার চেয়ে নিউ মার্কেটের মতো জনাকীর্ণ স্থানে বসে কফি খাওয়াটা অনেক বেশি উপভোগ্য! চারপাশে ঈর্ষণীয় চোখের চেয়ে সুখের বস্তু আর কী আছে!

আমরা অনেকক্ষণ ধরে গল্প করেছিলাম সেদিন। নানান কথার ভিড়ে যে নিজেদের কথা বলেছিলাম সেটা বেশ মনে আছে। রামজিয়া জানিয়েছিলো ওদের আদি-নিবাস কোলকাতা। সাতচল্লিশের পর বাবা-মাসহ পরিবারের বেশিরভাগ সদস্য চলে আসে ঢাকায়। তার জন্ম অবশ্য এখানেই। এক কাকা তখনও কোলকাতা রয়ে গেছেন, তিন ওখানকার হাইকোর্টের একজন জাস্টিস। তার বাবা বেশ কিছুদিন করাচিতে এক আমেরিকান ফার্মে চাকরি করার পর নিজের লেদার-ব্যবসা শুরু করেন। তাদের বেশিরভাগ আত্মীয়-স্বজনই কোলকাতায় আছে। দুই ভাই-বোনের ছোট্ট সংসার তাদের।

রামজিয়ার আগ্রহে আমিও আমার কথা বলেছিলাম। জন্মের সময় মা মারা গেলো, বাবা আর বিয়ে করলেন না। মানুষ হলাম মামা-মামির কাছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার আশা ছিলো কিন্তু বাবা মারা গেলেন বলে ডিগ্রি পাস করে ঢুকে পড়ি পুলিশবাহিনীতে।

আমার কথা একাকি শৈশব আর জীবনযুদ্ধের গল্প শুনে সমব্যথি হয়ে উঠেছিলো সে।

এভাবে আলাপ চলতে চলতে সন্ধ্যা হয়ে এলে বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নেই। নিউ মার্কেট থেকে বের হবার আগে বুক পয়েন্ট থেকে তিন-চারটা বই কিনে নিলো রামজিয়া। অবাক করে দিয়ে তার প্রিয় বান্ধবির খুনিকে ধরার পুরস্কার হিসেবে একটা বই গিফটও করে দিলো আমাকে।

gronthagaar.blogspot.com

কী মনে করে যেন বলে ফেললাম, "বইতে কিছু লিখে দিন।"

আমার দিকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রইলো সে। "কী লিখবো?!"

"কিছু একটা...আপনি যে বইটা আমাকে উপহার দিয়েছেন তার একটা প্রমাণ থাকতে হবে না?" হালকাচালে বললাম তাকে।

"প্রমাণ!?" তার বিস্ময় তখনও কাটেনি।

"ঠিক তা নয়। আসলে বই উপহার দিলে কিছু একটা লিখে দিতে হয়, বুঝলেন?"

কিন্তু রামজিয়ার চেহারা দেখে মনে হলো না সে কিছু বুঝতে পারছে। তারপরও দ্বিধাভরে বইটা হাতে নিয়ে একটু ভেবে গেলো, অবশেষে কলম বের করে লিখে দিলো কিছু। লেখা শেষ করে বইটা যখন আমার দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছিলো তখন তার চেহারায়, চোখেমুখে অদ্ভুত এক লজ্জার আবেশ ভর করেছিলো।

বইটা হাতে নিয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে খুলে দেখলাম না।

"কি লিখেছি দেখলেন না যে?" অবাক হলো আমার এমন অদ্ভুত আচরণে।

"এখন না, বাসায় গিয়ে দেখবো।"

"কেন?!"

"এমনি।"

আমার এ কথা শুনে হেসে ফেললো সে। "সেটাই ভালো। লেখাটা পড়ে হয়তো আপনার হাসি পাবে। আমি আসলে গুছিয়ে কিছু লিখতে পারি না।" একটু থেমে আবার বললো, "প্লিজ, আপনি কিন্তু হাসবেন না।"

হাত তুলে তাকে অভয় দিলাম। "একদম হাসবো না।" বলেই হেসে ফেললাম।

রামজিয়াও হেসে ফেললো আমার সঙ্গে সঙ্গে। তার মোহনীয় হাসির মাদকতাপূর্ণ শব্দ এখনও আমার কানে বাজে। দৃশ্যটা যেন আমার স্মৃতির দেয়ালে চমৎকার ফ্রেমে বন্দি হয়ে আছে আজও।

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

অধ্যায় ১৮

রামজিয়া হাসছে ঠিক দুই যুগ আগের মতো করেই। তার হাসি যেন একটুও বদলায়নি। আমার স্মৃতির সাথে হুবহু মিলে গেলো সেই হাসি।

"এখনও সেই গিফটের কথা মনে আছে তোমার?"

আমিও বোকার মতো হেসে যাচ্ছি। মাথা নেড়ে সায় দিলাম। "গিফট দেবার মতো খুব বেশি মানুষ তো আর আমার ছিলো না তখন।"

"এখন বুঝি অনেক আছে?"

"অস্বীকার করলে অন্যায় করা হবে। অন্তত যারা আমাকে গিফটগুলো দেয় তাদের প্রতি ভীষণ অন্যায় করা হবে।"

"নিশ্চয় ফিমেল ফ্যান?" মুখটিপে হেসে বললো সে। "মানে, এর বাইরে কিছু ভাবতে পারছি না বলে সরি।"

"মেল-ফিমেল দু তরফ থেকেই পাই।"

"কার কাছ থেকে পেতে বেশি ভালো লাগে?"

হা-হা করে হেসে ফেললাম। "এটা নির্ভর করে সময়ের উপরে।"

"বুঝলাম না?"

"দুই যুগ আগের হলে কোনো তরুণীর কাছ থেকে পেলেই বেশি ভালো লাগতো!"

"আর এখন?"

কাঁধ তুললাম আমি। "এখন কে দিলো, কি দিলো সে-সব নিয়ে আর মাথা ঘামাই না। উপহার পেলেই খুশি হই।"

"ডিপ্লোমেসি করার দরকার নেই, বুঝলে?" কপট অভিমান করে বললো যেন। "মেয়েদের কাছ থেকে পেলে তোমার ভালোই লাগে। বিশেষ করে অল্পবয়সিদের কাছ থেকে।"

আমি আবারো জোরে জোরে হেসে ফেললাম। "তবে দুঃখের কথা কী জানো, তোমার ঐ বইটা আমার কাছে নেই। হারিয়ে ফেলেছি।"

রামজিয়া কাঁধ তুললো। "এতোদিন আগের কথা...হারাতেই পারো।"

এ সময় দেয়াল ঘড়িতে চোখ গেলে আঁতকে উঠলাম আমি। সন্ধ্যা সাতটা বেজে গেছে! "আজ উঠি। খেয়ালই ছিলো না কয়টা বাজে।"

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

এবার আর রামজিয়া কিছু বললো না। আমাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে সে-ও উঠে দাঁড়ালো। "যোগাযোগ রেখো...আবার উধাও হয়ে যে-ও না।"

বুঝতে পারলাম না তার কথাটা ইঙ্গিতপূর্ণ কি-না। "উধাও হবার উপায় নেই। আবারো আসবো। পাণ্ডুলিপিটার ব্যাপারে তোমার মতামত জানতে হবে না...কেসটা যদি রি-ওপেন করা সম্ভব হয় তখনও তো তোমার হেল্প লাগবে।"

"তাহলে দরকার ফুরিয়ে গেলে আর যোগাযোগ রাখবে না?"

আমি তার চোখের দিকে চেয়ে রইলাম কয়েক মুহূর্ত। দুই যুগ আগে হলে এভাবে তার চোখের দিকে সরাসরি চেয়ে থাকতে সঙ্কোচ হতো, কিন্তু এমন একটা বয়সে এসে পৌঁছেছি, এরকম সঙ্কোচ আর হয় না আজকাল। "বয়স হয়েছে...পালানোর ক্ষমতা-ইচ্ছে কোনোটাই নেই। আড্ডা দেবার মতো সময় যদি তোমার থাকে তাহলে অবশ্যই আসবো।"

হেসে ফেললো রামজিয়া শেহরিন। "ওটা আমার হাতে যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। ইউ নো, আই হ্যাভ নো ফ্যামিলি অ্যাট অল।"

মাথা নেড়ে সায় দিলাম। "ঠিক আছে। ভালো থেকো। আর পাণ্ডুলিপিটা একটু দ্রুত পড়ে মতামত দিও, প্রকাশক খুব চাপ দিচ্ছে। সামনেই বইমেলা।"

"ও," বিস্মিত হলো সে। "হুম, ফ্রেব্রুয়ারি তো চলেই এলো। এই বইটা কি তখন বের করার প্ল্যান করছো?"

"যদি সময়মতো শেষ করতে পারি তাহলে মেলাতেই বের হবে," বললাম তাকে।

"ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করবো দ্রুত শেষ করতে।" একটু থেমে আবার বললো সে, "এই নাও, আমার কার্ড।"

আমার দিকে বাড়িয়ে দেয়া তার কার্ডটা হাতে তুলে নিলাম। এটা করতে গিয়ে তার আঙুলের সাথে আমার আঙুলের আল্‌তো স্পর্শ হলো। সত্যি বলতে, আমি এক ধরণের শিহরণ বোধ করলাম, একেবারে অল্পবয়সিদের মতো। কার্ডটা তড়িঘড়ি পকেটে ভরে নিলাম।

"আমি কার্ড ব্যবহার করি না, তাই দিতে পারছি না।"

"ইটস ওকে," হেসে বললো সে। "তুমি তোমার ফোন নাম্বারটা দিয়ে যাও...দরকার পড়লে আমি তোমাকে কল করবো।"

আমি আমার ফোন নাম্বারটা রামজিয়াকে দিয়ে তাদের বাড়ি থেকে ফুরফুরে মেজাজে বের হয়ে এলাম। রিক্সা না নিয়ে দীর্ঘ পথ হাটলাম

Gronthagar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

অকেদিন পর। আমার দু-পাশে পথঘাটগুলো বেশ বদলে গেছে। সেগুলো দুই যুগ আগের সুনশান আর নিরিবিলি নেই। প্রচুর মানুষের আনাগোনা। রাস্তার পাশে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েরা আড্ডা দিচ্ছে, বাড়ি যাবার নাম নেই। ধানমণ্ডিতে এখন আর মুক্ত বাতাস নিতে নিতে হাটা যায় না। লোকজনের ভীড় ঠেলে কায়দা করে হাটতে হয়। এভাবে হাটতে আমার ভালো লাগে না, তাই অনেকটা পথ হেটে যাবার পর রিক্সা নিয়ে নিলাম।

নিজের ঘরে ফিরে অনেকক্ষণ বসে রইলাম ড্রইংরুমের সোফায়। হঠাৎ করেই ল্যাপটপটা চালু করে পাণ্ডুলিপির ফাইলটা ওপেন করে লেখাগুলোতে চোখ বোলাতে লাগলাম। কতোগুলো স্মৃতি মনে করতে বেগ পাচ্ছি। অথচ মাত্র ক-দিন আগে ওগুলো আমি ঠিকই লিখে রেখেছিলাম। ব্যাপারটা যেন এমন–দীর্ঘদিন মাথার ভেতর থেকে স্মৃতিগুলো বের করে লিখে রাখার পর আমি ভারমুক্ত হয়ে গেছি। এখন আর সেগুলোকে মাথায় নিয়ে ঘোরার কোনো মানে নেই।

আমার স্মৃতিভাণ্ডার যেভাবে হুমকির মুখে পড়ে যাচ্ছে তাতে করে একটা ভয় জেঁকে বসলো আমার মধ্যে–সম্ভবত দু-তিন বছর পর অনেক স্মৃতি পুরোপুরি মুছে যাবে। বিশেষ করে সুখের স্মৃতিগুলো। কেনজানি ওগুলো আমার কাছে প্রায়শই ঝাপসা হয়ে যায়। গুলিয়ে যায়। দুঃখের স্মৃতিগুলো নিখুঁত পেইন্টিংয়ের মতো সমস্ত ডিটেইল নিয়ে উদ্ভাসিত হলেও সুখের স্মৃতিগুলো ঝাপসা ছবির মতোই অস্পষ্ট।

আমি মাত্র ক-দিন আগে লেখা আমার পণ্ডুলিপিটায় চোখ বুলিয়ে সংক্ষিপ্ত সময়ের সুখকর স্মৃতিগুলো পুণরায় মাথায় ঢুকিয়ে নেবার চেষ্টা করলাম। আর সেই সংক্ষিপ্ত সুখকর স্মৃতিগুলো অবধারিতভাবেই রামজিয়া শেহরিনকে ঘিরে।

Gronthagaar.blogspot.com

অধ্যায় ১৯

বাঙালীর জীবনে রমণী

ইমতিয়াজকে জেলে ভরার পর এক ধরণের তৃপ্তিতে কেটে গেলো বেশ কয়েকটা দিন। হায়দারভাই অবশ্য তখনও কেসের আলামত, মোটিভ, সাক্ষি-সাবুদ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছিলেন। আর আমি অনেকটা অবসর পেয়ে বই পড়ায় ডুব দিলাম। রামজিয়ার দেয়া বইটা সারা রাত পড়ে শেষ করতে না পেরে পরদিন থানায় নিয়ে গেলাম। কাজের চাপ কম থাকায় নিজের ডেস্কে বসে আয়েশ করে চায়ে চুমুক দিতে দিতে বাকিটা পড়তে শুরু করলাম।

হায়দারভাই তখনও থানায় আসেনি। সম্ভবত অন্য একটা কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কিংবা গতরাতে আবারো মদ খেয়ে বাড়িতে গেছেন। সারা রাত বউয়ের সাথে ঝগড়া করে দেরি করে ঘুমিয়েছেন, সকাল এগারোটার আগে আসবেন বলে মনে হয় না।

বেশ কিছুক্ষণ পড়ার পর টয়লেটে যাবার দরকার হলে আমি টেবিলের উপর বইটা রেখে চলে গেলাম। সত্যি বলতে, বই পড়তে গিয়ে অনেক সময় জোর করে প্রশ্রাব আটকে রাখাটা আমার বদ অভ্যেসে পরিণত হয়েছিলো। একটা অধ্যায় কিংবা সিকোন্সের মাঝপথে বই রেখে টয়লেটে যেতে ইচ্ছে করতো না। পুরোটা শেষ করে তবেই উঠতাম। ততোক্ষণে হয়তো আমার ব্লাডার পরিপূর্ণ হয়ে রীতিমতো চাপ দিতে শুরু করে দিতো।

টয়লেট থেকে ফিরে এসে দেখি হায়দারভাই আমার টেবিলের সামনে বসে রামজিয়ার দেয়া বইটা হাতে নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখছেন। আমাকে দেখেই তিনি ভুরু নাচিয়ে এমন একটা ভঙ্গি করলেন, বুঝতে পারলাম পরবর্তি সংলাপগুলো কি রকম হতে পারে।

'একজন সত্যিকারের ডিটেক্টিভকে'...” বইয়ের শুরুতে রামজিয়ার লেখা কথাগুলো আবৃত্তি করলেন এসএম হায়দার।

আমি টের পেলাম দু-কান গরম হয়ে গেছে।

gronthagaar.blogspot.com

'যার কাছ থেকে সত্যিকারের রোমাঞ্চকর ঘটনা শুনে শিহরিত হয়েছি।' " বইটা উপুড় করে টেবিলের উপর রেখে আমার দিকে মাস্টারের মতো দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রইলেন তিনি। যেন বড়দের কোনো বই লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তে গিয়ে ক্লাস-টিচারের হাতে ধরা পড়ে গেছি। "ঘটনা কি?"

আমি বোকার মতো হেসে ফেললাম।

"এই হাসিতে কাজ হবে না। মেয়েটা কে?"

"মেয়ে?" আমি সর্বোচ্চ অভিনয় করার চেষ্টা করলাম। "নাম তো লেখা নেই...মেয়ে পেলেন কোত্থেকে? কোনো ছেলেও হতে পারে, পারে না?"

মুচকি হাসলেন হায়দারভাই। "শোন, আমি লেখা দেখেই বুঝতে পারি কোনটা ছেলে আর কোনটা মেয়ের হাতের লেখা। দ্বিতীয়ত, তুমি যতো ভালোমানুষই হও না কেন, কোনো ছেলেকে রোমাঞ্চকর ঘটনা শুনিয়ে 'শিহরিত' করবে সেটা আমি বিশ্বাস করি না। তৃতীয়ত, তোমার চেহারায় যে চোর-চোর আর লাজুকমার্কা ভাব ফুটে উঠেছে সেটা তুমি নিজে দেখলেও বুঝতে পারতে তুমি ধরা খেয়ে গেছো।"

"আশ্চর্য, এখানে ধরা খাওয়ার কী আছে?" কথাটা বলেই আমি নিজের চেয়ারে বসে পড়লাম। "একজন একটা বই গিফট করেছে...এই তো।"

"হুম। সেই একজনটা কে? এই বড়ভাইকে তার নাম-ধাম একটু পেশ করো তো।"

"ঐ যে..." কথাটা বলতে গিয়ে টের পেলাম কেমন লজ্জা-লজ্জা করছে, "...ঐ মেয়েটা।"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন হায়দারভাই। "কোন্ মেয়েটা?"

"আরে, ঐ যে...মিলির বান্ধবি।"

আমি দেখতে পেলাম হায়দারভায়ের ভুরু আস্তে আস্তে কপালে উঠে যাচ্ছে। আমার দিকে কেমন স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। "বাপ্‌রে!" অবশেষে বললেন তিনি। "দুয়েকবার দেখা করেই পটিয়ে ফেলেছো?"

"কী যে বলেন না...এখানে পটানোর কি আছে? আজব!"

"আমি কিন্তু অন্য রকম গন্ধ পাচ্ছি।"

প্রতিবাদ করে উঠলাম আমি। "ওর বান্ধবির খুনিকে আমরা ধরতে পেরেছি, সেজন্যে খুশি হয়ে আমাকে বইটা গিফট করেছে। এর মধ্যে অন্য কোন গন্ধ খুঁজে লাভ নেই।"

"আচ্ছা। তাহলে আমার গিফট কই? আমি কি ছাগলের তিন নাম্বার

gronthagaar.blogspot.com

বাচ্চা?" কৃত্রিম আক্ষেপে মাথা দোলালেন এবার।

আমি হেসে ফেললাম। "ঠিক আছে, এরপর দেখা হলে ওকে বলবো আপনাকেও একটা বই গিফট করে দিতে।"

ভুরু কপালে তুললেন। "আজকাল কি রেগুলার দেখা-টেখা হচ্ছে নাকি?

যারপরনাই বিব্রত হলাম আমি। "নিউ মার্কেটের সামনে দেখা হয়ে গেলে ইমতিয়াজকে ধরার কথাটা তখন বললাম। তারপর আমাকে নিউ মার্কেটে নিয়ে গিয় কফি খাওয়ালো, এই বইটা দিলো।"

"আবার কফিও খাওয়ালো?"

হায়দারভাই যে সহজে এ বিষয়টা ছাড়বেন না বুঝতে পারলাম। "আপনি মনে হয় সকাল সকাল ওসব খেয়ে এসেছেন, নইলে এইসব হাবিজাবি চিন্তা আপনার মাথায় আসে কী করে।"

"ব্রাদার, আমি হাবিজাবি খেয়ে উল্টাপাল্টা কথা বলি আর না বলি তাতে কিছু যায় আসে না। ঘটনা যা ঘটার তা অলরেডি ঘটতে শুরু করে দিয়েছে।"

"কি ঘটতে শুরু করেছে, অ্যা? আশ্চর্য!"

"লাভ স্টোরি, ব্রাদার...লাভ স্টোরি।"

কথাটা শুনে আমি যারপরনাই বিব্রত হলাম। লজ্জায় কুঁকড়ে গেলাম যেন। "আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে?! কী সব বলছেন। তিল থেকে তাল বানাচ্ছেন। একটা ছেলে আর মেয়ে একসাথে বসে দুটো কথা বললেই হয়ে গেলো? আশ্চর্য। আপনিও দেখি সবার মতোই ভাবেন।" কপট রাগ দেখালাম আমি।

হায়দারভাই কিছু না বলে মিটিমিটি হাসতে লাগলেন।

"ওর সাথে আমার যায়? আমি সামান্য পুলিশ, আর ও?" কথাটা বলে দম নিয়ে নিলাম, "শোনেন, মেয়েটা খুব ভালো, সবার সাথেই ভালো ব্যবহার করে। কোনো গরিমা নেই। ওরা যে এতো ধনী সেটা বোঝাই যায় না ওর আচরণে। এটাকে আপনি কিস্‌সা বানালে তো হবে না, বিগ ব্রাদার।"

"আহা, আমি তো কিস্‌সা বানাচ্ছি না, শুধু একটু গন্ধ পাচ্ছি!"

"গন্ধ খুঁজে লাভ নেই। জীবনটা সিনেমা নয়, বুঝলেন?"

হা-হা করে হেসে ফেললেন এসএম হায়দার। "শোনো, আমি জানি তোমার সাথে ওদের আকাশ-পাতাল ব্যবধান কিন্তু তাই বলে প্রেমে পড়তে দোষ কি, অ্যা?"

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

"আপনি বলতে চাচ্ছেন ওই মেয়ে আমার প্রেমে পড়েছে? আপনার আসলে মাথা খারাপ হয়ে গেছে।"

"আমার না, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। তুমি ওই মেয়ের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছো, ব্রাদার।"

আমি থ বনে গেলাম কয়েক মুহূর্তের জন্য। আমার চেহারায় নিশ্চয় ভড়কে যাবার অভিব্যক্তি ছিলো। "কী যে বলেন না। আ-আমি..." কথাটা শেষ করতে পারলাম না।

"প্রেমে পড়াটা তো অন্যায় কিছু না। আর হিসেব করে কখনও প্রেমও হয় না।"

এসব কথার জবাবে কী বলবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

"শোন, তোমার এখন যা বয়স তাতে এরকম একটা জম্পেশ প্রেম হলে কিন্তু মন্দ হয় না।" কথাটা বলে তিনি চোখ টিপে দিলেন। "বুড়ো হয়ে যাবার পর স্মৃতি রোমন্থন করতে পারবে–'আহা এক কালে এক আপ-টু-ডেট ছুকরির সাথে চুটিয়ে প্রেম করেছিলাম'!"

"কী যে বলেন না, মাথা খারাপ হয়ে গেছে আপনার। বামন হয়ে চাঁদের দিকে হাত বাড়ানোর কথা বলছেন।"

আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। "ছোটোভাই বলে বলছি না, তুমি ছেলেটা কিন্তু দেখতে-শুনতে বেশ। আচার-ব্যবহারও ভালো। মার্জিত। শুধু সমস্যা ঐ স্ট্যাটাস নিয়ে।" একটু থেমে আবার বললেন তিনি, "আমার মনে হয় বিয়ের কথা বাদ দিয়ে শুধু প্রেম করা যেতে পারে। কি বলো?"

হাত নেড়ে বাতিল করে দিলাম তার এমন প্রস্তাবকে। "আমি কিছুই করছি না, ওকে?"

"কিছু করছো না মানে কি?" অবাক হবার ভঙ্গি করলেন। "অলরেডি তো করে বসে আছো!"

"কি?"

"প্রেমে পড়ার কথা বলছি।"

"আমি প্রেমে পড়েছি?"

"হুম।" তারপর নাটকিয় ভঙ্গিতে বলতে শুরু করলেন, "আমি দিব্যচোখে দেখিতেছি ঐ আপ-টু-ডেট ছুকরিটার প্রেমে তুমি হাবুডুবু খাইতেছো! দিবা-রাত্রি তাহার কথাই ভাবিতেছো! ভাবিতে ভাবিতে তোমার সমস্ত কিছু শিকায় উঠিয়া যাইতেছে! সিগারেট ভাবিয়া কলম মুখে ঢুকাইয়া

gronthagaar.blogspot.com

দিতেছো। আর সিগারেট দিয়া জিডি লিখিতে যাইয়া কাচুমাচু খাইতেছো।"

লজ্জায় আমার কান গরম হয়ে গেলো। থানার চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম কেউ আমাদের কথা শুনে হাসছে কি-না। ঘরের এককোণে দু-জন কনস্টেবলকে দেখলাম মুখ টিপে হাসছে। আমাদের দিকে চেয়ে আছে তারা।

"প্লিজ, ভাই। এসব বন্ধ করেন। ওরা সবাই শুনে ফেলছে। ইজ্জত-সম্মান তো পাঙ্কচার করে দেবেন।"

"আরে ব্রাদার, *যাব পেয়ার কিয়া তো ডারনা কেয়া!*"

আমাকে লজ্জার সাগরে ডুবিয়ে দিয়ে তিনি রীতিমতো হেরে গলায় মুঘল-এ-আজম শুরু করে দিলেন।

"পেয়ার কিয়া কই চুরি নেহি কি...

"ভাই, আপনার পায়ে পড়ি! প্লিজ!"

আমার প্রবল আকুতিতে হায়দারভাই তার ভরাট আর বেসুরো গলার লাগাম টেনে ধরলেন আর হাফ ছেড়ে বাঁচলাম আমি।

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

অধ্যায় ২০

হঠাৎ করেই রামজিয়ার সঙ্গে দেখা করার আরেকটি উপলক্ষ পেয়ে গেছিলাম ওর দেয়া গ্রাহাম গ্রিনের বইটা চোখে পড়ার পর। কষ্ট করে হলেও ইংরেজি বইটা পড়ে শেষ করেছিলাম আমি কিন্তু ফেরত দিতে ভুলে গেছিলাম।

তার সাথে দেখা করা, কথা বলা আর একটু সময় কাটানোর আশায় ওদের বাড়িতে গিয়ে দেখি প্রচুর লোকজনের আনাগোনা। এর আগে যে দু-বার গেছি, পুরো বাড়িটা সুনসান দেখেছি। ফলে একটু ভড়কে গেলাম। আমাকে দেখে দারোয়ান অবাক না হলেও বাড়ির ভেতরে থাকা কয়েকজন লোক নিশ্চই অবাক হয়েছিলো আমার পরনে পুলিশের ইউনিফর্ম দেখে। বাড়িতে পুলিশের উপস্থিতি কে-ই বা কামনা করে!

অযাচিত মেহমানের মতো মেইনগেটের ভেতরে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি, রামজিয়াকে দেখতে পেলাম না। দারোয়ান যদিও বললো ভেতরে চলে যেতে কিন্তু আমার পা দুটো বিশাল বারান্দার সামনে গেঁথে রইলো।

"কাকে চাই?" উদ্বিগ্ন চোখে মাঝবয়সি এক লোক আমার দিকে এগিয়ে এলেন।

"জি, রামজিয়ার কাছে এসেছিলাম," কোনোমতে বলতে পেরেছিলাম আমি।

উদ্বিগ্ন মুখটা আরো বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো আমার কথা শুনে। সেই সাথে যোগ হলো বিস্ময়। "কি দরকারে?!"

আমি বোকার মতো বইটা বাড়িয়ে দিলাম ভদ্রলোকের দিকে। "এই যে...এটা দিতে এসেছি।"

ভদ্রলোকের চেহারাটা দেখার মতো হয়েছিলো। পুলিশের এক অ্যাসিসটেন্ট সাব-ইন্সপেক্টর ইংরেজি নভেল ফেরত দিতে এসেছে তাদের বাড়ির একমাত্র মেয়ের কাছে! ব্যাপারটা হজম করতে যেন বেগ পাচ্ছিলেন ভদ্রলোক।

এমন সময় রামজিয়া এসে পড়লো সেখানে।

"আরে, আপনি?" স্মিত হেসে পরিচয় করিয়ে দিলো ভদ্রলোকের সাথে। সম্পর্কে তার কাকা হয়। আমি যে মিলির কেসটা নিয়ে তদন্ত করছি সেটা জানিয়ে দিলো।

gronthagaar.blogspot.com

"ও, আচ্ছা," ভদ্রলোক আর কিছু না বলে বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন কিন্তু তার চোখেমুখে বিস্ময় একটুও কমলো না।

"আপনি কি আমাকে ফোন করেছিলেন?"

রামজিয়ার এ কথায় মাথা দোলালাম। "না, মানে...এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম বইটা দিয়ে যাই।"

"ও," বইটা হাতে নিয়ে হেসে বললো। তার মধ্যে লাজুক একটি অভিব্যক্তি দেখতে পাচ্ছিলাম তখন। "ইয়ে...মানে, আজ তো বাড়িতে একটা প্রোগ্রাম আছে...অনেক লোকজন।"

"হ্যা, আমিও বুঝতে পারছিলাম এরকম কিছু হবে," বললাম তাকে।

"ভেতরে আসুন? এক কাপ চা?..."

আমি ভালো করেই জানতাম এটা নিতান্তই সৌজন্যতার খাতিরে বলা। "না, না। তার কোনো দরকার নেই। আমার কাজ আছে। আর আপনার বাড়িতে আজ প্রোগ্রাম হচ্ছে...আরেকদিন এসে চা খেয়ে যাবো।"

নিঃশব্দে হাসলো সে। "তাহলে আরেকদিন আসবেন কিন্তু?"

"আচ্ছা," কথাটা বলেই আমি তাদের বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলাম। বাড়ির পরিবেশ দেখে কেমন একটা খটকা লাগছিলো। গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আবারো ফিরে তাকালাম। কারোর জন্মদিন?

কৌতুহল চেপে রাখতে না পেরে দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করে বসলাম।

"আপারে ছেলেপক্ষ দেখতে আসবো," হাসিমুখে জানালো সে। "ছেলে বিলাত ফেরত...বিরাট বড় লোক।"

কথাটা শোনামাত্র আমার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। কেমন হাহাকার করে উঠলো বোঝাতে পারবো না। রামজিয়া শেহরিনের বিয়ে হয়ে গেলে আমার কী? আমার কেন এমন হচ্ছে? এ প্রশ্নের কোনো উত্তর খুঁজে পেলাম না। সচেতন আমি ঘুণাক্ষরেও রামজিয়া শেহরিনের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির স্বপ্ন দেখি না। আমাদের দু-জনের মধ্যে এমন কিছু হয়নিও। আর দু-জনের যোজন যোজন দূরত্বের কথা আমার ভালো করেই জানা ছিলো। রামজিয়ার সহজ-স্বাভাবিক আচরণ হয়তো আমাকে লোভি করে তুলেছিলো। হয়তো আমার অবচেতন মন সমস্ত যুক্তিবুদ্ধির বাইরে গিয়ে ভাবতে শুরু করে দিয়েছিলো।

মাথা থেকে চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে একটা সিগারেট ধরিয়ে হনহন করে হাটতে শুরু করলাম আমি। একটা ঘোরের মধ্যে হাটতে হাটতে কখন যে নিজের বাড়ির কাছে পৌছে গেছিলাম টেরই পাইনি।

Gronthagar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

পরবর্তি দু-তিনদিন আমি মনমরা হয়ে ছিলাম। ব্যাপারটা হায়দারভায়ের চোখ এড়ায়নি। তিনি বেশ কয়েকবার জানতে চেয়েছিলেন এর কারণ কি, আমি প্রতিবারই এড়িয়ে গেছি, মিথ্যে বলেছি। বাবা-মা'র কথা খুব মনে পড়ছে–এরকম বিশ্বাসযোগ্য একটি মিথ্যে হায়দারভাইকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছিলো। তিনি হয়তো ভেবেছেন, অকালে পিতা-মাতা হারানোর একটি ছেলে মাঝেমধ্যে বাবা-মায়ের কথা মনে করে মনমরা হয়ে থাকবে, এটা খুবই স্বাভাবিক।

পাঁচদিন পর বলা নেই কওয়া নেই হুট করে থানায় এসে হাজির হলো রামজিয়া। আমার কলিগদের ভুরু কপালে উঠে গেলো। বাঁকাচোখেও তাকালো কেউ কেউ। ভাগ্য ভালো, বেলবটম আর শার্ট পরে আসেনি, তখনকার বাঙালি মেয়েদের মতোই কামিজ আর চুড়িদার পরেছে।

"এই তো, এখান দিয়েই যাচ্ছিলাম, ভাবলাম আপনার বইটা ফেরত দিয়ে যাই। ঐদিন আসলে খেয়াল ছিলো না।"

আমি বোকার মতো হাসতে লাগলাম কেবল। তাকে যে বসতে দেবো সে খেয়াল নেই। বার বার আশেপাশে থাকা আমার কলিগদের দিকে চোখ চলে যাচ্ছিলো। তাদের সবার দৃষ্টি আটকে আছে রামজিয়া শেহরিনের দিকে।

"আমি কিন্তু কাল আপনাকে ফোন করেছিলাম," সে জানালো, "কেউ একজন বললো আপনি বাইরে আছেন।"

"ক্-কখন?" একটু তোতলালাম আমি।

"এই তো...বিকেল পাঁচটার দিকে?"

গতকাল বিকেল চারটার পর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি থানায়ই ছিলাম। সুতরাং বুঝতে অসুবিধা হলো না আমার ঈর্ষাকাতর কলিগদের কেউ এটা করেছে। বাঙালির ঈর্ষা–এর চেয়ে ভয়ানক অসুখ কমই আছে। শুধুমাত্র রিনিঝিনি একটি নারীকণ্ঠই তাদেরকে যেরকম ঈর্ষায় আক্রান্ত করেছে তাতে করে আজকে সামনাসামনি দেখার পর কী হবে কে জানে!

রামজিয়া তার প্রবল ব্যক্তিত্ব আর তারচেয়েও তীব্র সৌন্দর্য নিয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আর আমি এই থানার সামান্য একজন এএসআই, আড়ালে আবডালে লোকজন যাদেরকে ঠোলা বলে গালি দেয়।

তো, আমার মনের একটা অংশ বলছিলো, সম্ভবত নিজের বিয়ের পাকা খবরটা দেবার জন্য থানায় চলে এসেছে, বই ফেরত দেবার ব্যাপারটা উসিলামাত্র। ঠিক যেমনটি আমি বই ফেরত দেবার ছলে তার সঙ্গে দেখা

gronthagaar.blogspot.com

করতে গেছিলাম! মানুষ তো নিজেকে দিয়েই বিচার করে–তাই না?

সম্বিত ফিরে পেতেই দেখি স্টাইলিশ ভ্যানিটি ব্যাগের জিপার খুলছে সে। আমি তাকে তখনও বসতে বলিনি। মূর্তিমান এক বোকা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

"এই নিন, আপনার বই।" *বাঙালী জীবনে রমণী* বাড়িয়ে দিলো আমার দিকে। কিন্তু আমার দৃষ্টি-আগ্রহ সত্যিকারের রমণীতে!

বইটা হাতে নিয়ে বুঝতে পারলাম অভদ্রের মতো তাকে বসতে না বলে আমিও দাঁড়িয়ে আছি। "বসুন," বললাম তাকে।

"আমার মনে হয় আপনারা ভীষণ ব্যস্ত আছেন। তাছাড়া এখানে বসাটা ঠিক হবে না।"

"আশ্চর্য, এটা বলছেন কেন?" আমি মৃদু প্রতিবাদ করলাম।

"সত্যি বলতে, আমি এর আগে কখনও থানায় ঢুকিনি। এই প্রথম।"

কথাটা বলে সে কী বোঝালো বুঝতে পারলাম না।

"আজ আসি...পরে কথা হবে।"

এ কথার জবাবে আমি শুধু মাপা হাসি দিতে পেরেছিলাম। যেন মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ। দ্বিতীয়বার তাকে বসার জন্য আর অনুরোধ করিনি। যদিও এটা করাই আমার উচিত ছিলো। আসলে আমি চাইছিলাম সে তাড়াতাড়ি চলে যাক। তার বাড়ির ড্রইংরুমে বসে আড্ডা দেয়া, কিংবা নিউ মার্কেটের কফিশপে বসে কফি খেতে বেশ লাগে কিন্তু থানার ভেতরে ঈর্ষাকাতর কলিগদের মাঝে তাকে নিয়ে প্রচণ্ড অস্বস্তি বোধ করছিলাম।

" 'আত্মঘাতী বাঙালী' পড়েছেন?" বোকার মতোই বলে ফেললাম আমি। "ওটাও নীরদচন্দ্র চৌধুরির বই।"

"এই বইটার সিকুয়েল নাকি?" আমার হাতে থাকা *বাঙালী জীবনে রমণী*'র দিকে ইঙ্গিত করলো সে।

"ঠিক তা নয়, তবে এরকম তিনটি সাবজেক্ট নিয়ে তার তিনটি বই আছে।"

"আরেকটা কি?"

"আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ।"

"ওয়াও," শব্দটা সে এমনভাবে উচ্চারণ করলো যেন রবীন্দ্রনাথ সত্যি সত্যি আত্মঘাতী হলেও সে-খবর আজ দীর্ঘদিন পর নতুন করে আবিষ্কৃত হয়েছে! কিংবা রবীন্দ্রনাথের আত্মঘাতি হওয়াটা খুবই মজার কোন ঘটনা!

আমি বুঝতে পারলাম, থানার মধ্যে বই নিয়ে কথা বলাটা ঠিক হয়নি।

Gronthosur.blogspot.com

gronthagar.blogspot.com

"আপনার কাছে আছে?" আগ্রহভরে জানতে চাইলো সে।

মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

"তাহলে আমাকে ওটা দিয়েন...পড়বো।"

"আচ্ছা," মুচকি হেসে বললাম তাকে। তারপর ভদ্রতার খাতিরে থানার মেইন গেট পর্যন্ত পৌছে দেবার জন্য বের হয়ে গেলাম। কথা দিলাম দুয়েকদিনের মধ্যেই তাকে 'আত্মঘাতী' দিয়ে আসবো। তার বাসার সামনে দিয়ে প্রায়ই আমাকে যেতে হয়, সুতরাং যাবার পথে বইটা দিয়ে যাওয়া আমার জন্য কোনো সমস্যাই হবে না–এমন মিথ্যে অজুহাত দাঁড় করিয়ে আরেকবার তার সান্নিধ্য পাবার সুযোগটা পাকাপোক্ত করে ফেললাম।

"কি মিয়া, একেবারে থানায় চলে এসেছিলো নাকি?"

রামিজয়া চলে যাবার একটু পর হায়দারভাই থানায় এসেই আমার টেবিলের উপর ঝুঁকে চোখেমুখে যতোটা সম্ভব ইঙ্গিতপূর্ণ অভিব্যক্তি হেনে বললেন।

"আপনিও দেখি ওদের মতোই করছেন," বললাম আমি।

"ওদের আর কী দোষ বলো, চোখের সামনে এরকম একজনকে দেখলে ঘাড় ঘুরিয়ে তো দেখবেই।"

"আমার তো মনে হচ্ছে একেকজন ঈর্ষায় মরে যাচ্ছে।" কথাটা না বলে পারলাম না। অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম, এই ব্যাপারটা, মানে, কলিগদের ঈর্ষার বিষয়টি আমি খুব উপভোগ করছি। ঈর্ষা খারাপ হতে পারে কিন্তু ঈর্ষার শিকার হওয়াটা নেহায়েত মন্দ নয়। সম্ভবত, কখনও কখনও সবচাইতে উপভোগ্য জিনিস!

"জানেন, ও আমাকে ফোন করেছিলো কাল বিকেলে...কেউ একজন ফোন ধরে বলে দিয়েছে আমি থানায় নেই। অথচ কাল সারাটা বিকেল আমি এখানে!" অনুযোগের সুরে বললাম।

ঠোঁট উল্টে মাথা নেড়ে সায় দিলেন হায়দারভাই। "খুব খারাপ! ভীষণ অন্যায়।"

তার কথার ভঙ্গি আমাকে হতাশ করলো। "আপনি তো দেখি মজা নিচ্ছেন।"

"ব্রাদার, রমণী তো জীবনে ঢুকেই পড়েছে, এখন এসব বই পড়ে কী লাভ!"

আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম আমার হাতে 'বাঙালী জীবনে রমণী' প্রকটভাবেই উন্মুক্ত। বইটা টেবিলের ড্রয়ারে রেখে দিলাম।

gronthagaar.blogspot.com

"আশ্চর্য, আপনি এসব কী বলেন!" আমি হায়দারভায়ের ঠাট্টায় যারপরনাই বিব্রত।

"নীরদবাবু একখান বই লিখেছে বটে! বই পড়লেই জীবনে রমণীর আগমণ ঘটে যায়।"

আমি মাথা দুলিয়ে গেলাম, কিছু বললাম না।

"ভাই, আমাকে এমন একটা বই দাও না, যেটা পড়লে তোমার ভাবির সাথে আর ঝগড়াঝাটি হবে না। আমার প্রেমে মশগুল হয়ে যাবে সে।"

আমি বাঁকাহাসি দিয়ে বললাম, "এরজন্যে কষ্ট করে শতশত পৃষ্ঠার বই পড়ার দরকার কি? আমার দুটো উপদেশ শোনেন, কাজ হয়ে যাবে।"

আমার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি।

"প্রথম উপদেশ, মদ খাওয়া ছেড়ে দেন।"

হাত নেড়ে বাতিল করে দিলেন হায়দারভাই।

"দ্বিতীয় উপদেশ, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা রাখেন। সেক্ষত্রে নিদ্রাকুসুম তেল ব্যবহার করতে পারেন। দরকার হলে আমি কয়েক বোতল সাপ্লাই দেবো।"

হা-হা-হা করে হেসে উঠলেন সিনিয়র সাব-ইন্সপেক্টর। "প্রেমে পড়ে দেখি কথাও শিখে গেছো!"

"আশ্চর্য!" প্রতিবাদ করে উঠলাম আমি। "মাথা-টাথা কি খারাপ হয়ে গেছে নাকি? ঐ মেয়ের সাথে আমার টুকটাক কথাবার্তা হয়...দুয়েকটা বই বিনিময় হয়েছে...এই যা।" একটু থেমে আবার বললাম, "আমার মতো সামান্য ঠোলার সাথে ঐ মেয়ে..." মাথা দোলালাম আমি, "আমি তো দু-বোতল মদ খেয়েও এমন আজগুবি চিন্তা করতে পারবো না। আপনার মাথায় এসব ঢোকে কী করে?"

মুচকি হাসলেন হায়দারভাই। "ব্রাদার, যুক্তিতক্ক দিয়ে কোনো কালেই প্রেম হয়নি, হবেও না। আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা শোনো। ঐ মেয়ের কথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারবো না। তবে আমি আমার ছোট্ট ভাইটার কথা বলতে পারি। সে প্রেমে পড়েছে। ঐ আপ-টু-ডেট ছুকরির প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে সে। ভেতরে ভেতরে...গোপনে গোপনে!"

"ধুর!" বলেই আমি উঠে চলে গেলাম।

"কই যাও?" পেছন থেকে আমাকে ডাকলেন তিনি।

"বাথরুমে," ঘাড় ঘুরিয়ে কথাটা বলেই থানার নোংরা বাথরুমের দিকে পা বাড়ালাম। আসলে পালালাম।

Gronthogaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

অধ্যায় ২১

আগেই বলেছি, ইমতিয়াজকে ধরে জেলে ভরার পর বেশ কয়েকটা দিন দারুণ কেটেছে আমার। থানা থেকে রামজিয়া চলে যাবার পর দু-দিনের বেশি অপেক্ষা করতে পারিনি আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ নিয়ে ছুটে গেলাম ধানমণ্ডিতে। আমাকে দেখে বিস্ময়ভরা চোখে চেয়ে রইলো সে। তবে সেটা কয়েক মুহূর্তের জন্য।

"আপনাকে দেখে তো চেনাই যাচ্ছে না," ড্রইংরুমে ঢুকে আমাকে দেখেই বলে উঠলো।

আমি কেবল মুচকি হাসলাম, কিছু বললাম না। এই প্রথম পুলিশের ইউনিফর্ম ছেড়ে সাধারণ পোশাকে দেখা করলাম। সঙ্গত কারণেই আমাকে দেখে সে অবাক হয়েছে।

"অবশ্য আপনাকে ইউনিফর্ম ছাড়াই বেশি ভালো দেখায়," আমার বিপরীতে সোফায় বসতে বসতে বললো। "কিছু মনে করবেন না, আপনাদের পুলিশের ইউনিফর্মটা আমার কাছে একদম ভালো লাগে না।"

আমি এ কথায়ও হেসে ফেললাম। তখন পুলিশের ইউনিফর্ম ছিলো পুরোপুরি খাকি রঙের প্যান্ট-শার্ট দুটোই। "সরকার যে পোশাক দেবে আমাদের সেটাই পরতে হবে...এখানে কোনো চয়েজ নেই।"

"তা তো ঠিকই।" একমত পোষণ করে বললো সে। "মিলির কেসটা...আই মিন, ওটার কি খবর?"

"খবর ভালো। ইমতিয়াজ জেলে আছে, খুব শীঘ্রই বিচার শুরু হয়ে যাবে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে, তবে মুখে কিছু বললো না।

আমি আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ বাড়িয়ে দিলাম তার দিকে।

"থ্যাঙ্কস," বইটা হাতে নিয়ে মিষ্টি করে হেসে বললো রামজিয়া। "নিরদ সি. চৌধুরির ভাষা খুবই কঠিন। আমার তো মাঝেমধ্যে মাথা ধরে যায়। তবে নো ডাউট, উনি খুব ভালো লেখেন। উনার সাবজেক্টগুলোও দারুণ।"

"উনার ভাষা যে কঠিন সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা যারা বাংলা বই পড়ি তারাও হিমশিম খাই।"

gronthagaar.blogspot.com

"ওয়ান্স অ্যাগেইন থ্যাঙ্কস," হেসে বললো সে।

"আবার থ্যাঙ্কস কেন?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

"বাংলা বই পড়ার অভ্যেস করানোর জন্য।"

"তাহলে তো আপনাকেও আমার ধন্যবাদ দিতে হয়...ইংরেজি বই ধরিয়ে দেবার জন্য।"

হি-হি-হি করে হেসে উঠলো সে। "আমি ধরিয়ে দিয়েছি?"

"ঐ যে বই ধার দিয়েছেন, ওটার কথাই বলছি আর কি।"

আবারো হেসে ফেললো সে। "গান শুনবেন?" হঠাৎ করে বলে উঠলো। "আমার কাকা লন্ডন থেকে কিছু লং-প্লে নিয়ে এস্‌ছেন...একদম নতুন।"

"ঠিক আছে," আমি বললাম। লন্ডনের কথা শুনেই মনে পড়ে গেলো বিলাত ফেরত পাত্রের কথা। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছিলো তার বিয়ের কী খবর সেটা জিজ্ঞেস করি কিন্তু সঙ্কোচের কারণে বলতে পারিনি।

"ক্যাট স্টিভেনেরটা শোনাই...আমার ফেভারিট," লং-প্লেতে একটা রেকর্ড চাপাতে চাপাতে বললো সে। "ওর মর্নিং হ্যাজ ব্রোকেন গানটা আমার কী যে ভালো লাগে!"

টার্ন ওভারটা লং-প্লের উপর বসিয়ে দিতেই হালকা মুড়ি ভাঁজার শব্দ ভেসে এলো। যারা লং-প্লে শুনেছে তারা জানে এরকম নয়েজের ব্যাপারটা। রামজিয়াদের ড্রইংরুমটা ভরে উঠলো চমৎকার কণ্ঠ আর সুরে। গায়কের গায়কি খুবই সুন্দর। হালকা তালে বেজে চললো গানটা।

"ওয়েট, আমি একটু আসছি," বলেই পাশের ঘরের চলে গেলো। দরজার কাছে গিয়ে আবার ঘুরে তাকালো আমার দিকে। "চা, নাকি কফি?"

"চা।"

প্রসন্নভাবে হেসে মাথা নেড়ে চলে গেলো রামজিয়া।

আমি একা একা ড্রইংরুমে বসে মি. স্টিভেনের সুরেলা কণ্ঠের গান শুনে গেলাম। লং-প্লেতে ইংরেজি গান শোনা সেটাই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। বলা বাহুল্য, আমার কাছে অসম্ভব ভালো লেগেছিলো। গানের কথা পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও সুরটা দারুণ মোহিত করেছিলো আমাকে। পরবর্তি কালে আমি নিজের জন্য লং-প্লে কিনে বাঙলঅ-ইংরেজি গান শোনা শুরু করেছিলাম। এই অভেস্যটা এখনও আমার রয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ আবার ড্রইংরুমে ফিরে এলো সে, তারপর পরই কাজের লোক নিয়ে এলো চা-বিস্কিট-চানাচুর।

"ঐদিন যে আপনি এলেন, তখন তো চা খাওয়াতে পারিনি, বাড়িতে একটা প্রোগ্রাম ছিলো।" নিজে থেকেই বললো।

Gronthogaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

আমার জানতে চাওয়া উচিত ছিলো কিসের অনুষ্ঠান, কিন্তু কিছুই বলতে পারলাম না। সহজ একটা সুযোগ হাতছাড়া হতে যাচ্ছিলো প্রায়।

"আমি সাধারণত এসব লাইক করি না কিন্তু কী করবো বলেন, বাড়ির সব মুরুব্বি একজোট হয়ে গেলো।"

"কি লাইক করেন না," চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

মুচকি হাসি দেখা গেলো তার ঠোঁটে। সে-ও তার কাপটা তুলে নিলো। "মেয়েদেখা-ছেলেদেখা, এইসব।"

"ছেলেপক্ষ এসেছিলো? আপনাকে দেখতে?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো। তারপর কথা বলা থেকে বিরত থাকার জন্যই যেন চায়ে চুমুক দিতে শুরু করলো সে।

"আপনার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে?" আমার ভেতর থেকে সমস্ত জড়তা দূর হয়ে গেলো এবার। নিজের কৌতুহল আর দমানোর চেষ্টা করলাম না।

চায়ে চুমুক দিয়ে মাথা দুলিয়ে জবাব দিলো। "না। ছেলে আর তার ফ্যামিলি দেখতে এসেছিলো। এই তো, আর কিছু না।"

"কেন, আপনার ছেলে পছন্দ হয় নি?" আমি একটু হালকাচালেই বলে ফেললাম কথাটা।

মুখ টিপে হেসে ফেললো সে। "না।"

"কেন?"

"এমনি। কী বলবো, জাস্ট পছন্দ হয়নি।"

"বিলাত ফেরত ছেলে পছন্দ না করার তো কারণ দেখছি না।"

আমার কথা শুনে ভুরু কুচকে ফেললো রামজিয়া। আর আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম, একটা বেফাঁস কথা বলে ফেলেছি। মনে মনে প্রমাদ গুণলাম।

"আপনি কিভাবে জানলেন? স্ট্রেইঞ্জ!"

"আ-আপনিই না বললেন?" একটা চালাকি করার চেষ্টা করলাম। জানি ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

"আমি বলেছি?" কথাটা বলেই স্মরণ করার চেষ্টা করলো, নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো সে। আমি নিশ্চিত, আমার মিথ্যেটা ধরতে পেরেছ। তবে মুখে কিছু বললো না।

"ছেলে পছন্দ না হবার কারণ কি?" আমি প্রসঙ্গ পাল্টাতে চাইলাম। "কথা বলে ভালো লাগে নি?"

gronthagaar.blogspot.com

"আমি আমার বাবা-কাকাকে আগেই বলেছিলাম, কথা বলে ভালো না লাগলে কোনোভাবেই রাজি হবো না।" একটু থেমে আবার বললো, "এটা আমার কাকার আইডিয়া ছিলো, বুঝলেন?"

"কোন্‌টা?" বুঝতে না পেরে বললাম।

"এই যে...বিয়ের সম্বন্ধটার কথা বলছি।"

"ও।"

"ঐ ছেলে বলে, তার নাকি অনেক টাকা, আমার বাবারও মাশাল্লা কম নয়, চাকরি-বাকরি করার কোনো দরকার সে দেখছে না।" কথাটা শেষ করে হেসে ফেললো। "এডুকেটেড ছেলেরা এসব কথা কিভাবে বলে, বুঝি না।"

আমি অবশ্য কথাটা শুনে খুব একটা অবাক হইনি। ঐ সময়ে মেয়েদের চাকরি করাটাই বরং বিরল ব্যাপার ছিলো। বিয়ের পর কোনো মেয়ে চাকরি করতে চাইলে খুব কম স্বামিই সেটা করতে দিতো।

"বেচারা...পুরোপুরিই ব্যাডলাক। আপনার মনোভাব বুঝতে পারেনি," আমি হেসে বললাম।

"সত্যি কথা কি জানেন, ছেলে যদি সবদিক দিয়ে ঠিকও থাকতো আমি এই বিয়েতে রাজি হতাম না।"

এ কথা শুনে তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম আমি। "কেন?"

"আমি আসলে সেটেল্‌ড ম্যারেজ খুবই ডিস্‌লাইক করি।"

সত্তুরের দশকে এ কথাটা তার মতো আপ-টু-ডেট মেয়ের পক্ষেই বলা সম্ভব ছিলো। সাধারণ বাঙালি পরিবারের মেয়ের পক্ষে এমন কথা মনে এলেও মুখে আনা সম্ভব ছিলো না। অন্তত আমার চেনাজানা পরিসরে এমনটিই দেখেছি।

তাহলে প্রেম করে বিয়ে করেন–কথাটা কণ্ঠনালিতে এসে আটকে গেলো যেন। এই সামান্য পরিচয় আর সখ্যতার মধ্যে এমন কথা বলা উচিত হবে না ভেবে চুপ থাকলাম। তখনই খেয়াল করলাম লং-প্লেটা আর বাজছে না। সম্ভবত যে গানটা শুনছিলাম সেটা শেষের দিকে কোনো গান ছিলো। লং-প্লে ঘুরছে কিন্তু গান হচ্ছে না, তার বদলে যে হালকা নয়েজ হচ্ছে–অনেকটা মুড়ি ভাঁজার শব্দের মতো–সেটা যেন নীরবতাকে আরো প্রকট করে তুললো।

"আমিও সেটেল্‌ড ম্যারেজ পছন্দ করি না," সেই নীরবতা ভাঙার জন্য বোকার মতো বলে ফেললাম কথাটা।

রামজিয়া আমার দিকে চেয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। "দ্যাটস গুড," অবশেষে বললো সে। "প্রেম করেন?"

gronthagaar.blogspot.com

তার কাছ থেকে আচমকা এমন প্রশ্ন শুনে আমি রীতিমতো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম।

"ন্-না।" কথাটা বলতে গিয়ে কেমন যেন লজ্জা করলো আমার।

"কেন?"

কী বলবো ভেবে পেলাম না। বিব্রত হয়ে হেসে ফেললাম। "না, মানে...ইয়ে..." কথাটা আর শেষ করতে পারলাম না।

"বলতে না চাইলে থাক।" বললো সে।

খেয়াল করলাম রামজিয়া খুবই স্বাভাবিকভাবে কথা বলছে। কিন্তু আমি পুরোপুরি এলোমেলো হয়ে গেছি।

"বলার মতো কিছু নেই...আসলে।" কোনভাবে বলতে পারলাম।

"কাউকে ভালোও লাগেনি কখনও?"

এ প্রশ্নে একেবারে ওলট-পালট হয়ে গেলাম আমি। তখনও জানতাম কিভাবে সত্যিকারের অভিব্যক্তি লুকিয়ে রাখতে হয়। সম্ভবত রামজিয়াও বুঝতে পেরেছিলো আমার অবস্থা। খুবই অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করলাম আমি। তার দিকে তাকাতেও হিমশিম খেলাম। এমন সময় একেবারে আনাড়ি আর বোকার মতো একটা কাজ করে বসলাম। হুট করেই উঠে দাঁড়ালাম। "আ-আজ আসি...একটা জরুরি কাজ আছে।"

রামজিয়াও হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালো। "ওকে," আমার দিকে স্থিরচোখে চেয়ে বললো। "বইয়ের জন্য থ্যাঙ্কস।"

Gronthagaar.blogspot.com

অধ্যায় ২২

থার্টিফার্স্ট আর হুইস্কি

বছর শেষ, সকাল হলেই নতুন বছর ১৯৭৫-এ পদার্পন করবো আমরা। নতুন বছরের ঠিক আগের রাতে থার্টি ফার্স্ট বলে যে কিছু একটা আছে সেটা আমার মতো গ্রামে বেড়ে ওঠা কারোর পক্ষে কেন, সত্যি বলতে ঐ সময়ে ঢাকা শহরের বেশিরভাগ মানুষের কাছেই ছিলো অজানা।

এই শব্দটা আমি প্রথমে শুনি রামজিয়া শেহরিনের মুখে। নতুন বছরের আগের দিন শেষ বিকেলে, চারপাশে যদিও তখন গাঢ় অন্ধকার নামতে শুরু করেছে শীতকাল বলে, আমি আমার ডেস্কে বসে চা খাচ্ছিলাম নাইট শিফট করার প্রস্তুতি হিসেবে, ঠিক তখনই এক কনস্টেবল আমাকে বললো, এক ভদ্রমহিলা ফোন করেছে। কথাটা শুনেই বুঝে গেছিলাম কে হতে পারে। উঠে গিয়ে থানার ভেতরে যে ফোনটা আছে সেটা তুলে নিলাম।

ফোনে আমার কণ্ঠটা শুনেই উৎফুল্ল ভঙ্গিতে বলে উঠলো সে, "হ্যালো, কেমন আছেন?"

"এই তো ভালো। আপনি কেমন আছেন?"

"আমি তো খুবই ভালো আছি।"

তার এত ভালো থাকার কারণটা কি জানতে চেয়েও জিজ্ঞেস করলাম না।

"সেই যে গেলেন আর তো কোনো খবর নেই আপনার।"

"না, মানে...খুবই ব্যস্ত ছিলাম।"

"আজ বছরের শেষ দিন, জানেন তো?"

কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হয়েছিলো আগামিকাল কি পহেলা বৈশাখ? পরক্ষণেই বুঝতে পেরেছিলাম, আজ ৩১ শে ডিসেম্বর। ইংরেজি বছরের শেষ দিন। আগামিকাল সকাল থেকে শুরু হতে যাচ্ছে নতুন বছর।

"ও, হ্যা...তাই তো," বললাম আমি।

"আজ কি আপনার নাইট-শিফটে ডিউটি আছে?"

একটু অবাক হলাম কথাটা শুনে। আমার নাইট-শিফটের ডিউটির কথা জানতে চাইছে! "হ্যা...কেন?"

gronthagaar.blogspot.com

"ওফ্," একটু হতাশ মনে হলো তাকে। "আজ যদি আপনার নাইট-শিফটের ডিউটি না থাকতো তাহলে ভালো হতো।"

"কেন?" আমি বুঝতে না পেরে আবারো প্রশ্ন করলাম।

"আমরা কাজিন আর বন্ধুরা মিলে বাসায় থার্টিফার্স্ট করবো আজ। সারা রাত ফান করবো। অনেক খাওয়া-দাওয়া হবে।"

"থার্টি ফার্স্ট?!" কথাটা আমার মুখ দিয়ে বের হয়ে গেলো।

"হুম। থার্টিফার্স্ট নাইট। ভাবলাম, আপনাকে ইনভাইট করি।"

আমাকে ইনভাইট করতে চাইছে? নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো।

"ওদেরকে বলেছিলাম আপনি কিভাবে মিলির কেসটা ইনভেস্টিগেট করে ইমতিয়াজকে ধরেছিলেন। ওরা তো খুবই ইন্টারেস্টেড আপনার সাথে পরিচিত হবার জন্য।"

এবার বুঝতে পারলাম দাওয়াত দেবার মাজেজা। কিন্তু মিলির কেসটা যে হায়দারভাই তদন্ত করছেন সে-কথা এই মেয়েকে যতোই বলি না কেন, তার দৃঢ় বিশ্বাস কাজের কাজটা আমিই করেছি।

"একটু চেষ্টা করে দেখেন না...আসলে ভালো হতো।" আমি চুপ মেরে আছি বলে বললো সে।

"ইয়ে মানে...কখন?"

"এগারোটার পর চলে আসুন।"

কথাটা শুনে ভিরমি খেলাম। রাত এগারোটা! বলে কী! ঐ সময় তো মানুষজন অনুষ্ঠান শেষ করে যার যার বাড়িতে ফিরে যায়।

"আসলে, তখন তো ডিউটিতে থাকতে হবে। আটটা-নয়টা হলে একটু চেষ্টা করে দেখতাম।"

অনেকদিন পর বুঝতে পেরেছিলাম, আমার এ কথা শুনে রামজিয়া নিশ্চয় মুখ চাপা দিয়ে হেসেছিলো। থার্টি ফার্স্ট কোনো বিয়ে কিংবা জন্মদিনের অনুষ্ঠানও নয় যে আটটা-নয়টায় শুরু হবে। আমি যে এসব বিষয়ে নাচার সেটা ধরতে পেরেছিলো সে। তবে তার আচরণে কিছুই বুঝতে পারিনি তখন।

"ও," একটু বিরতি দিয়ে আবার বললো, "ঠিক আছে, যদি ঐ সময়ে আমাদের বাসার সামনে দিয়ে যান তো একটু টুঁ মেরে যাবেন, কেমন?"

"আচ্ছা," আর কোনো কথা খুঁজে পেলাম না।

"হ্যাপি নিউ ইয়ার।"

gronthagaar.blogspot.com

সুললিত কণ্ঠে বলে ফোনটা রেখে দিলো সে। আর আমি বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম কয়েক মুহূর্ত। জীবনে প্রথম কেউ আমাকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানালো, আর আমি সত্যি সত্যি 'ক্ষেত' থেকে উঠে আসা একজন, এর জবাবে যে পাল্টা হ্যাপি নিউ ইয়ার বলতে হয় সেটাও জানতাম না। সবেমাত্র জানলাম থার্টি ফার্স্ট বলে কিছু একটা আছে, যেটার শুরু হয় নতুন বছরের আগেরদিন রাতে। আটটা-নয়টার মতো ভদ্র সময়ে নয়, এগারোটা-বারোটার মতো নিশুতি রাতে!

যাই হোক, ঐদিনই হায়দারভায়ের পাল্লায় পড়ে আমি প্রথমবারের মতো একটু মদ্যপান করেছিলাম, তবে সেটার উপলক্ষ্য নিশ্চিতভাবেই থার্টিফার্স্ট ছিলো না। তখন আজকের দিনের মতো ওরকম কোনো উৎসব ঢাকা শহরে খুবই কম হতো। এসবের প্রচলন হয় আরো অনেক পরে। অভিজাত পাড়া হিসেবে খ্যাত ধানমণ্ডি-গুলশান-বনানীতে কেউ কেউ বিচ্ছিন্নভাবে এটা করতো। ঐ সময় ৩১শে ডিসেম্বর, বছরের শেষ রাতে পুলিশকেও বাড়তি কোনো দায়িত্ব পোহাতে হতো না। আর সব দিনের মতোই ঢাকা শহর ঘুমিয়ে পড়তো রাত দশটা-এগারোটার পর। আমাদের মতো রাতের ডিউটি যাদের ছিলো তারা অন্য সব রাতের মতোই একটা লক্কর-ঝক্কর পুলিশের গাড়ি নিয়ে থানার চৌহদ্দির মধ্যে টহল দিতো ভোর পর্যন্ত।

ঐদিন হায়দারভাই আর আমার দু-জনেরই নাইট-শিফট ছিলো। রাত ন-টার পর একটা পুলিশ জিপ আর দু-জন কনস্টেবল নিয়ে আমরা টহল দিতে বেরিয়ে পড়লাম।

"ভাই, এই থার্টি ফার্স্ট জিনিসটা কি?"

কথাটা শুনে হায়দারভাই স্থিরচোখে তাকালেন আমার দিকে। "কে বলছে তোমাকে?"

"এই তো, একজন বললো।" রামজিয়ার কথাটা বললাম না। পাছে হায়দারভাই টিটকারি মারা শুরু করেন সেই ভয়ে।

"৩১শে ডিসেম্বরের রাতে যে পার্টি করা হয় ওটাই থার্টি ফার্স্ট।" বিজ্ঞের মতো বললেন তিনি। তার ভাবভঙ্গিই বলে দিচ্ছিলো বিষয়টা সম্পর্কে ভালোই জ্ঞান রাখেন।

"এই থার্টি ফার্স্ট পার্টিতে কি করে লোকজন?"

সিগারেটের ধোঁয়া গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে ছেড়ে দিয়ে মুখ বাঁকিয়ে তিনি বললেন, "ওয়েস্টার্ন কালচার, বুঝলে। কিছু বড়লোক এটা আমদানি করেছে এ দেশে। সারা রাত মওজ-ফুর্তি করে, মদ খায়!"

gronthagaar.blogspot.com

কথাটা শুনে আমার বিশ্বাস করতেও কষ্ট হলো। মদ খায়?! রামজিয়া বলেছিলো বেশ খাওয়া-দাওয়া হবে–এই কি সেই খাওয়া-দাওয়া?

"শুধু মদ খায়?"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন তিনি। "ইয়াং ছেলেপেলেরা মদ-বিয়ার খেয়ে আড্ডাবাজি করে, ইংরেজি গান শোনে, নাচানাচি করে। পুরাই তেলেসমাতি কারবার, বুঝলে? নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সব!"

আমার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। হায়দারভাই যা বললেন তার সাথে রামজিয়াকে মেলাতে কষ্ট হচ্ছিলো আমার। ভীষণ কষ্ট! থার্টি ফার্স্ট যদি নষ্টামি হয়ে থাকে তাহলে তার সাথে আর যাই হোক রামজিয়া শেহরিনের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। কিন্তু আজ বিকেলে সে নিজেই আমাকে ফোন করে আমন্ত্রণ দিয়েছে। স্পষ্ট করেই বলেছে, রাত এগারোটার পর চলে আসতে, তার কাজিন আর বন্ধুরা থার্টি ফার্স্ট করবে!

"এসব অনুষ্ঠান কয়টার দিকে শুরু হয়, ভাই?" মলিন কণ্ঠে জানতে চাইলাম আমি, আসলে নিশ্চিত হতে চাইছিলাম।

আবারো একগাল ধোঁয়া ছেড়ে তিনি বললেন, "এগারোটা-বারোটা থেকে শুরু হয়...চলে সারা রাত।"

মিলে যাচ্ছে! রামজিয়া আমাকে এই সময়েই আসতে বলেছে।

"এই যে, বাড়িগুলো দেখছো," ধানমণ্ডির আবাসিক এলাকার বাড়িগুলোর দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। "এসব বাড়িতে আজ থার্টিফার্স্ট হবে।"

"সব বাড়িতে?" বিস্মিত হয়ে বললাম।

"সব বাড়িতে না, কিছু কিছু বাড়িতে।"

আমি থম মেরে বসে রইলাম।

"এগুলো হলো বড়লোকের নষ্ট পোলাপানদের আমোদ-ফূর্তির পার্টি। একটু পরই দেখবে কিছু ইয়াং ছেলেমেয়ে গাড়ি নিয়ে ঢুকছে কোনো বাড়িতে।"

আমোদ-ফূর্তি! নষ্ট পোলাপান! মদ!

কোনোভাবেই আমি রামজিয়াকে এসবের সাথে মেলাতে পারছিলাম না।

"সবাই মদ খাবে?"

আমার দিকে না তাকিয়েই জবাব দিলেন হায়দারভাই, "হুম। সবাই খাবে। না খেলে পার্টি হবে নাকি, আজব! থার্টিফার্স্ট মানেই মদ্যপান। বুঝলে?" কথাটা শেষ করে বাঁকাহাসি দিলেন। "আমি মদ খাই দুঃখে আর

gronthagaar.blogspot.com

এরা খায় ফূর্তি করার জন্য। আরে, নতুন বছর আসবে তো তোর কী? ক্যালেন্ডারের পাতা ওল্টা...এটা নিয়ে এতো আদিখ্যেতা দেখানোর কী আছে! পহেলা বৈশাখে তো হালখাতা দিয়ে অনুষ্ঠান করে, তোরা কী দিয়ে করিস? বাল খাতা দিয়ে?" বাঁকাহাসি দিলেন তিনি।

গাড়িতে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম আমি। সেই প্রথম আমার মধ্যে একটা পরিবর্তন এলো—মদ্যপান আসলে অতোটা খারাপ কিছু না। হায়দারভায়ের মতো ভালোমানুষ খায়, তারচেয়েও বড় কথা রামজিয়া শেহরিনও থার্টিফার্স্টের সময় এটা চেখে দেখে। কেবলমাত্র আমার মতো গ্রাম থেকে উঠে আসারা এটাকে খারাপ মনে করে।

"কি মিয়া, চুপ মেরে আছো কেন?"

হায়দারভায়ের কথায় সম্বিত ফিরে পেলাম। "না, মানে..." একটু থেমে আবার বললাম, "আপনারা যে কেন মদ খান সেটা বুঝতে পারি না। এসব জিনিস খেয়ে কী হয়? আমার তো মনে হয় পুরাই ফালতু একটা জিনিস।"

আমার কথা শুনে হো হো করে হেসেন উঠলেন এসএম হায়দার। "এটা যদি ফালতু জিনিস হয় তাহলে পুরো জিন্দেগিটাই ফালতু, ব্রাদার।"

মাথা দোলালাম আমি। "একটা ফালতু কথা বললেন।"

"তুমি তো কখনও খাওনি, কেমনে বুঝবে এ জিনিসের মর্যাদা? একবার খেয়ে দেখো, তারপর এইসব বোলো।"

"থাক, আমার দরকার নেই, আপনিই খান।"

কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বলে উঠলেন হায়দারভাই, "এই যে তুমি বিভিন্ন লেখকদের বই পড়ো, তাদেরকে এতো সম্মান করো, তুমি কি জানো, এরা প্রত্যেকেই মদ খেতো?"

আমি সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালাম। "সবাই খেতো?"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন তিনি। "আলবৎ খেতো। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে নজরুল...সবাই। কে খেতো না সেটাই বলো!"

রবীন্দ্রনাথ খেতেন? খেতেই পারেন, জমিদার ছিলেন। নজরুল? তার মতো বাউণ্ডুলে জীবন-যাপন করা কবির পক্ষে সেটা বেমানান নয়। অন্য যারা আছে তারাও হয়তো খেতো।

মদ সম্পর্কে বাজে ধারনাটি আক্ষরিক অর্থেই রাতারাতি পাল্টে গেলো আমার। এ নিয়ে নতুন করে ভাবতে শুরু করে দিলাম। তখনও ঘুণাক্ষরে বুঝতে পারিনি একটু পরই সেই জিনিসটার আস্বাদন করবো প্রথমবারের মতো!

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

এমন নয় যে, হায়দারভাই আমাকে জোর করে মদ্যপান করিয়েছিলেন, আবার এমনও নয়, আমি খুব আগ্রহভরে এটা চেখে দেখেছি। ব্যাপারটা কেমন করে জানি হয়ে গেছিলো।

মাঝরাতের দিকে আমাকে চুপ মেরে থাকতে দেখে হায়দারভাই বলেছিলেন, "একটু চেখে দেখবে নাকি?"

সত্যি বলতে, আমি সঙ্গে সঙ্গে না করে দেবার মতো মানসিক অবস্থায় ছিলাম না ঐ রাতে। হাজার হলেও রামজিয়া শেহরিনও এই জিনিস খায়!

যাই হোক, রাত দেড়টার দিকে টহল দলকে বিশ্রামে রেখে হায়দারভাই আমাকে এক ফুটবল ক্লাবে নিয়ে গেলেন। ওখানকার প্রায় সবাই তাকে ভালো করেই চেনে। বোঝা গেলো নিয়মিতই আসেন তিনি। সেই প্রথম আমি জানতে পারলাম, ফুটবল ক্লবাগুলোতে রাতের বেলায় মদ-বিয়ারের সমারোহ চলে। এর আগে আমি জানতাম, ক্লাবগুলোতে জুয়া খেলা, হাউজি খেলা প্রকাশ্যে চলে, আর এটা তাদের নিজস্ব ইনকামের একটি সোর্স। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারিবাহিনী বিষয়টা জেনেও না জানার ভান করে থাকে উপরের নিদের্শে। বিনিময়ে তারা কিছু সেলামিও পেয়ে থাকে নিয়মিত।

ক্লাবের এককোণে দুটো চেয়ার নিয়ে বসে পড়ি আমরা। প্রথমবার হিসেবে হায়দারভাই আমাকে মদ না দিয়ে বিয়ার দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু ঐদিন বিয়ার শেষ হয়ে যাওয়ায় শুধু হুইস্কি আর ভদকা ছিলো। অগত্যা প্রথমবারের মতো হুইস্কি দিয়ে মদের আস্বাদন নিলাম। বলা ভালো, প্রথম অভিজ্ঞতা হিসেবে ওটা ছিলো খুবই জঘন্য। এমন তেতো পানি কেবল ছোটোবেলায় মামির দেয়া চিরতার রসের সাথেই তুলনীয় হতে পারে। নাক চেপে চিরতার রস খাওয়া যায় কিন্তু মদ নামক তরল পদার্থ আমার গলা দিয়ে নেমে যাবার সময় প্রায় বমি হবার উপক্রম হয়েছিলো, পৌরুষের অপমাণ হবে বলে জোর করে চেপে রেখেছিলাম সেটা। হায়দারভাই নিশ্চয় আমার চোখমুখ দেখে ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। তিনি একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, একটু একটু করে চুমুক দিয়ে যেন খাই।

নিঃসঙ্গভাবে মদ্যপান করলে কী ধরণের অনুভূতি হয় সেটা আমি পরবর্তিতে বুঝেছিলাম কিন্তু সঙ্গি থাকলে মদ্যপানরত ব্যক্তির আচরণ কেমন হয় সেটা ঐদিন আবিষ্কার করি।

এসএম হায়দার, যাকে থানার সবাই ভয় করে চলে তার কড়া মেজাজ আর অংশত মুক্তিযোদ্ধা হবার জন্য, সেই লোক মদ্যপানের এক পর্যায়ে শিশুর মতো আচরণ করতে শুরু করলেন। তার যতো দুঃবোধ যেন উড়ে এসে জুড়ে বসলো, আর তিনি সে-সব উগলে দিতে শুরু করলেন আমার উপরে।

gronthagaar.blogspot.com

আমার সাথে হায়দারভায়ের ঘনিষ্ঠতা থাকলেও ঐদিনের আগে আমি জানতে পারিনি স্ত্রির সাথে উনার ঝামেলটা আসলে কী নিয়ে। নতুন বছরের আগমনের দিনটায় আমি এই সত্যটা জানতে পারলাম–একটা ফুটফুটে শিশু।

বিয়ের চার বছর পরও তাদের কোনো বাচ্চা-কাচ্চা হচ্ছিলো না। এ নিয়ে অবশ্য হায়দারভায়ের তরফ থেকে কোনো সমস্যা ছিলো না কিন্তু তার স্ত্রি মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন, আর ঝামেলার শুরু তখন থেকেই। বেচারি হয়তো নিজেকে বন্ধ্যা নারী হিসেবে ভাবতে আতঙ্কিত বোধ করতেন। দু-জনের কারোর সমস্যা নেই, যেকোনো সময় এটা ঘটতে পারে, ডাক্তারের এমন আশ্বাসের পরও হায়দারভায়ের স্ত্রি নানা রকম কবিরাজি আর পীর-ফকিরের কাছে ধর্না দিতে শুরু করেছিলেন। কুসংস্কারমুক্ত মানুষ হিসেবে হায়দারভাই এটা মেনে নিতে পারেননি। স্ত্রির দেয়া পড়া-পানি খেতে অস্বীকার করেন, তাবিজ পরার ব্যাপারে ঘোরতর আপত্তি তার, শ্বশুড়বাড়ির লোকজনের কাছে কামেল বলে খ্যাত পীড়-ফকিরের কাছে যেতেও রাজি হন না–এইসব নিয়ে নিত্য কলহ লেগে থাকতো তাদের। তার সাথে যুক্ত হতো হায়দারভায়ের মদ্যপানের বদঅভ্যেস আর বদমেজাজ।

“বুঝলে, তুমি যদি ঝগড়া করতে চাও তাহলে সবকিছু নিয়েই ঝগড়া করতে পারবে,” মাতাল হয়ে বলেছিলেন তিনি। “ডালে লবন বেশি দিয়েছো, কিংবা একদমই দাও নি–এটা নিয়েও তুমুল ঝগড়া করা সম্ভব।”

কথাটা শুনে আমি মুখ টিপে হেসেছিলাম।

“এই বঙ্গে কতো রঙ্গ হয়, ব্রাদার,” একটা বিশ্রি ঢেকুর তুলে বলেছিলেন। “আমার তো মনে হয় বাংলার ইতিহাসে শুধুমাত্র ডালে বেশি লবন দেয়া আর না দেয়া নিয়ে ঝগড়া করে অনেক পরিবার ভেঙে গেছে। তিন-চারটা খুনও হয়েছে মনে হয়। গত বছর ইত্তেফাকে এরকম একটা নিউজ পড়েছিলাম, স্বামির হাতে স্ত্রি খুন! ডালে লবন না দেয়ার কারণে সৃষ্ট কলহে এক পর্যায়ে ক্ষিপ্ত স্বামি বটি দিয়া স্ত্রির মাথায় কোপ মারিয়া বসে!” একেবারে ইত্তেফাকের সাধুভাষায় আবৃত্তি করলেন তিনি।

তার বলার ভঙ্গি দেখে-শুনে খুব হাসি পাচ্ছিলো আমার। “আপনিও কি এরকম বিষয় নিয়ে ঝগড়া করেন নাকি?” হাসতে হাসতেই বলেছিলাম তাকে।

তর্জনি উঁচিয়ে দু-পাশে মাথা দুলিয়ে কথাটা উড়িয়ে দিয়েছিলেন এসএম হায়দার। “না, ব্রাদার...আমি এখনও অতোটা কাণ্ডজ্ঞানহীন হইনি। নীলু মা হবার জন্য পাগল হয়ে গেছে। কী করে না করে তার নেই কোনো ঠিক। সব

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

সময় মেজাজ খিটখিটে থাকে তার...বুঝলে? সে মনে করে মদ খেলে পুরুষমানুষের বাচ্চা-কাচ্চা হবার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়।"

"তাই নাকি? ভাবি আসলেই এটা বলে?" আমি একটু অবাকই হলাম।

মাথা নেড়ে সায় দিলেন তিনি। "হুম।" তারপর চারপাশে তাকালেন। "আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, এখানে যারা আছে তাদের একেকজনের তিন-চারটা করে বাচ্চা আছে ঘরে।" আবারো একটা ঢেকুর বের হয়ে এলো ভেতর থেকে। "কিন্তু আমার ময়নাপাখিটারে কে বোঝাবে!"

"আশ্চর্য, আপনাদের বিয়ের মাত্র চার বছর হয়েছে, এখনও অনেক সময় হাতে আছে...ভাবিকে এটা বোঝান।"

বাঁকাহাসি দিয়েছিলেন তিনি। "তাকে আমি বোঝাই, সে-ও কয়েকটা দিন ঠিক থাকে তারপর বাপের বাড়ি আর শ্বশুড়বাড়ির লোকজনের খোঁচা, টিপ্পনি খেয়ে মাথা আউলা-ঝাউলা হয়ে যায়।"

বাঙালি পরিবারের এমন চিত্র আমার কাছে মোটেও অচেনা নয়। আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কুটনা-টাইপের মহিলাদের এ নিয়ে কথা শোনানো বাঙলার সংস্কৃতির অংশ হয়ে গেছে। বিষয়টা বুঝতে পেরে চুপ মেরে রইলাম।

"তোমার ভাবি আবার খুব অভিমানি, বুঝলে? মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলতে পারে না তাই সব রাগ ঝাড়ে আমার উপরে।"

"আপনি যদি ব্যাপারটা বুঝতেই পারেন তাহলে চুপচাপ মেনে নিলেই হয়, ঝগড়া করতে যান কেন?"

ঢুলু ঢুলু চোখে আবারো বাঁকাহাসি দিয়ে আমার দিকে তাকালেন তিনি। "ওই মিয়া...তুমি কি আমারে পয়গম্বর ভাবো নাকি, অ্যা? এই যে তোমারে বললাম আমি সব বুঝি এটা তো তখন মাথায় থাকে না, ঝগড়া-ঝাটির পর মাথায় আসে।"

কথাটা শুনে আমি হেসে ফেলেছিলাম আবারো। "চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে!"

হায়দারভাইও হেসে ফেললেন।

"এরপর থেকে ভাবি ঝগড়া করতে চাইলেও আপনি করবেন না, ঠিক আছে?"

আমার দিকে স্থিরচোখে চেয়ে রইলেন। "এটা কি অর্ডার নাকি রিকোয়েস্ট?"

"উমম...অর্ডার।"

gronthagaar.blogspot.com

"ওকে, বস্!" তিনি হুট করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, মিলিটারি কায়দায় মেঝেতে জোরে পা ঠুকে স্যালুট দিলেন আমাকে। "যদি আপনার এই মূল্যবান আদেশের কথাটা তখন আমার মনে থাকে তো।"

তাকে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিলাম। এসএম হায়দারের মাতলামি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাক সেটা আমি চাইনি।

"সমস্যা হলো," টেনে বললেন তিনি, "তখন কিছুই মনে থাকে না। শুধু মাথায় থাকে, আমার সাথে এটা করলো! আমাকে এটা বললো! এই শালি তো আমাকে একদমই ভালোবাসে না! একটুও না! এক ফোঁটাও না!" উনি তর্জনি আর বুড়ো আঙুল একসাথে করে ফোঁটার আকৃতি দেখানোর চেষ্টা করলেন।

আমি কপালের বামপাশ চুলকালাম। এই মাতালকে নিয়ে বাকি রাতটা কিভাবে টহল দেবো সেটাই ভাবতে লাগলাম।

"আরে, তুমি তো কিছুই খাওনি...মাত্র এক পেগ! ধুর!" এবার আমার গ্লাসের দিকে নজর দিলেন তিনি, "এক পেগে কিছু হয়?!" মাথা দোলালেন। "আমার বাল হয়!"

মনে মনে প্রমাদ গুণলাম। এসএম হায়দারের মাতলামি বেড়েই চলেছে। "আমার ভালো লাগেনি, খুবই বিশ্রি লেগেছে।"

"মেয়েমানুষের মতো কথা বলছো কেন? দু-তিন পেগ পেটে না গেলে এই জিনিসের মাজেজা বুঝবে নাকি, অ্যা?"

"ওরে বাবা!" দু-হাত তুলে আত্মসমর্পন করার ভঙ্গি করলাম আমি। "আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

সত্যি, সেদিন আমার পক্ষে এক পেগের বেশি পান করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু ঐ ঘটনার কয়েক মাস পরই যে আমি পেগের পর পেগ গলাধকরণ করতে শুরু করবো সেটা কে জানতো।

এখন নিজের ঘরে বসে একা একা মদ্যপান করছি আর ভাবছি, আজ যদি হায়দারভাই জানতেন, আমি মদ্যপান শুরু করলে চার-পাঁচ পেগের নীচে করি না তাহলে কী ভাবতেন?

বুকের ভেতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো শুধু।

gronthagaar.blogspot.com

অধ্যায় ২৩

বয়স বাড়ছে, স্মৃতি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। কিছু কিছু ঘটনা চিরতরের জন্য মুছে গেছে আমার স্মৃতিভাণ্ডার থেকে। কিছু ঘটনা, ছবি অস্পষ্ট হয়ে উঠছে দিনকে দিন। এটা খুবই পীড়াদায়ক। বিশেষ করে আমার মতো পঞ্চাশ পেরোনো কোনো নিঃসঙ্গ মানুষের কাছে এটা যেন নিঃস্ব আর রিক্ত হয়ে ওঠার মতো একটি ব্যাপার।

এই বয়সে পুরনো স্মৃতিগুলোই একমাত্র অবলম্বন হয়ে ওঠে। যেটা আপনি ভুলে গেছেন সেটা নিয়ে কোনো খেদ থাকবে না কিন্তু অস্পষ্ট স্মৃতির মতো বিভ্রান্তিকর কিছু নেই। এটা যেন অর্ধেক পড়া গল্পের মতো। কিংবা এমন একটা বই পড়ে আবিষ্কার করলেন যার শেষ কয়েকটি পৃষ্ঠা নেই। অথবা মাঝখানের কিছু পাতা ছেঁড়া, কিছু লাইন অস্পষ্ট।

তবে আমার প্রথম মদ্যপানের দু-দিন পরের ঘটনাটা স্পষ্ট মনে আছে এখনও। বিকেলের দিকে হায়দারভাইকে খুবই মনমরা হয়ে থাকতে দেখে ভেবেছিলাম ভাবির সাথে তার ঝগড়া পর্বটি বোধহয় দীর্ঘ হয়েছে।

"না রে ভাই," কারণটা জিজ্ঞেস করলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন তিনি, "ঝগড়া হয়নি।"

"তাহলে মুখটা এমন করে রেখেছেন কেন? ঘটনা কি?"

আমার মুখের দিকে তাকালেন এসএম হায়দার। "কালকে সিরাজ শিকদারকে পুলিশ গ্রেফতার করেছিলো, জানো তো?"

মাথা নেড়ে সায় দিলাম আমি। এটা আমাদের থানা কেন সারা দেশের মানুষ জেনে গেছে এতক্ষণে। কুখ্যাত-বিখ্যাত যেভাবেই দেখা হোক না কেন, সিরাজ শিকদার আর তার সর্বহারা পার্টি তখন বেশ আলোচিত।

"একটু আগে খবর পেলাম ওরা ওকে মেরে ফেলেছে।"

"কি?" আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না। "কারা মেরে ফেলেছে?"

"ওরা।"

ওরা বলতে হায়দারভাই যাদের দিকে ইঙ্গিত করছেন সেটা আমি ভালো করেই জানি। সত্যি বলতে দেশের মানুষের কাছে 'ওরা' বেশ ভালোভাবেই পরিচিত ছিলো। সরকারের লোকজন। আইনত বৈধ এবং রক্ষাকারী বাহিনী!

gronthagaar.blogspot.com

"এজন্যে আপনি এরকম মুখ ভার করে রেখেছেন?" আমি একদম নিশ্চিত ছিলাম এটাই একমাত্র কারণ নয়।

"এই ঘটনার পর শেখসাহেব পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে কী বলেছেন, জানো?"

"না," ছোট্ট করে জবাব দিলাম আমি।

" 'কোথায় সেই সিরাজ শিকদার!' " একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি।

কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে আমি যুক্তি হাতরে বেড়ালাম। "দেখেন, শিকদারের পার্টি বঙ্গবন্ধুর দলের অনেককে খুন করেছে, সরকারকে অনেক ডিস্টার্ব করেছে, এটা নিশ্চয় আপনি অস্বীকার করবেন না?"

আমার কথা শুনে মাথা দোলালেন হায়দারভাই। "ব্রাদার, ব্যাপারটা তুমি এভাবে জাস্টিফাই কোরো না। লোকটার এইসব কর্মকাণ্ডের জন্য পুলিশ তো তাকে গ্রেফতার করেছিলোই, চাইলে খুব ভালোভাবেই তার বিচার করা যেতো, সেটা না করে এভাবে?" আক্ষেপে মাথা দোলালেন তিনি। "তাহলে কোর্ট-কাচারি রেখে কী লাভ? আমাদেরই বা কী দরকার? ওরা তো আছেই, ধরে ধরে নিয়ে আসবে আর ঠাস্ ঠাস্ বিচার করে করে দেবে!"

এ কথার বিরুদ্ধে কোনো যুক্তি খাটে না। হায়দারভায়ের দুরদৃষ্টি নিয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিলো না।

"সিরাজ শিকদারকে যদি জেলে ভরে বিচার করতে শুরু করতো সরকার," কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর আমি উপযুক্ত যুক্তি পেয়ে গেলাম, "তাহলে তার পার্টির লোকজন আরো অনেক বেশি খুন-খারাবি শুরু করে দিতো, গুরুত্বপূর্ণ কাউকে জিম্মিও করতে পারতো নেতাকে জেল থেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য, সে-কারণেই বোধহয়..."

আবারো মাথা দোলালেন এসএম হায়দার। "এটা তো তোমার আশঙ্কা...ভয়...তাই বলে কি তুমি এরকম কাজ করে ফেলবে? এভাবে যুক্তি দিয়ে সব ধরণের খুন-খারাবি আর অপরাধকেই জাস্টিফাই করা যাবে, ব্রাদার। এসব যুক্তিকে বহু আগে খনাবিবি সুন্দর করে বলে গেছে," একটু থেমে আবার বললেন, "খলের ছলের অভাব হয় না।" টেবিলের উপর ঘুষি মেরে আবার বললেন তিনি, "এটা স্বাধীন দেশের জন্য মোটেও ঠিক হলো না। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা না গেলে কিচ্ছু হবে না। কোনো মন্ত্র আর তন্ত্র কাজ করবে না। সব মুখ থুবরে পড়বে। আমার শেখসাহেব যতো বড় নেতাই হয়ে থাকুক না কেন, তিনিও পারবেন না।"

"কী পারবেন না?" কথাটা আমার মুখ দিয়ে বের হয়ে গেলো।

"তিনি যেটা চাইছেন সেটা করতে।"

gronthagaar.blogspot.com

কথাটা আমি মেনে নিতে পারলাম না। "এই সামান্য একটা ঘটনা থেকে আপনি এতো বড় কিছু বলতে পারেন না।"

"এই হলো সমস্যা," বলে উঠলেন হায়দারভাই, "তোমরা ভাবো আলুর বস্তা ফুটো করে একটা আলু বের করে নিলে কী আর এমন ক্ষতি!" মাথা দোলালেন আবারো। যেন নাদান আর অবুঝদের মাঝে আছেন তিনি। "একটা আলু বের করে নেয়া মানে সব আলু বের করার রাস্তাটা তৈরি হয়ে গেলো। এটা বুঝতে হবে।"

আমি আর যুক্তি দিলাম না। দিলেও কাজ হবে না জানতাম।

আবারো ঐ সময়কার স্মৃতিগুলো হাতরাতে শুরু করলাম। বেশ বেগ পেতে হচ্ছে আমাকে। হল্‌ফ করে বলতে পারছি না যেটুকু মনে আছে সেটুকু ঠিক তখনকার ঘটনা নাকি তার আগের।

ঠিক এমন সময় আমার ফোনটা বেজে উঠলে যারপরনাই বিরক্ত হলাম। সাধারণত আমাকে কেউ সকালের দিকে ফোন করে না, আর যদি কেউ করে সেটা তপুই করবে। এই তপু হলো আমার প্রকাশক সালসাবিল আহমেদ। সমবয়সি বলে কাজ করতে করতে আমাদের বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে একদমই সময় লাগেনি।

স্মৃতি হাতরানো বাদ দিয়ে ফোনটা তুল নিলাম। রিডিংগ্লাস ছাড়া আমার আন-স্মার্ট ফোনের ছোট্ট ডিসপ্লেতে ভেসে ওঠা কলার আইডি পড়তে গিয়ে হিমশিম খেলাম। ফোনটা একটু দূরে নিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম আমি।

রামজিয়া!

সঙ্গে সঙ্গে কলটা রিসিভ করলাম। "হ্যালো?" আমার মুখে যে চওড়া হাসি ফুটে উঠলো সেটা ফোনের ওপাশে যে আছে সে দেখতে পাচ্ছে না, তারপরও কয়েক মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিলো হাসিটা চেপে যাই।

"গুড মর্নিং...কখন উঠেছো? ব্রেকফাস্ট করেছো?"

"এই তো...একটু আগে করলাম। তুমি?"

"আমি আর্লি রাইজার। ছ-টার মধ্যে বিছানা ছাড়ি, তারপর হালকা ইয়োগা করে ব্রেকফাস্ট করে নেই। তুমি নিশ্চয় দেরি করে ওঠো?"

"ঠিক তা না। আসলে আমার কোনো রুটিন নেই। কখনও খুব সকালে উঠে পড়ি, আবার লিখতে লিখতে বেশি রাত হয়ে গেলে পরদিন দেরি করে উঠি।"

"লাস্ট নাইট কি লিখেছো?"

gronthagaar.blogspot.com

"না। লেখালেখি আপাতত বন্ধ। তোমাকে যেটা পড়তে দিয়েছি ওটা রিটার্ন পেলে ঠিকঠাক করবো।"

"চিন্তা কোরো না, খুব জলদিই শেষ করবো। লেখাটা পড়ে খুবই ভালো লাগছে," আমাকে আশ্বস্ত করে বললো রামজিয়া। "কাল রাত দুটো পর্যন্ত পড়েছি। অনেকদিন পর একটানা এতোক্ষণ পড়লাম।" একটু বিরতি দিলো সে। "আসলে লেখাটা না পড়ে থাকতে পারিনি। নিজেদের গল্প বলেই হয়তো..." কথাটা শেষ করলো না।

"এতো তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই," বললাম তাকে, "আস্তে ধীরে পড়ো।"

"তিন-চারদিন পর দিলে হবে তো?"

"এক সপ্তাহ পর দিলেও হবে," হেসে বললাম আমি।

"ওকে," তারপর আবারো বিরতি। "যে জন্যে ফোন করেছিলাম...মিলির এক আত্মীয়কে বলেছি মিনহাজের ঠিকানা জোগাড় করে দিতে। ও নাকি সেলফান ব্যবহার করে না, ভাবা যায়? এ যুগে একটা মানুষ ফোন ছাড়া থাকে কী করে। কারো সাথে খুব একটা যোগাযোগও নেই। ঢাকায় খুব কম আসে।"

"ফোন নাম্বার যদি না থাকে তাহলে তো কিছু করার নেই, ঠিকানাটা পেলেও কাজ হবে।"

"আশা করি দুয়েকদিনের মধ্যেই জোগাড় করে দিতে পারবো।"

"অফিসে যাবে কখন?" জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

"দশটার পর যাই। তুমি কি করো সারাদিন? ঘরেই থাকো নাকি বাইরে যাও-টাও?"

"ঘরেই বসে লিখি। সপ্তাহে দুয়েকবার সন্ধ্যার পর কখনও আড্ডা দিতে যাই...এই তো।" নিজের কাছেই কথাটা কেমন একাকিত্বের হাহাকার বলে মনে হলো।

"তাহলে কাল বিকেলের পর বাসায় চলে আসো। চা খেতে খেতে আড্ডা দেয়া যাবে। আজকে সন্ধ্যার পর আমাকে আবার একটা প্রোগ্রামে যেতে হবে।"

ভালো করেই জানি, তার কাছ থেকে এমন আমন্ত্রণ পেলে আমি ফিরিয়ে দিতে পারবো না। "ঠিক আছে।" ছোট্ট করে বললাম।

"আচ্ছা," যেন কোনো কথা মনে পড়ে গেছে তার, "আমি যদি তোমার

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

লেখায় কোনো মিস-ইনফর্মেশন পাই...আফটার অল অনেক আগের কথা...তোমার মেমোরিও খুব উইক।"

"বুঝতে পারছি কি বলতে চাইছে," বললাম তাকে। "এরকম কিছু পেলে নির্দ্বিধায় তুমি কারেকশান করে দিও। এ নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগার কোনো দরকার নেই। ঠিক আছে?"

"থ্যাঙ্কস," আমি নিশ্চিত সে হেসেই বলেছে কথাটা। "কারেকশানটা করবো কিভাবে? আমি তো এডিটর না, ওরা কিভাবে কারেকশান করে সেটা তো জানি না।"

"সমস্যা নেই। যে শব্দ বা লাইন কারেকশান করতে হবে সেটার নীচে আন্ডারলাইন করে দিও, তারপর লেখার বামদিকে যে একটু স্পেস আছে ওখানে ফুটনোটের মতো কারেকশানটা লিখে দিলেই হবে।"

"তাই?" মনে হলো বিস্মিত হয়েছে। "এতো সহজ?"

"হুম...এতোটাই সহজ।"

"ওকে। তাহলে কাল বিকেলে চলে এসো, কেমন?"

"আচ্ছা।"

"বাই।"

একেবারে উচ্ছল তরুণীদের মতো করেই বললো কথাটা।

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

অধ্যায় ২৪

অমানিশা

থার্টিফার্স্ট নাইটের পর বেশ কয়েকদিন রামজিয়ার সাথে আর আমার যোগাযোগ হয়নি। কিন্তু যখন দেখা হলো তখন আমাদের জন্য সময়টা মোটেও সুখকর ছিলো না। ঐদিনটির কথা আমি কখনও ভুলবো না। আমার মনের গহীনে থাকা সুদৃঢ় বিশ্বাস টলে গেছিলো। ভয়ঙ্কর রকমের হতাশায় নিপতিত হয়েছিলাম আমি। সেই দিনটি যদি আমার জীবনে না আসতো তাহলে হয়তো খুশিই হতাম। এটাও সত্যি, ভয়াল সেই দিনটি না এলে আজ আমি লেখক হয়ে উঠতাম কি-না সন্দেহ।

ঐ দিন ছিলো খুবই মেঘলা, সকাল থেকে সূর্যের দেখা নেই। যেন আসন্ন বিষাদের পূর্বাভাষ দিচ্ছিলো প্রকৃতি! জানুয়ারির শেষে তিন-চারদিনের শৈত্যপ্রবাহ বইছিলো দেশজুড়ে। থানায় বসে থেকে রীতিমতো আমার দাঁতে দাঁত ঠোকাঠুকি হচ্ছে। পুরনো দিনের দালান, চারদিকে বড় বড় অসংখ্য দরজা-জানালা। শীতের হিম শৈত্য হু হু করে ঢুকে পড়ছে ভেতরে। পুলিশের ইউনিফর্মের সাথে দেয়া পাতলা সোয়েটার সেই শীত কাবু করতে পারার কথাও নয়। আমি জবুথবু হয়ে নিজের চেয়ারে বসে থানার পাশে টঙ দোকান থেকে গুঁড়ের চা এনে খাচ্ছিলাম। হায়দারভায়ের চায়ের কাপটা আমার টেবিলের উপর থেকে তখনও ধোঁয়া ছাড়ছে। চা আসার আগেই জরুরি একটা দরকারে ওসিসাহেব নিজের রুমে ডেকে নিয়ে গেছে তাকে। আমি ভাবছিলাম পিরিচ দিয়ে কাপটা ঢেকে দেবো কি-না, এভাবে খোলা থাকলে চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। হায়দারভাই আবার ঠাণ্ডা চা একদম পছন্দ করতেন না।

আমি চায়ের কাপের উপর পিরিচ রাখতে যাবো অমনি চিৎকার-চেঁচামেচি ভেসে এলো ওসির রুম থেকে। হায়দারভায়ের ভরাট কণ্ঠটা চিনতে মোটেও ভুল হবার নয়। চিৎকার করে ওসিকে তিনি গালাগালি করছেন!

সর্বনাশ!

আমি পিরিচ রেখে ছুটে গেলাম ওসির রুমে, সঙ্গে সঙ্গে আরো

gronthagaar.blogspot.com

কয়েকজন কলিগও ছুটে গেলো সেখানে। দরজা দিয়ে ঢুকতেই দেখি অবিশ্বাস্য একটি দৃশ্য।

হায়দারভাই ওসির কলার ধরে তাকে শাসাচ্ছেন! এরইমধ্যে গায়ে হাত তুলেছে কি-না জানি না, আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরে ফেলি। পেছন থেকে জাপটে ধরে টেনে নিয়ে আসি ওসির ঘর থেকে।

"ছাড়ো আমাকে! শালার কত্ত বড় সাহস! আমাকে..." দম ফুরিয়ে হাপাতে লাগলেন তিনি।

"ভাই, আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেলো? এসব কী করছেন?"

থানার কনস্টেবল আর বাকি পুলিশের দলটি হা করে চেয়ে আছে আমাদের দিকে। তারা হায়দারভাইকে সমীহ করে, তার বদমেজাজের কারণে ভয়ও করে। ওসিসাহেবও তাকে খুব একটা ঘাটায় না। তাই বলে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কলার ধরে তাকে শাসানো!

কানে গেলো ক্ষিপ্ত আর অপমানিত ওসি নিজের ঘরে দাঁড়িয়ে গজ গজ করে যাচ্ছে। তার কথায় আমি মনোযোগ দিলাম না। আমার মনোযোগ হায়দারভায়ের দিকে।

"ঘটনা কি, ভাই?"

আমার দিকে হায়দারভাই অগ্নিমূর্তি ধারণ করে তাকালেন। পুলিশের টুপিটা খুলে আছাড় মেরে রাখলেন সামনের একটা টেবিলের উপর। "শূয়োরেরবাচ্চা!"

আমি নিশ্চিত ছিলাম গালিটা আমাকে দেননি। "আরে, কি হয়েছে, বলবেন তো?" তাড়া দিলাম তাকে। বুঝতে পারছিলাম না হঠাৎ করে ওসির উপর চড়াও হওয়ার কারণটা কি।

"কি হয়েছে?!" আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন, যেন তার এই বিশাল ক্ষোভের কারণের মধ্যে আমিও পড়ি! "ওই শালা আমাকে বলে ইমতিয়াজের জামিন আবেদনে বিরোধিতা যেন না করি! কত্ত বড় সাহস, আমাকে এ কথা বলে!"

"কি!" অবিশ্বাসে বলে উঠেছিলাম আমি। কথাটা বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছিলো। আমার কাছে সেটা ছিলো রীতিমতো অসম্ভব একটি ঘটনা। "আপনি এসব কী বলছেন?! উনি কেন আপনাকে এটা করতে বললেন?"

আমার দিকে তাচ্ছিল্যভরে তাকালেন তিনি। তার এমন চাহনির সাথে আমি মোটেও অপরিচিত ছিলাম না কিন্তু এর আগে কখনও আমার সাথে এটা করেননি।

gronthagaar.blogspot.com

"কেন?" রাগে কাঁপছেন তিনি। "তোমার দলের এক নেতা...!" দু-হাত আকাশের দিকে তুলে অঙ্গভঙ্গি করলেন। "সেই মহান নেতা স্বাধীন দেশের পুলিশকে হুকুম করেছে এক খুনি-ধর্ষকের পক্ষে দাঁড়াতে!"

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার কপালে ভাঁজ পড়ে গেলো। বুঝতে বাকি রইলো না ঘটনা কি। ক্ষমতাসীনদের এমন আচরণ তখন নিয়মিত ব্যাপার ছিলো। অনেকেই নিজদলের চোর-বাটপার থেকে শুরু করে, মজুতদার, চোরাকারবারি, খুনি, ডাকাত সবার মাথার উপরেই বটবৃক্ষের মতো ছায়া দিয়ে যাচ্ছিলো। এসব করতে গিয়ে তারা তাদের প্রিয় নেতা আর জন্মভূমির কতো বড় সর্বনাশ করছে সেটা যদি বুঝতো! মাত্র স্বাধীন একটি দেশ, অথচ এইসব দেখে অনেকেই বলতে শুরু করেছে পাকিস্তান আমলই ভালো ছিলো।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো আমার ভেতর থেকে।

"সাহস থাকলে নেতাদের কলার চেপে ধরেন না!" নিজের ঘর থেকে চেঁচিয়ে বললো ওসি।

ফিরে তাকালাম সেদিকে।

"আমার কলার ধরাটা তো খুব সহজ! আমাকেই শুধু গালাগালি করার মুরোদ আছে। পারলে তাদের বাল ছিড়েন গিয়ে! বুঝবো কেমন মুক্তিযোদ্ধা!"

হায়দারভাই কথাটা শুনে কিছু বলতে যাবেন অমনি আমি তার হাতটা ধরে ফেললাম। "ভাই, আপনার পায়ে পড়ি! প্লিজ! মাথা গরম করবেন না।" টানতে টানতে তাকে থানার বাইরে নিয়ে এলাম।

ক্ষুব্ধ এসএম হায়দারকে প্রশমিত করার জন্য একটা সিগারেট বের করে দিলাম কিন্তু উনি সিগারেটটা হাত নেড়ে সরিয়ে দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

"ওই শালার ওসি ঠিকই বলেছে," উদাস হয়ে বাইরের রাস্তার দিকে চেয়ে তিক্তমুখে বললেন, "আমরা পুলিশ...আমাদের কোন ক্ষমতা নেই। হুকুমের গোলাম আমরা! এই বালের চাকরি করার চেয়ে গুলিস্তানে গিয়ে হকারগিরি করাও অনেক ভালো!"

কথাটা নির্মম হলেও সত্য ছিলো সে-সময়। সত্যি বলতে, আজ এতোগুলো বছর পরও এই কথাটা যেন আরো বেশি সত্য হয়ে উদ্ভাসিত হচ্ছে আমাদের সবার কাছে। কোন পরিবর্তন নেই। যেন স্থায়ি এক অমানিশা ভর করেছে আমাদের আকাশে!

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

অনেকক্ষণ চুপ রইলাম আমরা, কেউ কিছু বললাম না। হায়দারভায়ের দৃষ্টিতে শূন্যতা। আমি মাথা নীচু করে রাখলাম। কারণ আমি সরকারী দলের একনিষ্ঠ সমর্থক।

হায়দারভাই তখনও উদাস হয়ে শূন্যে তাকিয়ে আছেন। "যুদ্ধের সময় বহুবার মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছিলাম," অবশেষে শান্তকণ্ঠে বললেন তিনি। "এখন মাঝে মাঝে মনে হয় মরেই গেলেই ভালো হতো!"

কথাটা আমার বুকে শেলের মতো বিধঁলো। একজন মুক্তিযোদ্ধা দেশ স্বাধীন করার পর এ কথা বলছেন!

"সরকারি দলের নেতা খুনির পক্ষে দাঁড়ায়!" মাথা দোলালেন আবারো, "বোঝো এবার, এই দেশের ভবিষ্যৎ কী!"

আমি কোন জবাব দিলাম না। তার সাথে সব সময় এসব নিয়ে তর্ক করি। বার বার হেরেও যাই। হায়দারভায়ের মতো মানুষের কাছে হেরে যাওয়াতে আমার একটুও খারাপ লাগে না কিন্তু নিজের কাছে হেরে যাওয়ার যে কী কষ্ট সেটা যদি কেউ বুঝতো!

"তাহলে এখন কি হবে, ভাই?" কথাটা আবারো বললাম তাকে। এছাড়া যেন বলার মতো, জানার মতো আর কিছু নেই আমার।

বাঁকাহাসি ফুটে উঠলো তার ঠোঁটে। "আমার যা করার আমি তা করবো। ঐসব হারামখোর নেতাদের হুকুম তামিল করার জন্য দেশটা স্বাধীন হয়নি, আর আমিও নিজেকে তাদের চাকর-বাকর মনে করি না।"

মনে মনে আশান্বিত হয়ে উঠলাম। যাক্‌গে, হায়দারভাই তাহলে ওসি কিংবা নেতার কথা শুনছেন না।

"কিন্তু আমার ক্ষমতা খুবই কম," একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার ভেতর থেকে। "আমি যতো চেষ্টাই করি না কেন, কাজ হবে না।"

"কাজ হবে না, মানে?" আশ্চর্য হয়ে জানতে চাইলাম।

নিরস্ত্র সৈনিকের মতো অসহায় দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে। "ইমতিয়াজ ঠিকই জামিন পেয়ে যাবে।"

"কী!" যারপরনাই অবাক হয়েছিলাম আমি। "কিন্তু আপনি তো বললেন জামিনের বিরোধিতা করবেন?"

বাঁকাহাসি ফুটে উঠলো তার ঠোঁটে। "তাতে কি?"

"আপনি জামিনের বিরোধিতা করলেও কোর্ট তাকে জামিন দিয়ে দেবে?"

উনি আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন আমি পঞ্চম শ্রেনির ছাত্র।

gronthagaar.blogspot.com

“দেশটা কেমনে চলছে তুমি মনে হয় জানো না?” একটু থেমে আবার বললেন, “নাকি ব্লাইন্ড সাপোর্টার হতে হতে সত্যি সত্যি অন্ধ হয়ে গেছো।”

আমি মোটেও অন্ধ ছিলাম না। তবে হায়দারভায়ের সাথে আমার পার্থক্য ছিলো, আমি তখনও পুরোপুরি হতাশ হয়ে পড়িনি। আমার কেন জানি মনে হতো, অচিরেই বঙ্গবন্ধু সব গুছিয়ে আনবেন। উনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। উনাকে ব্যর্থ করার জন্য মাঠে অনেক শক্তিও সক্রিয় আছে। এককালে উনার ঘনিষ্ঠরা জাসদ নামের একটি বিষফোঁড়া তৈরি করেছে, সেই বিষফোঁড়া নিশ্চয় সদ্য স্বাধীন দেশের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে গ্যাংরিন সৃষ্টি করতে পারবে না। তাদেরকেসহ সব অপশক্তির বিরুদ্ধে আবারো আমার নেতা জয়ি হবে–ঠিক যেমনটি পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে তিনি জয়ি হয়েছিলেন।

“আমার মনে হয় এইসব খুব জলদিই বন্ধ হয়ে যাবে,” আস্তে করে বললাম। হায়দারভাই আমার দিকে মুখ তুলে তাকালেন। “মানে, এই যে...নেতা-কর্মিদের উল্টাপাল্টা কাজকারবার...এগুলো তো চলতে দেয়া যায় না, তাই না? এসব বন্ধ হয়ে যাবে, দেখবেন।”

আবারো বাঁকাহাসি ফুটে উঠলো তার মুখে।

“যুদ্ধের পর একটা বিধ্বস্ত দেশ পেয়েছেন উনি...নানান সমস্যা। এসব রাতারাতি ঠিক করা যাবে না, একটু সময় দিতে হবে।”

“ব্রাদার, উনি যখন পাকিস্তানের কারাগার থেকে দেশে ফিরে এসে বললেন, তিন বছর কিছুই দিতে পারবেন না, সেটা সবাই মেনে নিয়েছিলো কিন্তু এই তিন বছরে পাবলিক কি দেখলো?” জবাবের অপেক্ষা না করেই আবার বললেন, “উনার দলের ঘনিষ্ঠজনদের অনেকেই পরিত্যক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কারখানা আর বাড়ি পেয়ে যাচ্ছে! তারা কিন্তু তিন বছর অপেক্ষা করছে না।”

আমি কোন তর্ক করলাম না। তর্ক করার মতো অস্ত্রের মজুদ আমার কাছে খুব একটা ছিলোও না তখন।

“সেটাও কোন সমস্যা হতো না, যদি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা যেত,” আক্ষেপে মাথা দোলালেন এসএম হায়দার। “এই একটা জিনিস করতে কিন্তু টাকা লাগে না। রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট বানাতে টাকা লাগে, স্কুল-কলেজ বানাতে টাকা লাগে, এটা করতে শুধু দরকার হয় ক্ষমতাসিনদের সদিচ্ছা, আত্মত্যাগ আর দুরদর্শিতা। সেটা কি তোমার দলের সবার মধ্যে আছে?”

gronthagaar.blogspot.com

আমি এবারো নিশ্চুপ রইলাম।

"সবাই কিন্তু শেখসাব না, তাজউদ্দিন না।"

হায়দারভায়ের কথাটা যে সত্যি সেটা বঙ্গবন্ধু নিজেও জানতেন। তিনি কি বলেননি, তার চারপাশে চাটার দল? চোরের খনি?

"তাকে আরেকটু সময় দিতে হবে, ভাই," কথাটা আমার হতাশা ছাপিয়ে বের হয়ে গেলো যেন।

"আরে ব্রাদার, তুমি আমি সময় দিলেই কী না দিলেই বা কী...আমরা হলাম আম-পাবলিক। আমারা শুধু তালি আর গালি দিতে পারি। কিন্তু শেখসাহেবের প্রতিপক্ষরা কি তাকে সময় দেবে?"

বঙ্গবন্ধুর প্রতিপক্ষ? জাসদ? হাহ্! ওরা কেবল নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে পারে। রাষ্ট্র চালানো, মানুষকে একতাবদ্ধ করে নতুন স্বপ্ন দেখানো ওদের কাজ না। মনে মনে বলে উঠেছিলাম আমি। কিন্তু তখন কে জানতো, পর্দার আড়ালে আরো অনেকে আছে!

যাই হোক, আরো অনেক যন্ত্রণা আর স্বপ্নভঙ্গের কথা বলেছিলেন হায়দারভাই, সে-সব কথা আমার কাছে না ছিলো নতুন, না মনে হয়েছিলো অযৌক্তিক। আমি চুপচাপ তার স্বপ্নভঙ্গ আর মর্মবেদনার সঙ্গি হয়ে বসে বসে শুনে গেছিলাম শুধু।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরই হায়দারভায়ের তুমুল বিরোধিতা সত্ত্বেও ইমতিয়াজ জামিন পেয়ে বের হয়ে গেলো। আদালতের সিদ্ধান্তে আমি পুরোপুরি হতভম্ব হয়ে গেছিলাম। অবশ্য হায়দারভাইকে দেখে মনে হয়েছিলো তিনি যেন জানতেন কি হতে যাচ্ছে। কোর্টের বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুধু বলেছিলেন, "দেশটা এভাবেই চলছে।"

আজকের দিনের ক্রিমিনাল রাজনীতিকদের মতো জেলগেট থেকে ফুলের মালা দিয়ে ইমতিয়াজকে বরণ করা হয়েছিলো কি-না সেটা আমি জানি না, তবে সে যে বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে বের হয়েছিলো সেটা অনুমাণ করতে পারি। জেলে ঢোকার আগে সে ছিলো পুলিশের ভয়ে পালিয়ে বেড়ানো এক ধর্ষক-খুনি, কিন্তু বের হয়ে এলো ক্ষমতার বটবৃক্ষের ছায়ায় থাকা পরজীবি হিসেবে। তার কেশাগ্রও যে স্পর্শ করতে পারবো না সেটা বুঝে গেছিলো সে।

আমার স্পষ্ট মনে আছে ইমতিয়াজের জামিন পাবার পরদিনই থানায় চলে এলো মিনহাজ। তার আগমণ আমার কাছে প্রত্যাশিতই ছিলো। ঠিক যেমন প্রত্যাশিত ছিলো তার অবিশ্বাস্য চেহারা আর হতবিহ্বল মুখখানি।

gronthagaar.blogspot.com

"এটা কিভাবে সম্ভব হলো, ভাই?!"

মিনহাজের দিকে তাকানোর মতো সাহস আমার ছিলো না। এমনিতেই মনমরা হয়ে ছিলাম। হায়দারভাইও কোর্ট থেকে সেই যে চলে গেছেন আর থানায় ফিরে আসেননি। এই সময়টা নিজেকে বড্ড এতিম বলে মনে হচ্ছিলো আমার।

থানায় বসে মিনহাজের প্রশ্নের জবাব দেয়াটা ঠিক বলে মনে করিনি আমি, তাকে নিয়ে বাইরে চলে আসি। প্রভাবশালি এক রাজনৈতিক নেতার কারণেই যে ইমতিয়াজ জামিন পেয়েছে সেটা খুলে বলি তাকে। হায়দারভাই জামিনের বিরুদ্ধে আপত্তি জানালেও কোন লাভ হয়নি। অবশ্য মিনহাজকে আমার আশঙ্কার কথাটা বলি নি–মিলির কেস থেকে হায়দারভাইকে সরিয়ে দেয়া হতে পারে।

আমি ভেবেছিলাম আমার কাছ থেকে এসব শুনে মিনহাজ খুবই উত্তেজিত হয়ে চেঁচামেচি শুরু করে দেবে, কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম বাকরুদ্ধ হয়ে গেলো সে। তার থমথমে মুখের দিকে চেয়ে আমার ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। বেচারা মাত্র স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলো তার প্রাণপ্রিয় স্ত্রির হত্যাকারির বিচার হবে। উপযুক্ত শাস্তি হবে। সেই স্বপ্ন বিরাট বড় একটা ধাক্কা খেয়েছে।

কোন অভিযোগ, অনুযোগ কিংবা আক্ষেপ না করে, বিন্দুমাত্র উত্তেজিত না-হয়ে মিনহাজ চুপচাপ চলে গেলো। যাবার সময় আমার দিকে ফিরেও তাকালো না। আমিও তাকে পেছন থেকে ডাকলাম না, চুপচাপ তার চলে যাওয়া দেখে গেলাম কেবল।

হায়দারভাই আর থানায় আসছে না দেখে আমি ভড়কে গেলাম। তিনি কি চাকরি ছেড়ে দিলেন! এই লোকের পক্ষে এমন কাজ করা মোটেও অসম্ভব ছিলো না। ভালো করেই জানতাম, রুটি-রুজি আর ভবিষ্যতের চিন্তা, কোন কিছুই তাকে এমন সিদ্ধান্ত নেয়া থেকে বিরত রাখতে পারবে না।

বাধ্য হয়ে আমি ঐদিন সন্ধ্যার পর তার বাসায় চলে গেলাম। একটা সোয়েটার আর লুঙ্গি পরে তিনি তার দু-কামরার ছোট্ট বাসার সামনে একটা পুরনো নীচু দেয়ালের উপর বসে সিগারেট টানছিলেন, আমাকে দেখে নির্বিকার মুখে তাকালেন, সেই মুখে গভীর বিষাদ। তার যন্ত্রণাকাতর মায়াভরা চোখদুটো এখনও আমি ভুলতে পারিনি।

আমি চুপচাপ তার পাশে গিয়ে বসতেই আধ-খাওয়া সিগারেটটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। তখনও তার দৃষ্টিতে শূন্যতা।

Gronthagar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

"জামিনই তো হয়েছে...কেসটা তো আর ক্লোজ হয়নি," আধ-খাওয়া সিগারেটে একটা টান দিয়ে আস্তে করে বলেছিলাম আমি।

আমার দিকে না তাকিয়েই হায়দারভাই বাঁকাহাসি দিলেন। "ধরে নাও এই কেস অলরেডি ক্লোজ হয়ে গেছে," আস্তে করে বললেন তিনি, "তুমি আমি কেউ কিচ্ছু করতে পারবো না।"

প্রতিবাদ করে উঠলাম, "আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, আপনার মতো লোক এতো সহজে হাল ছেড়ে দিচ্ছে। দেখিই না কী হয়। শেষ পর্যন্ত ফাইট করা উচিত আমাদের।"

মাথা দোলালেন তিনি। "কোন লাভ নেই, আমি জানি এরপর কি হবে। একবার যখন ইন্টারফেয়ার করা শুরু হয়েছে তখন আর এই কেস নিয়ে আমি কোন আশা দেখছি না।"

"না, ভাই...এটা আমি মানতে পারলাম না।"

আমার মুখের দিকে তাকালেন তিনি।

"আপনি খুব দুরদর্শি মানুষ, অনেক কিছুই বুঝতে পারেন, কিন্তু এভাবে চেষ্টা না করে একেবারে হাল ছেড়ে দেয়াটা ঠিক হবে না। ঘটনা কোন্ দিকে যায় কে জানে। সর্বোচ্চ চেষ্টা করে দেখা দরকার না?"

হায়দারভাই নির্বিকার রইলেন। যেন বালখিল্য কথাবার্তার জবাব দিতে চাইছেন না।

"মিনহাজ এসেছিলো," আস্তে করে বললাম তাকে। "সব শুনে একেবারে পাথরের মূর্তি হয়ে গেলো। বেচারার দিকে তাকাতে পারছিলাম না।"

হায়দারভাই আবারো ফাঁকাদৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রইলেন দূরে কোথাও।

"এখন আপনি যদি এভাবে হাল ছেড়ে দেন তো সে কোথায় যাবে, বলেন?"

"মেয়েটার চোখ শুধু ভেসে উঠছে চোখের সামনে।" অনেকক্ষণ পর আস্তে করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন তিনি।

বুঝতে পারলাম মিলির কথা বলছেন।

"মাত্র বিয়ে হয়েছে, নতুন জীবন শুরু করেছে। কতো স্বপ, কতো আশা। একদিন তার ঘর দাপিয়ে বেড়াবে ছোটো ছোটো বাচ্চা। ওদের মানুষ করবে, ছোটো ছোটো আঙুল ধরে ধরে পড়তে শেখাবে, কোলে নিয়ে গল্প শোনাতে শোনাতে ঘুম পাড়াবে।"

কথাগুলো আমাকেও আলোড়িত করলো। নিহত মিলির চোখদুটো আমিও ভুলতে পারিনি। আজো সেই স্মৃতি জ্বলজ্বল করছে।

gronthagaar.blogspot.com

"শোনো," বেশ শান্তকণ্ঠেই বললেন তিনি, "আমি হাল ছেড়ে দেবো না। সারা জীবনে আমি এ কাজ করিনি। মৃত্যুর আগপর্যন্তও আমি এটা করবো না।"

আশান্বিত হয়ে উঠলাম আমি। এই তো আমার হায়দারভাই! আমাদের অতি চেনা এসএম হায়দার।

"যদিও জানি, কিচ্ছু করতে পারবো না," একটা দীর্ঘশ্বাসের সাথে বললেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে আমার আশার আলো দপ করে নিভে গেলো। "কিন্তু হেরে যাবার ভয়ে যুদ্ধ করবো না সেটা ভেবো না।"

কথাটা শুনে আমার গায়ের পশম দাঁড়িয়ে গেছিলো। সংশপ্তক! হেরে যাবে জেনেও যারা লড়াই করে যায়! মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে!

"ভাই, আপনি একজন মুক্তিযোদ্ধা...আমি বিশ্বাস করি না নেতা নামের ঐসব বেজন্মাদের কাছে আপনি হেরে যাবেন," জোর দিয়ে বললাম তাকে, তবে মনেপ্রাণে বিশ্বাসও করেছিলাম কথাটা বলার সময়।

এরকম আরো অনেক কথা বলেছিলাম তখন, সে-সব আর বিস্তারিত মনে নেই। তবে পরদিন যে হায়দারভাই থানায় যোগ দিয়েছিলেন সেটা নিশ্চয় আমার এসব কথার কারণে নয়। আজন্ম লালিত স্বভাব আর চরিত্রই তাকে পরিচালিত করতো সব সময়।

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

অধ্যায় ২৫

ওসির কলার ধরে শাসানোর মতো কাণ্ড করার পরও হায়দারভায়ের বিরুদ্ধে কোন রকম শৃঙ্খলাজনিত ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। আমি নিশ্চিত ছিলাম, এটা আমাদের থানার ওসি আলী ইকরাম সাহেবের ঔদার্য ছিলো না মোটেও। তবে ঠিক কী কারণে সে পুরো ব্যাপারটা হজম করে ফেলেছিলো সেটাও আমি কখনও জানতে পারিনি। আমার অনুমাণ, দুটো কারণে এসএম হায়দারকে ঘাটানোর সাহস করেনি ভদ্রলোক। প্রথমত তিনি একজন সৎ অফিসার, বেতনের বাইরে এক পয়সাও বাড়িতে নিয়ে যাবার কথা ভাবেন না। দ্বিতীয়ত, মুক্তিযুদ্ধে তার অংশগ্রহণ। সার্টিফিকেটধারী, বানোয়াট কোন মুক্তিযোদ্ধা তিনি ছিলেন না। পঁচিশে মার্চ রাতে রাজারবাগ থেকে প্রতিরোধ করার মাধ্যমে তিনি মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেছিলেন, যার শেষটা ষোলোই ডিসেম্বরে।

রাজারবাগ পুলিশ লাইনে লড়াই করে বেঁচে যাওয়া হাতেগোনা কয়েকজন তরুণ পুলিশের মধ্যে এসএম হায়দার ছিলেন অন্যতম। তার এই বীরত্বপূর্ণ অবদান পুলিশ বিভাগের প্রায় সবাই জানতো। দেশ স্বাধীন হবার পর সরকার তাকে প্রমোশন দিয়ে, ঢাকার মতো জায়গায় দীর্ঘদিন পোস্টিংয়ে রেখে এক ধরণের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। তার সঙ্গি মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেই বড় বড় পদে আসীন এখন। এসব কারণে সম্ভবত ওসিসাহেব পুরো ব্যাপারটা চেপে গেছে। সে হয়তো বুঝতে পেরেছিলো এসএম হায়দারের বিরুদ্ধে উপর মহলে নালিশ করে কোন লাভ হবে না।

যাই হোক, ঐ ঘটনার পর থেকে হায়দারভাইকে এড়িয়ে চলতে শুরু করে ওসি আলী ইকরাম। পারতপক্ষে তার সঙ্গে কোন রকম কথাবার্তা বলতো না। এটাকে আমি স্বাভাবিক বলেই ধরে নিয়েছিলাম।

ঐ ঘটনার পরের সপ্তাহে, একদিন আমি আমার টেবিলে বসে একটা জিডি রেকর্ড করছিলাম, হায়দারভাই একটা কাজে বাইরে ছিলেন, এমন সময় ওসি আমাকে ডেকে পাঠালো। জিডিটা অসম্পূর্ণ রেখে চলে গেলাম তার ঘরে। আমাকে বসতে বললো ভদ্রলোক।

"আপনি তো হায়দারসাহেবের ঘনিষ্ঠ লোক," প্রথমেই সে এটা বলে

gronthagaar.blogspot.com

কথা বলতে শুরু করলো, "আপনার কথা হয়তো শুনবে," একটু থেমে কথাটা গুছিয়ে নিলো। "ওরে বোঝান, মাথা গরম করে কোন লাভ হবে না। আমরা হলাম গভমেন্ট সার্ভেন্ট...হুকুম তামিল করাই আমাদের কাজ। পলিটিশিয়ানদের সাথে বাজাবাজি করলে ফল ভালো হবে না। সময়টা কিন্তু খুব ভালোও না।" শেষ কথাটা বলে কী ইঙ্গিত করলো সেটা অবশ্য আমি বুঝতে পারিনি। "অধস্তনদের সাথে মাথা গরম করে যা-তা ব্যবহার করে। কিন্তু এ কাজটা সবার সাথে করা যায় না, তাই না?"

আমি হা করে চেয়ে রইলাম, বুঝতে পারলাম না কী বলবো।

"তারে বলেন, কথামতো কাজ করলে ঐ কেস থেকে তাকে আমি বাদ দেবো না। নইলে কিন্তু আমার কিছু করার থাকবে না। চাকরির মায়া তার থাকতে না পারে আমার তো আছে, নাকি?"

"কথামতো কাজ করবে মানে, স্যার?"

আমার দিকে এমনভাবে তাকালো আলী ইকরামসাহেব যেন নাদানের মতো কথাটা বলে ফেলেছি। "আরে, তার সাথে থাকতে থাকতে তো দেখি আপনার কাণ্ডজ্ঞানও গেছে!"

আমি কাচুমাচু খেলাম। একেবারেই যে বুঝতে পারিনি তা তো নয়, তবে ওসির মুখ থেকে কথাটা সরাসরি শুনতে চাইছিলাম।

"ঐ কেসটা যে পর্যায়ে আছে সে পর্যায়েই থাকুক। এটা নিয়ে আর কিছু করার দরকার নাই। বাকিটা আদালত দেখবে। আসামি যদি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারে তো করুক, না পারলে ফাঁসিতে ঝুলে মরুক। আমাদের কী?"

বুঝতে পারলাম ওসি আসলে কি বলতে চাইছে। প্রতিপক্ষ গোল দিতে গেলে যেন কোনরকম বাধা দেয়া না-হয়! অন্যভাবে বলতে গেলে, ইমতিয়াজ নামের জঘন্য এক ধর্ষক-খুনিকে বেকসুর খালাস করে দেবার জন্য পথ করে দেয়া।

"একটা কথা মনে রাখবেন, হায়দার যতো চেষ্টাই করুক না কেন, এই কেসে খুব একটা সুবিধা হবে না। মাঝখান থেকে ঝামেলা বাড়ানো শুধু।"

"কেন, স্যার? ইমতিয়াজ তো নিজের মুখে স্বীকার করেছে...তাছাড়া কিছু সাক্ষি-প্রমাণও–"

"রাখেন," মৃদু ধমক দিয়ে আমাকে থামিয়ে দিলো ওসি। "বিচার শুরু হলে সে সবকিছু অস্বীকার করবে। আদালতকে বলবে, মারের হাত থেকে বাঁচার জন্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলো। তার কাছ থেকে জোর করে

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

জবানবন্দিতে স্বাক্ষর নিয়েছে হায়দার। আর ঐসব সাক্ষি-প্রমাণ...দেখেন, কী হয়।"

আমি থ বনে গেলাম। থানার ওসিই যদি এমন কথা বলে তাহলে ইমতিয়াজকে দোষি প্রমাণ করা যাবে কিভাবে? হায়দারভাই শত চেষ্টা করলেও তো কোন কাজ হবে না।

"ওকে বলবেন, আমার উপর রাগারাগি করে কোন লাভ নেই। আমার হাত বান্ধা। বুঝলেন?"

"জি, স্যার," খুব কষ্টের সাথে কথাটা বলেছিলাম।

"বিয়ে-শাদি করেছে, দু-দিন পর বাচ্চা-কাচ্চার বাপ হবে, মাথা গরম করে নিজের ক্ষতি করার কী দরকার, বলেন?"

ক্ষতি?! আমি যারপরনাই অবাক হলাম কথাটা শুনে। ইমতিয়াজের মতো একজন ধর্ষক-খুনি হায়দারভায়ের মতো মানুষের ক্ষতিও করতে পারে?

"ঐ ইমতিয়াজ ছেলেটা খুব খারাপ," ওসি বললো, "ওর সাথের লোকগুলোও ভয়ঙ্কর। কখন কী করে বসে বলা যায় না। মাথার উপরে আবার এক নেতা আছে। সে তো রাস্তার লোক না রে, ভাই।"

সত্যিকার অর্থেই আমার জবান বন্ধ হয়ে গেছিলো। কী বলবো এসব কথার জবাবে?

"হায়দারকে বলবেন, সে একা যুদ্ধ করেনি...ইমতিয়াজও যুদ্ধ করছে," কথাটা বলে চেয়ারে হেলান দিলো ভদ্রলোক। "একটু ছাড় তো সে পেতেই পারে।"

ওসির রুম থেকে ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসে ছিলাম ঝিম মেরে। একটা খুনি! ধর্ষক! নববিবাহিত একটি সংসার তছনছ করে দিয়েছে। মাত্র জীবন শুরু করতে যাওয়া এক তরুণীকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে নিজের হাতে, বুক ফুলিয়ে সে কথা স্বীকারও করেছে। তাকে কি-না রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছে রাজনীতি করা কোন এক নেতা! এখন আবার তাকে মুক্তিযোদ্ধা বানিয়ে পার পাইয়ে দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে!

আমার ভেতরটা ভেঙে গুড়িয়ে যেতে শুরু করলো। এমন সময় এক কনস্টেবল এসে বললো আমার একটা ফোন এসেছে। কে করেছে সেটা জানতে চাওয়ার মতো অবস্থায় ছিলাম না। যন্ত্রের মতো চেয়ার থেকে উঠে ঘরের এককোণে রাখা কালো রঙের টেলিফোনটার দিকে চলে গেলাম আমি। রিসিভারটা তুলে নিয়ে বললাম, "হ্যালো, কে বলছেন?"

"আমি রামজিয়া।"

gronthagaar.blogspot.com

ওপাশ থেকে কণ্ঠটা বললো। তবে নাম বলার কোন দরকারই ছিলো না, তার কণ্ঠটাই যথেষ্ট ছিলো আমার জন্য। তারচেয়েও বড় কথা, রামজিয়া শেহরিন ছাড়া আমাকে আর কোন মেয়ে কখনও থানায় ফোন করার কথাও নয়।

"কেমন আছেন?" ম্রিয়মান কণ্ঠে জানতে চাইলাম।

"ভালো না...মন খুব খারাপ," একটু থেমে আবার বললো, "যা শুনলাম সেটা কি সত্যি? ইমতিয়াজ নাকি জামিন পেয়ে গেছে?"

দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে গেলো আমার ভেতর থেকে। "হুম।" ছোট্ট করে জবাব দিলাম।

"হাউ ইট পসিবল! মাই গুডনেস! এটা কিভাবে হলো? কেন হলো?"

তার এ প্রশ্নের জবাব দেবার মতো মানসিক অবস্থা আমার ছিলো না তখন। তারচেয়েও বড় কথা, আমি তখন থানায়। আশেপাশে অনেক লোকজন। এদের মধ্যে প্রায় সবাই ওসির ঘনিষ্ঠ। কান খাড়া করে সব শুনে ফেলার সম্ভাবনা আছে। আর সে কথা ওসির কানে পৌছে যাবে অবধারিতভাবেই।

"কি হলো, চুপ মেরে আছেন যে?" ফোনের ওপাশ থেকে তাড়া দিয়ে বললো সে।

"ইয়ে, মানে...আপনাকে পরে বলবো সব। ঠিক আছে?"

মনে হলো কিছুটা আঁচ করতে পেরেছে।

"উমম...ওকে। বিকেলে নিউ মার্কেটে চলে আসেন। ঐ যে, কফি খেয়েছিলাম যেখানে।"

"আচ্ছা," আস্তে করে বলে ফোনটা রেখে দিলাম আমি। এই প্রথম তার সঙ্গে দেখা করার আরেকটি সুযোগ পেয়েও আমার মধ্যে কোন সুখকর অনুভূতি তৈরি হলো না। তার বদলে এক ধরণের অস্বস্তি জেঁকে বসলো।

*

যতো অস্বস্তিই লাগুক না কেন, কথামতো ঐদিন বিকেলে নিউ মার্কেটে ঠিকই গিয়েছিলাম আমি।

পুরো ঘটনাটা তাকে খুলে বললাম। এমনকি, ওসিসাহেব আমাকে কি বলেছিলো সেটাও বাদ দিলাম না। সব শুনে কয়েক মুহূর্ত বিস্ময় আর হতাশা নিয়ে কফিতে চুমুক দিয়ে গেলো রামজিয়া।

Grothagar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

"জামিন পেয়ে ইমতিয়াজ কি পালিয়ে যেতে পারে?" অবশেষে নীরবতা ভেঙে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইলো সে।

"আমার তা মনে হচ্ছে না।"

"তাহলে আপনারা ওর জামিন নিয়ে এতো চিন্তিত হয়ে পড়েছেন কেন?" একেবারেই সহজ-সরল প্রশ্ন।

"এ ধরণের মার্ডার কেসের আসামি...যার পেছনে আবার পলিটিশিয়ান আছে...জামিনে বের হয়ে গেলে তদন্তে অনেক সমস্যা করবে," বললাম তাকে।

"কি ধরণের প্রবলেম করতে পারে?"

"তদন্তে বাধা সৃষ্টি করবে, আলামত নষ্ট করার চেষ্টা করবে। সাক্ষিদের ভয়-ভীতি দেখাবে।"

উদ্বিগ্ন চোখে আমার দিকে চেয়ে রইলো সে। "যে লিডার ইমতিয়াজকে শেল্টার দিচ্ছে সে কি জানে না ও একটা রেইপিস্ট, মার্ডারার?"

"অবশ্যই জানে। না জানার তো কারণ দেখছি না।"

"তাহলে?" মাথা দোলালো সে। "এতো বড় অন্যায় ঐ পলিটিশিয়ান কিভাবে করতে পারলো!"

এ প্রশ্নের জবাবে আমি কী-ই বা বলতে পারতাম! হায়দারভাই যেভাবে স্পষ্ট করে সমালোচনা করতে পারতেন আমি তো সেভাবে কখনও করতে পারতাম না। খুব অল্প বয়সেই আমি যতোটা না দল তার চেয়ে অনেক বেশি বঙ্গবন্ধুর ভক্ত। ছেষট্টির ৬ দফা আন্দোলনের সময় থেকে শেখ মুজিবের ভক্ত আমি। উনসত্তুরের গণঅভ্যুত্থানের সময় ঢাকা কলেজে পড়ি, টুকটাক রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েছি। বাবা শুনলে ভীষণ কষ্ট পাবেন জেনেও ঢাকা কলেজের অন্যান্য ছেলেদের সাথে আন্দোলনে যোগ দেই আয়ুবশাহীর পতন ঘটিয়ে শেখ মুজিবকে জেল থেকে বের করে আনার জন্য।

যাই হোক, রাজনীতিবিদদের প্রতি আমার বিশ্বাস-আস্থার চির ধরেছিলো দেশ স্বাধীনের পর পরই। হায়দারভায়ের সাথে তর্ক করতাম, নিজের প্রিয় দল আর নেতার হয়ে লড়াই করতাম সব সময়, কিন্তু তাই বলে তাদের হতাশাজনক কীর্তিকলাপ সম্পর্কে অবগত ছিলাম না তা তো নয়।

"কি হলো?" রামজিয়ার কথায় সম্বিত ফিরে পেয়ে তাকালাম তার দিকে। "কী ভাবছেন?"

"না, কিছু না," বললাম তাকে। আসলে, এ কথা মানুষ যখন বলে

gronthagaar.blogspot.com

তখন অনেক বেশি ভাবনায় ডুবে থাকে সে কিন্তু ভাবনাগুলো থাকে গভীর আর অকথিত।

"তাহলে এখন কি হবে? মিনহাজ যদি জানতে পারে তাহলে তো খুবই আপসেট হয়ে পড়বে।"

"মিনহাজ জানে," আস্তে করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম তাকে।

"তাই নাকি?"

"হুম। ইমতিয়াজ জামিন পাবার পর থানায় এসেছিলো। সব শুনে একদম চুপ মেরে গেছে।"

"আই ফিল সরি ফর হিম," বিষন্ন কণ্ঠে বললো রামজিয়া। "মিলির মার্ডারের পর তো পুরোপুরি ভেঙে পড়েছিলো...এখন আবার..."

অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর বললাম তাকে, "তবে আমার বিশ্বাস হায়দারভাই এতো সহজে ছেড়ে দেবেন না।"

আরো কিছু শোনার জন্য আমার দিকে চেয়ে রইলো সে।

"উনি এর শেষ দেখে ছাড়বেন।"

আমার এ কথায় রামজিয়া কতোটুকু আশ্বাস পেলো জানি না, তবে আর কোন কথা না বলে চুপ মেরে গেছিলো।

ঐদিন খুব মন খারাপ করে ঘরে ফিরেছিলাম। সেই প্রথম রামজিয়ার সাথে দেখা করার মহূর্তগুলো কেমন অস্বস্তিকর ঠেকছিলো, সাক্ষাৎকার পর্বটি দীর্ঘ হোক সেটাও চাইছিলাম না মনে মনে!

Gronthagar.blogspot.com

gronthagar.blogspot.com

অধ্যায় ২৬

যেমনটা আশঙ্কা করা হয়েছিলো, ইমতিয়াজ জামিনে ছাড়া পাবার পর খুব দ্রুতই ঘটনা বদলে যেতে শুরু করলো। ওসির কথাগুলো আমি আর হায়দারভাইকে বলার সুযোগই পাইনি। ভালো করেই জানতাম, এ কথা শুনলে রেগেমেগে ওসির কলার ধরতে ছুটে যেতে পারেন তিনি। কিংবা কে জানে, হয়তো মারপিটও করতে পারেন। অপেক্ষায় ছিলাম মন-মেজাজ ভালো দেখলে সুযোগ পেলে কথাটা তুলবো। তবে আমি ইনিয়ে বিনিয়ে অন্যভাবে কথাগুলো তাকে বলেছিলাম। মানে, বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম আর কি।

"আচ্ছা, ইমতিয়াজ যদি আদালতের কাছে বলে, তাকে আপনি ভয়-ভীতি দেখিয়ে জোর করে স্বীকারোক্তিতে স্বাক্ষর করিয়েছেন, সে মার খাওয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য এটা করেছে, তাহলে কি হবে?"

প্রশ্নটা শুনে হায়দারভাই আমার দিকে চেয়ে ছিলেন কয়েক মুহূর্ত। "এটা তো সে করবেই...সব আসামিই এটা করে।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বললেন, "সেটা নিয়ে আমি চিন্তিত না।"

"তাহলে আপনি কি নিয়ে চিন্তিত?"

"আমাদের হাতে যে কিছু সাক্ষি আছে...চাক্ষুষ সাক্ষি...তাদেরকে সে ভয়-ভীতি দেখালে খুব সমস্যা হয়ে যাবে। দেশের অবস্থা ভালো না। এরকম পরিস্থিতিতে কেউ ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে যাবার কথা চিন্তাও করবে না।"

"আপনার ধারণা সাক্ষিরা এখনও ইমতিয়াজের রাজনৈতিক পরিচয় জানে না?"

"তারা কিভাবে এটা জানবে? তখন তো জানতামও না ও রাজনীতি করে। আর জানলেও আমি সেটা ওদেরকে বলতাম না।"

আমি চুপ মেরে গেলাম। হতাশাজনক চিত্র ভেসে উঠলো চোখের সামনে। সব জানার পর সাক্ষিরা সাক্ষ্য দিতে আর রাজি হবে না।

"এজন্যেই ওকে জেলে আটকে রাখার দরকার ছিলো। এরকম আসামি জামিনে বেরিয়ে গেলে কী করতে পারে সেটা আমি ভালো করেই জানি।"

"সে কি এরকম কিছু করেছে?"

মাথা দুলিয়ে জবাব দিলেন। "না। এখন পর্যন্ত কিছু করেনি, তবে

gronthagaar.blogspot.com

মামলা চালু হবার আগেই ওর উকিল ওকে বলে দেবে সে যেন এটা করে, নয়তো আমাদের ওসি হারামজাদাই বলে দেবে সাক্ষিদের ভয় দেখিয়ে বিরত রাখার জন্য। ওসি এখন নেতার হয়ে কাজ করছে। নেতাকে খুশি করে কিছু হাসিল করতে চাইছে।"

কথাটা শুনে আমি আরো বেশি হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। "আচ্ছা, আপনাকে যদি কেস থেকে সরিয়ে দেয়া হয় তাহলে কি করবেন?"

আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে কাঁধ তুললেন তিনি। "জানি না।"

আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করিনি। তবে হায়দারভায়ের আশঙ্কাই সত্য প্রমাণিত হয়েছিলো। ইমতিয়াজ জামিনে ছাড়া পেয়ে সপ্তাহখানেক চুপচাপ থাকার পরই সক্রিয় ওঠে।

মিলিদের বাড়ির সামনে যে মুদির দোকানি ইমতিয়াজকে ঘুরঘুর করতে দেখেছে সে বেঁকে বসলো সাক্ষি না দেবার জন্য। হায়দারভাই বুঝতে পারলেন ইমতিয়াজ তার কাজ শুরু করে দিয়েছে। মুদিকে ধমক দিয়ে, বুঝিয়ে-সুঝিয়েও কাজ হলো না। ইমতিয়াজ যে তাকে ভয় দেখিয়েছে এ কথা পর্যন্ত স্বীকার করার সাহস দেখায়নি সে। এই সাক্ষিটা ছিলো খুবই ভাইটাল।

ক্ষিপ্ত হায়দারভাই ভেতরে ভেতরে যে তেঁতে ছিলেন সেটা আমি পুরোপুরি বুঝতে পারিনি। আমাকে তিনি এমন কোন আভাসও দেননি যে আমি বুঝতে পারবো। মুদি দোকানির সাথে কথা বলার তিন-চারদিন পর ওসিসাহেব আমাকে আবারো ডেকে নিয়েছিলো তার ঘরে। সে-ই আমাকে জানায় হায়দারভাই কি করেছেন।

"ওর তো মাথা খারাপ হয়ে গেছে, পুরা পাগল হয়ে গেছে, বুঝলেন?" ওসি বলেছিলো আমাকে।

"কেন, স্যার, আবার কি হয়েছে?" উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চেয়েছিলাম আমি।

"আপনি কিছু জানেন না?" সন্দেহের সুরে বলেছিলো ওসি আলী ইকরাম।

"না, স্যার...কি হয়েছে? হায়দারভাই কি করেছেন?"

"আরে, সে তো সাপের লেজে পা দিয়েছে," আক্ষেপে মাথা দুলিয়ে বলেছিলো, "গতকাল ইমতিয়াজকে সে শাসিয়েছে।"

জামিনে ছাড়া পেয়ে ইমতিয়াজ বেশ বুক ফুলিয়েই ঘুরে বেড়াতো, ফলে তার নাগাল পাওয়াটা তেমন কঠিন কাজ ছিলো না।

"বলেন কি?" আমি সত্যি অবাক হয়েছিলাম কথাটা শুনে। হায়দারভাই

Gronthagar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

আমাকে এ ব্যাপারে কিছুই বলেননি। কথাটা শুনে খুবই মন খারাপ হয়েছিলো। যেন তার সব কিছু, সমস্ত কর্মকাণ্ড জানার অধিকার অর্জন করে ফেলেছি আমি। সেই অধিকার থেকে আমাকে বঞ্চিত করা হয়েছে!

"ভাবছিলাম আপনি ওকে বোঝাতে পারবেন," হতাশকণ্ঠে বললো ওসি। "কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ওকে বোঝানো আপনার কাজ না।"

তাহলে আমাকে এখানে ডেকে এনে এসব কথা বলছেন কেন?–মনে মনে প্রশ্নটা না করে পারিনি। তবে পরক্ষণেই জবাবটা পেয়ে গেছিলাম উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছ থেকে।

"আপনি আর ওর সাথে ঘোরাঘুরি কইরেন না, বুঝলেন?" সিরিয়াসভঙ্গিতেই বলেছিলো ওসি। "ওর কপালে খারাবি আছে।"

ঐদিন থানার বাইরে হায়দারভাইকে একা পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম ইমতিয়াজকে তিনি কেন শাসাতে গেছিলেন।

"কে বলেছে তোমাকে?"

"ওসিসাহেব।"

"শাসিয়েছি মানে?" অবাক হয়ে বলেছিলেন তিনি। "ঐ হারামজাদার নাক যে ফাঁটিয়ে দিয়েছি সেটা বলেনি কুত্তারবাচ্চা?"

কথাটা শুনে আমি যারপরনাই অবাক হয়েছিলাম। "কি!" আমার বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছিলো।

"ওরে বলে দিয়েছি, আমি যতোদিন বেঁচে আছি ওর নেতা ওকে বাঁচাতে পারবে না। দরকার পড়লে আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে শেখসাহেবের কাছে যাবো। তারপর দেখবো কোন্ নেতার বুকের পাটা কতো বড়!"

"আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে!" আমি সত্যি সত্যি রেগে গেছিলাম কথাটা শুনে। তবে রাগের চেয়েও উদ্বিগ্নতা ছিলো অনেক বেশি। "ওর মতো জঘন্য এক খুনিকে হুমকি দিয়েছেন! ও যদি আপনার কোন..." কথাটা পুরোপুরি আমার মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতেও পারিনি।

"ক্ষতি করবে?" আমার দিকে চেয়ে বললেন তিনি, "মেরে ফেলবে?" তারপর তাচ্ছিল্যভরে হাতে নেড়ে বলে উঠলেন, "মৃত্যুর ভয় এই হায়দার করে না, বুঝলে? এই যে আমি বেঁচে আছি এটা তো বোনাস লাইফ। আমার কতো সহযোদ্ধা মরে গেছে, আমিও মরে যেতে পারতাম।"

হতাশ হয়ে আমি মাথা দুলিয়েছিলাম। ভয়-ভীতির দোহাই দিয়ে যে তাকে দমানো যাবে না সেটা ভালো করেই জানতাম।

gronthagaar.blogspot.com

অধ্যায় ২৭

হায়দারভাই কতোটা মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন তার প্রমাণ পেলাম বেশ কয়েক দিন পর। তিনি আমাকে এমন একটা কথাট বললেন যে শোনার সঙ্গে সঙ্গে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম।

"কী যে বলেন না...এটা কিভাবে সম্ভব? আপনি কিভাবে আশা করলেন ও এতে রাজি হবে?"

"তুমি বলেই দেখো না, রাজি তো হতেও পারে?" নাছোরবান্দার মতো বলেছিলেন তিনি। "হাজার হলেও বান্ধবি, তার একটা দায়িত্ব আছে না?"

আমি নিঃশব্দে মাথা দোলালাম। বুঝতে পারছিলাম হায়দারভাই মরিয়া হয়ে অসম্ভবকেও সম্ভব করতে চাইছেন। তিনি আমাকে দিয়ে রামজিয়াকে একটা ব্যাপারে রাজি করাতে বলছেন মিলির কেসে তাকে সাক্ষি দিতে হবে!

রামজিয়া কী সাক্ষি দেবে? আমার মাথায় কিছুই ঢুকছিলো না। সে তো এই ঘটনার সাথে জড়িত নয়। কোনভাবেই না।

"শোনো, ইমতিয়াজের সাথে যে মিলির পরিচয় ছিলো, এক সময় মিলির পেছনে ঘুর ঘুর করতো, মেয়েটা খুন হওয়ার কয়েকদিন আগে গায়ে হলুদের প্রোগ্রামে যে সে ছোক ছোক করেছে, এইসব ঘটনার সাক্ষি তো ঐ মেয়েটাই। সে যদি সাহস করে আদালতে এসে এটা বলে তাহলে মামলার গ্রাউন্ডটা শক্তিশালি হয় না?"

"আপনার ধারনা ঐ বড়লোকের মেয়ে এরকম ঝামেলায় জড়াতে রাজি হবে?"

"রাজি হতেও পারে।"

মাথা দোলালাম আমি। "আপনি বুঝতে পারছেন না, ওর মতো মেয়ে এটা করতে রাজি হবে না। এসব কোর্ট-কাচারির ধারেকাছেও সে যাবে না। ভুলেভালে যদি রাজিও হয়, তার পরিবার তাকে এটা করতে দেবে না।"

"আহা," বিরক্ত হয়ে উঠলেন এসএম হায়দার, "এতো কিছু না ভেবে তুমি আগে ওকে বলেই দেখো না। রাজি না হলে কী আর করা। আর যদি সাহস করে রাজি হয়েই যায় তাহলে আমাদের অনেক উপকারে আসবে।"

gronthagaar.blogspot.com

আমাকে চুপ থাকতে দেখে আবারো তিনি বললেন কথাটা।

"একবার বলে দেখো," গভীর করে নিঃশ্বাস নিলেন, "তুমিই না আমাকে বললে এতো সহজে হাল ছেড়ে না দিতে, শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে যেতে?"

"ঠিক আছে," আমার নিজের যুক্তিতেই আমাকে ঘায়েল করলেন হায়দারভাই। "আমি তাকে বলবো।"

ঐদিন বিকেলে আমি ফোন করি রামজিয়াদের বাড়িতে। সে ছিলো না, ফোনটা ধরেছিলো কাজের লোক। সে জানালো তাদের আপামনি বাইরে আছে।

সন্ধ্যার পর আমি যখন থানায় কাজ করছিলাম তখন রামজিয়া আমাকে ফোন করে। আমি একটু অবাকই হয়েছিলাম, কারণ কাজের লোককে আমি আমার পরিচয় দেইনি। তাহলে সে জানলো কিভাবে ফোনটা আমি করেছিলাম? ওটা অ্যানালগ ফোনের যুগ ছিলো, কে ফোন করেছে জানার কোন উপায় ছিলো না তখন।

"আমার কেনজানি মনে হলো আপনিই ফোন করেছিলেন," আমার প্রশ্নের জবাবে বলেছিলো সে। "এখন বলেন, কি ব্যাপার?"

আমি সঙ্কোচ বোধ করলাম একটু। আমার মনের একটা অংশ চাইছে তার সঙ্গে দেখা করে কথাটা বলতে কিন্তু অন্য অংশটি ফোনেই কাজ সেরে নিতে চাইলো, তাহলে অন্তত অস্বস্তিটা কম হবে। অবশ্য থানার ভেতরে জোড়ায় জোড়ায় চোখ ঘুরে ফিরছে আমার দিকে। তার চেয়েও বেশি সংখ্যক কান খাড়া হয়ে আছে কথা শোনার জন্য। আমাকে যে একটা মেয়ে ফোন করেছে এটা বাকিদের কাছে ছড়িয়ে পড়তে কয়েক সেকেন্ড লেগেছিলো মনে হয়। তাছাড়া মিলির কেসটা নিয়ে থানার ভেতরে কথা বলাটাও নিরাপদ ছিলো না। তাই বাধ্য হয়েই সমস্ত সঙ্কোচ ভুলে কথাটা বললাম তাকে।

"ইয়ে, মানে...একটা কথা বলার ছিলো।"

"হুম, বলেন?" আগ্রহি হয়ে উঠলো সে।

"না, মানে...কাল একটু দেখা করা যাবে? একটা দরকার ছিলো।"

"আগামিকাল তো দেখা করতে পারবো না। ইনফ্যাক্ট দু-দিনের আগে দেখা করা সম্ভব হবে না বোধহয়।"

আমি একটু অবাক হলাম কথাটা শুনে। "কেন?"

"কাল আমার একটা অপারেশন আছে।"

"অপারেশন?"

"আমার পায়ের বুড়ো আঙুলের উপর ছোট্ট একটা ফোঁড়ার মতো কি

gronthagaar.blogspot.com

জানি হয়েছে, ডাক্তার বলেছে ওটা অপারেশন করতে হবে। আগামিকাল সকালে অপারেশ।”

“বলেন কি? টিউমার নাকি?”

“না, না। সে-রকম কিছু না। অনেক আগেই ডাক্তার বলেছিলো ওটা অপারেশন করে রিমুভ করে দিতে কিন্তু আই হেট সার্জারি। ভীষণ ভয় লাগে।” কথাটা বলেই হেসে ফেলেছিলো। “আপনি জানেন, এই ভয়ে আমি নাক ফুটো করিনি এখনও।”

যে মেয়ে নাক ফুটো করার সাহস নেই সে দেবে খুনি-ধর্ষকের বিরুদ্ধে সাক্ষি!

“কেন জানি সার্জারি, কাটাকুটি একদম পছন্দ করি না। ইউ নো, আমি সহজে ইনজেকশন দিতেও রাজি হই না।” ফোনের অপর পাশ থেকে হাসির শব্দ শোনা গেলো।

আমিও হেসে ফেললাম তবে নিঃশব্দে। আমার সেই হাসি যে রামজিয়ার পক্ষে দেখা সম্ভব নয় সেটা যেন খেয়ালই ছিলো না। “তাহলে কবে দেখা করবো?” জানতে চাইলাম আমি।

“আপনি সামনের সোমবার বিকেল চারটায় আলিয়ঁস ফ্রাঁসেজে চলে আসুন...আমি একটা কাজে ওখানে যাবো, কাজ সেরে আপনার জন্য অপেক্ষা করবো ক্যাফে'তে...ওদের কফিটা দারুণ। আই লাইক ইট।”

তার সাথে দেখা করার জন্য মাঝখানের দুটো দিন অপেক্ষা করলাম বেশ অস্থিরতার মধ্যে। কেন এই অস্থিরতা আমি জানি না। হতে পারে তাকে আবারো দেখতে পাবার খুশি আর হায়দারভায়ের দেয়া প্রস্তাবটির ব্যাপারে আমার অস্বস্তি–দুটো মিলে মিশ্র অনুভূতির জন্ম নিয়েছিলো আমার মধ্যে।

দু-দিন পর বিকেলের শেষের দিকে রামজিয়ার সাথে আমি দেখা করলাম আলিয়ঁস ফ্রাঁসেজে। ঐ জায়গাটা তখন বেশ নিরিবিলি ছিলো। ধানমণ্ডি তখনও বিশুদ্ধ আবাসিক এলাকা, মানুষজনও ছিলো খুব কম।

চটি পরা রামজিয়ার ডানপায়ের বুড়ো আঙুলের দিকে তাকালাম, একটা টেপ ব্যান্ডেজ দেখতে পেলাম সেখানে।

“পায়ের কি অবস্থা?” জানতে চাইলাম।

“সিরিয়াস কিছু ছিলো না। পনেরো মিনিটের ছোট্ট একটা সার্জারি। এখন একদম ঠিক আছি। স্টিচ খুলবে পরশু।”

এরপর টুকটাক অন্য কথা বলে অবশেষে কফি খেতে খেতে সাহস করে হায়দারভায়ের প্রস্তাবটা দিয়েই ফেললাম তাকে।

gronthagaar.blogspot.com

কথাটা শুনে যতোটা চমকে যাবে, অবাক হবে বলে ভেবেছিলাম ততোটুকু হলো না। নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে একটু ভেবে নিলো সে। "মিলি আমার খুব ঘনিষ্ঠ বান্ধবি, ওর জন্য এটুকু করা তো আমার দায়িত্ব, তাই না?"

আমি হ্যা-না কিছুই বললাম না।

"এতে করে যদি কেসটায় সুবিধা হয় তাহলে কেন নয়," কফিতে চুমুক দিলো।

আমি তার এমন সহজ-সরলভাবে রাজি হয়ে যাওয়াতে রীতিমতো ভড়কে গেলাম। যে মেয়ে ইনজেকশন দিতে, নাক ফুটো করতে ভয় পায় সে কী না...! ভেবে-চিন্তে বলছে তো? কাজটা যে ঝুঁকিপূর্ণ সে কি জানে না?

"আপনার ভয় করছে না?" কথাটা না বলে পারলাম না।

"কেন? ভয় কিসের? ঐ ইমতিয়াজকে?"

এটা তার সারল্য নাকি সাহস বুঝে উঠতে পারছিলাম না। "সে আপনাকে হুমকি দিতে পারে? ক্ষতি করারও চেষ্টা করতে পারে?"

একটু ভাবলো রামজিয়া। "একটু ঝুঁকি তো নিতেই হবে, তাই না? আমরা সবাই যদি ভয়ে পিছিয়ে যাই তাহলে মিলির হত্যার বিচার হবে কিভাবে?"

আমি কিছু না বলে চুপ মেরে রইলাম। নিজেকে কাপুরুষ বলে মনে হলো আমার। একাত্তরে যুদ্ধে যাইনি, আর এখন একটা মেয়ে ঝুঁকি জানা সত্ত্বেও ইমতিয়াজের বিরুদ্ধে যখন সাক্ষি দিতে রাজি হচ্ছে তখন তাকে সাহস না জুগিয়ে উল্টো ভড়কে দিচ্ছি!

আলিয়ঁস ফ্রাঁসেজ থেকে বের হবার আগে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে নতুন একটা ইংরেজি বই বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলো সে। "আমার এক কাজিন লন্ডন থেকে এটা নিয়ে এসেছে।"

ফ্যাকাশে লাল রঙের একটা বই, নগ্ন এক তরুণীর অর্ধাঙ্গ। বইটার নাম 'দ্য নাইট অব দি জেনারেল।' প্রচ্ছদটা দেখে আমার মিলির কথা মনে পড়ে গেলো। ও ঠিক এভাবেই পড়েছিলো খুন হয়ে।

"আমি পড়েছি, খুব ভালো লেগেছে।"

তার কথায় মুখ তুলে তাকালাম।

"আপনারও হয়তো ভালো লাগবে," হেসে বললো রামজিয়া। "পুলিশ আর মার্ডার মিস্ট্রি...আপনার সাথে যায়।"

বইটা পড়ার জন্য ধার দেয়া হলো বলে খুশিই হয়েছিলাম। এর কারণ

gronthagaar.blogspot.com

অবশ্যই আমি বইয়ের পোকা বলে নয়। বইটা ফেরত দেবার জন্য তার সাথে আরেকবার দেখা হবার সুযোগ পাবার জন্য!

সৌজন্যতা দেখিয়ে রামজিয়াকে একটু এগিয়ে দেবার জন্য বললে সে হাসিমুখেই রাজি হয়ে গেছিলো।

আমরা রিক্সা না নিয়ে ধানমণ্ডির নির্জন পথ ধরে কথা বলতে বলতে হেটে যাচ্ছিলাম।

"আপনার বিয়ের কী খবর?" কথাটা কেন বললাম জানি না। সম্ভবত আর কোন কথা খুঁজে না পেয়ে, কিংবা আমার মনের গহীনে লুকিয়ে থাকা কৌতুহল—আমি নিশ্চিত নই।

তার অভিব্যক্তি দেখে মনে হলো প্রশ্নটা তাকে একটু অবাক করেছে।

"খবর আবার কি," হেসে বললো সে, "আমি তো কবেই না করে দিয়েছি। আপনাকে বলেছিলাম না, ভুলে গেছেন?"

"না, সেটার কথা বলছি না, নতুন কোন প্রপোজালের কথা বলছিলাম। আমার তো মনে হয় প্রায়ই আপনার বিয়ের সম্বন্ধ আসে।"

মুখ টিপে হাসলো রামজিয়া, "অনার্স পাস করার আগে থেকেই আসছে, আমি পাত্তা দেই না। তবে ইদানিং আব্বু-আম্মু খুব জ্বালাচ্ছে। আত্মীয়-স্বজন সব আমার বিয়ের জন্য হুমরি খেয়ে পড়েছে, বুঝলেন। মনে হয় আমার বিয়ের জন্য তাদের রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে।" কথাটা বলেই মোহনীয়ভাবে হেসে ফেললো সে।

"আপনি রাজি হচ্ছেন না কেন?"

"আপনাকে মনে হয় বলেছিলাম, আমি আসলে সেটেল্ড ম্যারেজকে খুব হেইট করি। কেমনজানি লাগে। চিনি না জানি না এমন একজনকে...ইউ নো, আই জাস্ট হেইট ইট।"

সৌজন্যতা দেখিয়ে আমিও হেসে ফেললাম। কিছু বলতে যাবো অমনি থমকে দাঁড়ালাম, আমার সাথে সাথে রামজিয়াও। বিস্ময়ে দুচোখ বিস্ফোরিত হলো আমার।

আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ইমতিয়াজ!

তার চোখেমুখে কেমন বেপরোয়া হাসি। আমাদের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে। লক্ষ্য করলাম হায়দারভায়ের সৃষ্টিকর্ম এখনও তার মুখমণ্ডল থেকে পুরোপুরি দুরীভূত হয়ে যায় নি। ধর্ষকের নাক একটু ফুলে আছে। কালশিটে পড়ে গেছে বাম চোখের নীচে।

"কি খবর, রামজিয়া? কেমন আছো?"

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

আমি রামজিয়ার দিকে তাকালাম। সে কিছুটা ভড়কে গিয়ে চেয়ে রইলো, ইমতিয়াজের কথার কোন জবাব দিলো না।

"পুলিশ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছো...ঘটনা কি?" আমাদের আরো সামনে এসে বললো জামিনে বের হয়ে আসা খুনি।

ইমতিয়াজের দিকে অবিশ্বাসে, ক্ষোভের সাথে তাকালাম আমি। চোখেমুখে লাম্পট্য ভর করেছে যেন। একইসাথে সেই চোখে বেপরোয়া মনোভার আর প্রচ্ছন্ন হিংস্রতা। টের পেলাম রামজিয়া আমার বামহাতটা ধরে ফেলেছে। চমকে উঠে তাকালাম তার দিকে।

"চলেন," দৃঢ়ভাবে বললো সে।

আর দেরি না করে ইমতিয়াজকে পাশ কাটিয়ে আমরা পা বাড়ালাম সামনের দিকে। পেছন থেকে শিষ বাজিয়ে উঠলো মিলির খুনি।

কয়েক গজ এগিয়ে যাবার পর আমি পেছন ফিরে দেখি ইমতিয়াজ আমাদের দিকে চেয়ে আছে চোখেমুখে অদ্ভুত এক ভঙ্গি করে। আমি মুখ ঘুরিয়ে সামনের দিকে পা বাড়ালাম। একজন খুনির এমন দুঃসাহস দেখে রীতিমতো হতবাক হয়ে গেছিলাম সেদিন।

Gronthagaar.blogspot.com

অধ্যায় ২৮

ইমতিয়াজের সাথে রাস্তায় দেখা হয়ে যাবার কথাটা আমি হায়দারভাইকে বলিনি। জানতাম, রেগেমেগে মাথা গরম করে তিনি উল্টাপাল্টা কিছু করে ফেলতে পারেন। তবে রামজিয়া যে সাক্ষি দিতে রাজি হয়েছে এ কথাটাও তাকে বলিনি। একটা মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছিলাম আমি। তাকে বলেছিলাম, সাক্ষি দিতে রাজি হয়নি!

হায়দারভায়ের কাছে মিথ্যেটা বলতে খুবই খারাপ লেগেছিলো আমার। যদিও আমার বলা নির্জলা মিথ্যেটা কোন রকম সন্দেহ না করেই বিশ্বাস করেছিলেন তিনি।

"এটাই স্বাভাবিক," মিথ্যেটা শোনার পর আস্তে করে বলেছিলেন। "এদের মতো মানুষজন এরকম ঝামেলায় জড়াবে না।"

কিন্তু রামজিয়া ওদের মতো ছিলো না।

মিলি হত্যা মামলার চার্জশিট দেবার আগেই আরেকটা ঘটনা ঘটলো। মিনহাজ থানায় এসে জানালো কাউকে কিছু না জানিয়ে তাদের দোতলার ভাড়াটিয়া বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে! ব্যাঙ্ক থেকে বাসায় ফিরে সে দেখে বাড়ি খালি। বাড়িওয়ালাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে সে জানতে পেরেছে, হুট করে ঢাকার বাইরে ভদ্রলোকের বদলি হয়ে যাওয়াতে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে তারা। কথাটা মিনহাজ বিশ্বাস করেনি, ভদ্রলোকের অফিসে গিয়ে দেখে দিব্যি অফিস করছে। তাকে দেখে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে সে। তার চাকরির যে বদলি হয়নি সেটা বুঝতে পেরেছে মিনহাজ।

এটা যে ইমতিয়াজের কাজ সে-ব্যাপারে আমার মনে কোন সন্দেহ ছিলো না। কোন সাক্ষি-প্রমাণ সে রাখতে চাইছে না। মামলাটাকে হাস্যকর আর দুর্বল করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে।

কথাটা আমি হায়দারভাইকে না বলে পারিনি। সব শুনে হায়দারভাই কয়েক মুহূর্ত চুপ মেরে রইলেন।

"দোষটা আমারই," অবশেষে আস্তে করে বলেছিলেন তিনি। "ইমতিয়াজকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় বলেছিলাম তাকে ছাতাসহ কেউ দেখেছে মিলির দরজার সামনে।"

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

"কিন্তু ঐ মহিলা আর তার বাচ্চাটা তো কারোর চেহারা দেখেনি," বললাম আমি।

"সেটা আমরা জানি, খুনি জানে না। ও ধরে নিয়েছে দোতলার ভাড়াটিয়াদের কেউ ওকে দেখেছে।"

কথাটা বলেই হায়দারভাই চুপ মেরে গেলেন। এতে করে আমার ভয় আরো বেড়ে গেলো।

"আপনি আবার এটা নিয়ে উল্টাপাল্টা কিছু করতে যেয়েন না, ভাই," অনুনয় করে বললাম তাকে। "আল্লাহর দোহাই লাগে।"

আমার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে কিছু বলতে গিয়েও বললেন না, আস্তে করে উঠে থানা থেকে বের হয়ে গেলেন।

"কই যান?" আমি পেছন থেকে ডাকলাম।

"সিগারেট আনতে," আমার দিকে না ফিরেই বলেছিলেন।

কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হয়েছিলো তিনি বুঝি এখনই ইমতিয়াজের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চলে যাচ্ছেন, কিন্তু তিন-চার মিনিট পর সত্যি সত্যি সিগারেট নিয়ে ফিরে এসেছিলেন থানার ভেতরে। হাফ ছেড়ে বেঁচেছিলাম আমি।

একটা সিগারেট আমার দিকে বাড়িয়ে নিজেও একটা ধরিয়ে অনেকক্ষণ চুপ মেরে ছিলেন তিনি।

"কোন খবর-টবর রাখো?" অবশেষে বলেছিলেন।

"কিসের খবর?"

"রাজনীতির।"

প্রসঙ্গটা বদলে যাওয়াতে একটু খুশিই হলাম। "রাজনীতির আবার কী হলো?"

"শেখসাহেব তো বাকশাল করতে যাচ্ছেন," একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলেছিলেন। "এক নেতা এক দেশ, শেখ মুজিবের বাংলাদেশ!" একটু ব্যঙ্গ করে বললেন। "শেষ পর্যন্ত সেটাই হচ্ছে।"

এসব কথা আমিও শুনেছি। সত্যি বলতে আমার পূর্ণ সমর্থন ছিলো এ ব্যাপারে। আমার মনে হতো, দেশের যা পরিস্থিতি তাতে এরকম বিরাট বড় একটি পদক্ষেপ ছাড়া আর কোন উপায়ও ছিলো না।

"হুম, সবাই তো বলাবলি করছে এ মাসের মধ্যেই করতে পারেন," বললাম তাকে।

"তোমার ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে খুব খুশি?"

gronthagaar.blogspot.com

মুচকি হাসলাম আমি। "আর আপনার ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে খুব অখুশি হবেন এটা করলে?" আমিও পাল্টা বলেছিলাম।

"শোনো, কেবলমাত্র বোকারাই এমন কাজে খুশি হতে পারে।" কথাটা বলে জোরে টান দিলেন সিগারেটে। "তোমার হায়দারভাই রগচটা হতে পারে, মদ্যপ হতে পারে কিন্তু সে বোকা না।"

যেন ঘুরিয়ে পেচিয়ে বলার চেষ্টা করলেন আমি একটা বোকারহদ্দ!

"এছাড়া তো উনার হাতে আর কোন অপশনও নেই। আপনিই বলেন, উনি আর কী করতে পারেন?"

বাঁকাহাসি দিলেন এসএম হায়দার। "চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম। স্কুলের বইতে এমন উপদেশমূলক কথা নিশ্চয় তুমিও পড়েছো।"

"আপনি কি বলতে চাইছেন?"

"উনার উচিত ছিলো নিজের দলের ভেতরে আগাছা সাফ করা। চাটার দলকে ঝেটিয়ে বিদায় করা। কম্বল চোরদের পাছায় লাথি মারা। ইমতিয়াজের মতো জঘন্য খুনিকে যারা প্রশ্রয় দেয় তাদেরকে দল থেকে বের করে দেয়া। বুঝলে?"

আমি চুপ মেরে রইলাম। জানি, তার কথা এখনও শেষ হয়নি।

"কিন্তু উনি সেটা না করে সব দলকে বিলুপ্ত করে একটা দল করতে যাচ্ছেন, কাদের সঙ্গে নিয়ে? ঐসব আগাছাদের নিয়ে।" সিগারেটটায় সুখটান দিয়ে ফেলে দিলেন। তারপর পা দিয়ে এমনভাবে পিষে ফেললেন যেন সমস্ত রাগ-ক্ষোভ ঐ উচ্ছিষ্টের উপরে প্রয়োগ করেই প্রশমিত করার চেষ্টা করলেন।

"আগে বাকশাল করতে দেন, তারপর দেখবেন আস্তে আস্তে উনি সব আগাছাও সাফ করে ফেলবেন," আমি আশাবাদি কণ্ঠে বলে উঠলাম। "মানুষটাকে তো সময় দিতে হবে, নাকি?"

"আমি সময় দেবার কে?" বাঁকাহাসি ঠোঁটে লাগিয়ে প্রশ্নটা করলেন তিনি।

"আপনি মানে, জনগণ।"

"আরে, তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ তো তুমি রাখছো না। তারা তোমাকে সময় দিলো কি দিলো না সেটা বুঝবে কেমনে? তারা তোমার কাজ-কর্ম পছন্দ করছে কি-না সেটাও তো জানার উপায় থাকবে না।"

"উনি সবাইকে এক করে একটা দল করতে যাচ্ছেন, এক ছাতার নীচে আনতে চাইছেন।"

"জনগণ কি উনাকে সেই মেন্ডেট দিয়েছে?" হায়দারভায়ের ক্ষুরধার যুক্তি। "উনি কি জনগণের কাছে সেই মেন্ডেট চেয়েছেন?"

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

আমি মাথা দোলালাম। "আপনি বলতে চাইছেন, উনার উচিত ছিলো আগে জনগণের কাছে এ বিষয়ে মেন্ডেট নেয়া?"

"তুমি এতো বড় একটা বিপ্লব করতে যাবে, জনগণের মেন্ডেট ছাড়া?" পাল্টা প্রশ্ন করে বসলেন তিনি। "তাদের সমর্থন ছাড়া?"

"এখন তো সেই পরিস্থিতি নেই। এটা আপনিও বোঝেন, আমিও বুঝি। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন দিয়ে মেন্ডেট নিয়ে এতোবড় কাজ করা সম্ভব নয়। এটা এখন জরুরি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

"শোনো, আমি রাজনীতির ঘোরপ্যাচ বুঝি না, আমি যেটা বুঝি সেটা খুবই সহজ-সরল। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানিদের সাথে আমাদের থাকাটা হলো না কিন্তু গণতন্ত্রের জন্যই। সত্তুরের নির্বাচনের ফলাফল ওরা মেনে নিলো না। আমরা বুঝে গেলাম ওদের সাথে আর থাকা যাবে না। ওরা গণহত্যা শুরু করলো, আমরা রুখে দাঁড়ালাম। নয় মাসের যুদ্ধে দেশ স্বাধীন হলো। এখন যদি তুমি সেই স্বাধীন দেশে গণতন্ত্রকে পাশ কাটাতে চাও তাহলে বুঝতে হবে তোমার চিন্তা-ভাবনায় বিরাট বড় গলদ আছে।"

আমি কোন কথা বললাম না।

"মনে করো তোমাকে আমি এক সের দুধ দিলাম কিন্তু সেটা রাখার জন্য তোমার হাতে কোন পাত্র নাই...তুমি ঐ দুধ কতোক্ষণ দু-হাতে ধরে রাখতে পারবে?"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালাম আমি। রূপকধর্মি কথাটার অর্থ পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

"ব্রাদার, দুধ হলো তোমার স্বাধীনতা, উন্নতি, আইনের শাসন, আর পাত্রটা হলো গণতন্ত্র। বুঝেছো?"

আমি আস্তে করে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। "এ কাজে সবাই উনাকে সমর্থন দেবে না। সেটা আমি যেমন জানি আপনিও জানেন।"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন হায়দারভাই।

"আপনার ঐ ত্রিশ-বত্রিশ পার্সেন্টের কথা বলছি।"

সত্তুরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ আসনে বিজয়ি হয়েছিলো–এই ধারণার বিপরীতে আরেকটি সত্য হলো, নৌকা আর বঙ্গবন্ধুর অমন জোয়ারের সময়েও বিপক্ষে ভোট পড়েছিলো ত্রিশ-বত্রিশ শতাংশের মতো। অন্যদের মতো হায়দারভাই এটা ভুলে বসেননি। তিনি সব সময় আমাকে এ কথাটা বলে দেশের জনমানুষের সত্যিকারের চিত্রটি তুলে ধরতেন। এই বিশাল সংখ্যক জনগোষ্ঠিকে কিভাবে মোকাবেলা করা হবে তার উপরেই

gronthagaar.blogspot.com

নাকি দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে–তার এমন কথার সাথে অবশ্য আমি একমত পোষণ করতে পারতাম না।

"ওরা তো শেখ মুজিবের নীতি পছন্দ করে না।" তাকে চুপ থাকতে দেখে বললাম আমি। "তাহলে আপনিই বলেন, সবার মেন্ডেট নিয়ে বাকশালের মতো বিরাট বড় কাজ করা কি সম্ভব হবে কোনদিন?"

"আমি সবার কথা বলছি না, আমি বলছি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতামতের কথা। সেটা কি তুমি পরোয়া করবে না? নাকি তুমি বুঝে গেছো, এখন আর তোমার পাশে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ নেই? যদি তা-ই হয়ে থাকে তাহলে তো তুমিই এরজন্যে দায়ি। ঐ ত্রিশ-বত্রিশকে তুমি দিন দিন বাড়িয়ে তুলছো।" কথাটার ইঙ্গিত বুঝতে অসুবিধা হলো না আমার।

এরকম অনেকক্ষণ ধরে চললো আমাদের রাজনৈতিক তর্ক। বরাবরের মতোই আমি সুবিধা করতে পারলাম না। এটা হতে পারে, যে দলকে আমি সমর্থন করি সে দলের ভুল নীতি কিংবা এসএম হায়দারের ক্ষুরধার যুক্তির কারণে–আমি নিশ্চিত ছিলাম না পুরোপুরি। তবে সঙ্গোপনে নিজেকে প্রবোধ দিতাম, হায়দারভায়ের যুক্তি এমনই, তিনি যদি কোন পক্ষ অবলম্বন করেন তাহলে সেটাই যুক্তিযুক্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন।

এই তর্কের কয়েক দিন পরই, ২৪ শে জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু তার দ্বিতীয় বিপ্লব বাকশাল প্রতিষ্ঠিত করলেন। বন্ধ হয়ে গেলো সদ্য প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ ছাড়া বাকি সব রাজনৈতিক দল। সরকারি সংবাদপত্র ছাড়া বাকি সব পত্রিকাও বন্ধ করে দেয়া হলো। এর আগে ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে জারি করা হয়েছিলো জরুরি অবস্থা।

এদিকে মিলির মামলাটা পড়ে গেলো এক চোরাবালিতে। সেখান থেকে যেন উঠে আসার কোন সম্ভাবনা নেই। ইমতিয়াজকে খুনি আর ধর্ষক হিসেবে প্রমাণ করার সব উপায় একে একে বন্ধ হয়ে গেলো। বুক ফুলিয়ে সদর্পে ঘুরে বেড়াতে লাগলো সে।

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

অধ্যায় ২৯

বই দেয়া-নেয়ার সুবাদে রামজিয়ার সাথে আমার আরো দুয়েকবার সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য দেখা হয়েছিলো। আর প্রতিবারই আমি গিয়েছিলাম সাদা পোশাকে। সম্ভবত এর কারণ, সে বলেছিলো সাধারণ পোশাকে আমাকে বেশি মানায়। আমার অবচেতন মন আর পুলিশ ইউনিফর্ম নিয়ে তার সামনে যেতে চায়নি হয়তো।

যাই হোক, আমাদের মতো মিলির মামলাটা নিয়ে সে-ও খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলো। সময় বয়ে গেলেও আমি তাকে নতুন কোন আশার বাণী শোনাতে পারিনি। কবে তাকে আদালতে গিয়ে সাক্ষি দিতে হবে জানতে চাইলে বলেছিলাম, মামলা কোর্টে উঠলেই জানাতে পারবো।

এপ্রিলের দিকে রামজিয়া একদিন ফোন করে আমাকে দেখা করার কথা বললো। যথারীতি চলে গেলাম নিউ মার্কেটের ঐ কফি শপে। কফি খেতে খেতে সে জানালো গত দু-তিন ধরে ইমতিয়াজকে নাকি তার বাড়ির সামনে ঘোরাফেরা করতে দেখছে।

কথাটা শুনে আমার বুক কেঁপে উঠেছিলো। অবিশ্বাস্য ব্যাপার! দিন দিন ঐ খুনির সাহস বেড়েই চলেছে। সে এখন নিজেকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে একজন বলে মনে করছে! কতো বড় আস্পর্ধা, রামজিয়ার বাড়ির সামনে ঘুরঘুর করে!

সত্যি বলতে রাগে আমার গা রি রি করে উঠছিলো। বুঝতে পারছিলাম না কী বলবো। তবে কিছু একটা যে করা উচিত সে ব্যাপারে আমার মনে কোন সন্দেহ ছিলো না।

"আমি যে সাক্ষি দেবো এ কথা কি ইমতিয়াজ জানে?"

"আরে, না," এই সম্ভাবনা একদম নাকচ করে দিলাম। রামজিয়া যে মিলির কেসে সাক্ষি দেবে সে-কথা আমি হায়দারভাইকেই বলিনি। আমি বরং বলেছি, সাক্ষি দিতে সে রাজি হয়নি। "এটা আমি আর হায়দারভাই ছাড়া আর কেউ জানে না এখন পর্যন্ত।"

"তাহলে?"

"বুঝতে পারছি না।" কথাটা বললাম বটে কিন্তু ইমতিয়াজের উদ্দেশ্য কি

gronthagaar.blogspot.com

সেটা নিয়ে ভাবতে গিয়ে অন্য একটা অশঙ্কা জেঁকে বসলো আমার মধ্যে। ওর মতো খুনি-ধর্ষক কি তাহলে রামজিয়ার দিকে কু-নজর ফেলেছে?

"আমার কি জিডি করা উচিত?"

তার কথায় সম্বিত ফিরে পেয়ে দেখি কফিতে চুমুক দিচ্ছে। "জিডি?" পুণরুক্তি করলাম।

"হুম।"

"শুধুই ঘুরঘুর করছে নাকি আরো কিছু করেছে?"

"আরো কিছু মানে?"

"কথা বলতে চেয়েছে আপনার সাথে? বাড়ি থেকে বের হবার সময় ফলো করেছে?"

"না। দু-তিন ধরে দেখি বাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করছে। ওর সঙ্গে আরেকটা ছেলেও থাকে, হ্যাংলা মতোন।"

একটু ভেবে জবাব দিলাম, "আজকে দেখেছেন?"

"না।"

"আচ্ছা, আরো কয়েকটা দিন দেখেন, তারপর আমাকে জানান। এমনও হতে পারে ওখানে সে কোন কাজে গেছিলো। ঐ এলাকায় একটা বাড়ি দখল করেছে ওরা। হয়তো সেজন্যেই ওখানে দেখতে পাচ্ছেন।" রামজিয়াকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলাম।

"বাড়ি দখল করেছে?!" কথাটা শুনে বিস্মিত হলো সে। "ওর মতো একটা স্কাউন্ড্রেল!"

"ও দখল করেনি," পরিস্কার করে দেবার জন্য বললাম, "এক নেতা দখল করেছে। ওরা কয়েকজন সেই নেতার হয়ে বাড়িটা দখল করে রেখেছে।"

"ঐ নেতাই কি মিলির কেসটা নিয়ে ইন্টারফেয়ার করছে?"

মাথা নেড়ে সায় দিলাম আমি।

"মাই গুডনেস।"

তার বিস্মিত হবার কারণটা যতোই অপ্রীতিকর হোক না কেন, অভিব্যক্তিটা ছিলো হৃদয়হরণকারি! তার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে না থেকে পারিনি।

কফি শেষ করে নিউ মার্কেট থেকে বের হবার সময় সাহস করে বলে ফেললাম, তাকে যদি বাড়ি পর্যন্ত পৌছে দেই তাহলে কিছু মনে করবে কি-না।

gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

"আপনি আমার বডিগার্ড হতে চাইছেন?" বলেই মুখচাপা দিয়ে হেসে ফেলেছিলো সে।

তার এমন কথায় আমি কিছুটা বিব্রত হয়ে পড়ি। সম্ভবত সেটা রামজিয়াও বুঝতে পেরেছিলো।

"ওয়েল, তার কোন দরকার নেই, তবে..."

আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালাম।

"আপনি যদি চান তাহলে পৌছে দিতে পারেন।"

তারপর আমাকে অবাক করে দিয়ে একটা রিক্সা ডেকে বসলো সে। আমি অবশ্য পাশাপাশি হাটার চেয়ে বেশি কিছু ভাবিনি।

পছন্দের কারো সাথে এক রিক্সায় পাশপাশি বসলে কী রকম অনুভূতি হতে পারে সেটা নিশ্চয় ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। লোকজন আমার দিকে ঈর্ষার চোখে তাকাচ্ছে সেটা বুঝতে পেরে আরো বেশি ভালো লাগার অনুভূতি তৈরি হলো!

রিক্সা চলতে শুরু করলে আমি তার চুলের গন্ধ পেতে শুরু করলাম। রামজিয়া শেহরিন নামের অধরার পাশে বসে আমি যেন পুরোপুরি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়লাম সেই মুহূর্তে। নিউ মার্কেট থেকে ওদের বাড়ি বড়জোর পাঁচ মিনিটের পথ, কিন্তু সেই পাঁচ মিনিট চলে গেলো এক লহমায়!

সেই সাথে আমার সুখকর মুহূর্তটি!

"দেখেন!" তাদের বাড়ির সামনে রিক্সাটা চলে আসতেই আমার বাহুটা খপ্ করে ধরে বলে উঠলো রামজিয়া।

আমি অবিশ্বাস্য চোখে দেখতে পেলাম ইমতিয়াজ দাঁড়িয়ে আছে আমাদের রিক্সা থেকে কয়েক হাত দূরে। তার চোখেমুখে কেমন এক লাম্পট্য। মনে হলো অজ্ঞাত কারণে বেশ ক্ষুব্ধও সে!

আমরা রিক্সা থেকে নামার আগেই হেলেদুলে আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালো।

"কি ব্যাপার, রামজিয়া, সব সময় পুলিশ নিয়ে ঘুরে বেড়াও নাকি?" আমার দিকে তাচ্ছিল্যভরে তাকালো।

"হাউ ডেয়ার ইউ আর! আমি কার সাথে ঘুরে বেড়াবো না বেড়াবো সেটা তোমাকে বলে কয়ে করতে হবে নাকি?" চটে গেলো সে।

নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলাম না। "ইমতিয়াজ–!"

"অ্যাই!" আমার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে উঠলো মিলির খুনি। "ওর সাথে আমি কথা বলছি, আপনার সাথে না। ঠিক আছে? ওকে আমি

gronthagaar.blogspot.com

বহুদিন ধরে চিনি, আপনার মতো দু-দিন ধরে খাতির জমানো লোক আমি না।"

"ইমতিয়াজ, আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাচ্ছি না। ওকে? লিভ আস অ্যালোন!" অনেকটা চেঁচিয়ে বলে উঠলো রামজিয়া।

"লে হালুয়া! আমার সাথে কথা বলবে না কেন? আমি কী করেছি?" কষ্ট পাবার কপট ভঙ্গি করলো সে।

রেগেমেগে মুখ সরিয়ে নিলো রামজিয়া। রাগে আমার গা পুড়ে যেতে লাগলো। সাদা পোশাকে আছি, সঙ্গে ওয়েম্বলি অ্যান্ড স্কট রিভলবারটাও নেই। আর কারো সঙ্গে আগ বাড়িয়ে মারামারি করাও আমার স্বভাব ছিলো না। অনেকটা অসহায়ের মতো রিক্সায় বসে ছিলাম ঐ মুহূর্তে।

"তুমি বুকে হাত দিয়ে বলো তো, আমি মিলির সাথে ওরকম কাজ করতে পারি?" কথাটা বলার সময় রামজিয়ার বুকের দিকে তার লম্পট দৃষ্টি হানলো। ঠোঁট দুটো কেমন লম্পটের মতো সংকুচিত করে 'বুক' শব্দটা উচ্চারণ করলো সে। "বলো না...বুকে হাত দিয়ে বলো!"

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। রিক্সা থেকে নেমে ইমতিয়াজের কলার চেপে ধরলাম।

শূয়োরের বাচ্চা! তোর কতো বড় আস্পর্ধা! তুই–"

সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলো খুনি। রামজিয়ার চিৎকারটা আমার কানে গেলেও সেদিকে না তাকিয়ে আবারো ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবো ইমতিয়াজের উপর তার আগেই সে কোমর থেকে পিস্তল বের করে আমার বুকে তাক্ করে ফেললো! জমে গেলাম আমি।

"এক্কেবারে ফুটা কইরা দিমু!" দাঁতে দাঁত খিচে বলে উঠলো ইমতিয়াজ। রাগে কাঁপছে এখন। মুখ থেকে প্রমিত ভাষাও উধাও হয়ে গেছে। কেমন উন্মাদগ্রস্ত বলে মনে হলো তাকে। "তোর পুলিশগিরি গোয়া দিয়া ভইরা দিমু, চুতমারানির পোলা!"

আমি হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলাম খুনির দিকে। দু-বছর ধরে পুলিশে চাকরি করছি, দুয়েকবার পিস্তল বের করে আসামির দিকে তাক করলেও আমার দিকে কেউ কখনও এ জিনিস তাক্ করেনি।

"মাইয়া মানুষের সামনে বাহাদুরি দেখাইতে আইছোস!"

পিস্তলের নল দিয়ে আমার বুকে একটা গুঁতো দিলো সে। আমার হৃদস্পন্দন বন্ধ হবার উপক্রম হলো। যেকোন সময় বের হয়ে যেতে পারে গুলি!

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

"ইমতিয়াজ, প্লিজ! তুমি কি পাগল হয়ে গেছো!" রামজিয়া বলে উঠলো এবার।

টের পেলাম রিক্সা থেকে নেমে আমার কাঁধ ধরে টেনে সরিয়ে দিতে চাইছে সে।

"ফর গড সেক, লিভ আস অ্যালোন!"

তাচ্ছিল্যভারে হেসে উঠলো ইমতিয়াজ। পিস্তলটা নামিয়ে ফেললো এবার। রামজিয়া আমাকে টেনে তাদের বাড়ির মেইনগেটের সামনে নিয়ে গেলো।

"তোর মতো দুই টাকা দামের ঠোলা আমার পকেটে থাকে, বুঝলি?" পিস্তলটা শূন্যে নেড়ে বলে উঠলো। "শালার দুই পয়সার ঠোলা...বড়লোকের মাইয়া পটাইয়া ফালাইছে! এই মাইয়ার বাড়ির চাকর হওনের যোগ্যতাও তোর নাই!"

"অ্যাই! একদম চুপ!" বিস্ফারিত হলো রামজিয়া শেহরিন। "গেট লস্!"

আমি রীতিমতো হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম ইমতিয়াজের এমন আচরণে, এমন সব কথাবার্তায়। মূর্তির মতো ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে ছাড়া আর কিছুই করতে পারিনি।

রামজিয়াদের বাড়ির দারোয়ান হৈ-হল্লা শুনে বের হয়ে এসে দেখে আমাদেরকে। ততোক্ষণে ইমতিয়াজ কোমরে পিস্তল গুঁজে হাটা ধরেছে। যেতে যেতে আরো কিছু জঘন্য গালিগালাজ করলো সে।

পুরোপুরি ধাতস্থ হতে কয়েক মিনিট লেগে গেছিলো আমার। রামজিয়া আমাকে তাদের বাড়িতে কিছুক্ষণ থেকে যেতে বললেও আমি রাজি হইনি। অপমানে বিধ্বস্ত হয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসি থানায়।

gronthagaar.blogspot.com

অধ্যায় ৩০

"শূয়োরের বাচ্চা!" টেবিলে ঘুষি মেরে বলে উঠলেন এসএম হায়দার।

থানায় এসে তাকে পুরো ঘটনাটা না বলে আর থাকতে পারিনি। যদিও জানতাম এর প্রতিক্রিয়া কেমন হবে, তারপরও এতো বড় একটি ঘটনা তাকে না জানিয়েও কোনো উপায় ছিলো না আমার।

"পুলিশকে পিস্তল দিয়ে ভয় দেখায়! হারামজাদারে আমি..." দাঁতে দাঁত পিষে বলে উঠলেন।

"ভাই, মাথা ঠাণ্ডা রাখেন–"

"আরে, রাখো তোমার মাথা ঠাণ্ডা!" আমার কথার মাঝখানে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন তিনি। "এর একটা বিহিত করতেই হবে।"

"কি বিহিত করবেন?" অসহায়ের মতো বলে উঠলাম আমি।

"সবার আগে ওর নামে একটা জিডি করতে হবে। এক্ষুণি!"

"এক্ষুণি? ওকে ফোন করে আগে বলতে হবে না, ডিজি করতে রাজি আছে কি-না?"

"কার কথা বলছো?" চটে গেলেন তিনি।

"রা-রামজিয়া?"

"আরে, ধুর্!" যারপরনাই বিরক্ত হলেন এবার। "জিডি তো করবে তুমি...ঐ মেয়ের কথা বলছো কেন! আজব!"

কথাটা শুনে হুঁশ হলো আমার। তাই তো! ইমতিয়াজ আমার সাথে যা করেছে তাতে করে আমারই জিডি করার কথা।

"তুমি না, ইয়ে..." বিরক্তির চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটিয়ে বলে উঠলেন এসএম হায়াদার।

এই 'ইয়ে'টা কি আমি জানতাম। কাপুরুষ! ভীতু!

"কোন্ দুঃখে যে পুলিশে ঢুকেছো বুঝি না।" চেয়ারে বসে পড়লেন তিনি। "এতো কম সাহস নিয়ে, এতো নরম মন নিয়ে তুমি এখানে কেমনে টিকে থাকবে, অ্যা?"

মাথা নীচু করে ফেলতে বাধ্য হলাম। আমি আমার সীমাবদ্ধতার কথা ভালো করেই জানতাম। আর পুলিশে ঢোকার পর পর এই সীমাবদ্ধতাগুলো যেন আরো প্রকট হয়ে ধরা পড়েছিলো নিজের কাছে।

gronthagaar.blogspot.com

রেগেমেগে একটা সিগারেট ধরিয়ে টান দিতে শুরু করলেন হায়দারভাই, আমাকে কোন সিগারেট সাধলেন না। বুঝতে পারলাম, তার চোখে এখন আমি পুলিশের কলঙ্ক।

"আরে, মর জ্বালা! বসে আছো কেন?" রেগেমেগে আমার দিকে তাকালেন। "যাও, এক্ষুণি জিডি করে ফেলো। ও পিস্তল দিয়ে তোমাকে গুলি করতে চেয়েছিলো...প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে...বুঝলে?"

আমি ঢোক গিললাম।

"ঐ মেয়ের চ্যাপ্টার বাদ! তুমি একটা কাজে গেছিলে ধানমণ্ডিতে, তখন সে তোমাকে এই হুমকি দিয়েছে। মিলির কেসটা নিয়ে যেন বাড়াবাড়ি না করো সেটাও বলেছে, ঠিক আছে?"

আমি বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। বুঝতে পারছিলাম, ইমতিয়াজকে আইনের জালে আটকে ফেলার জন্য ঘটনাটা এভাবে সাজাতে চাইছেন তিনি।

কথামতোই কাজ করলাম আমি। না করে উপায় নেই। এমনিতেই হায়দারভাই রেগে ছিলেন, আমি যদি তার সাথে সামান্যতমও দ্বিমত পোষণ করতাম তাহলে হয়তো আমার উপরেই চড়াও হতেন। তাছাড়া আমিও চাইছিলাম ইমতিয়াজের ব্যাপারে একটা বিহিত করা হোক। জামিনে বের হয়ে আসার পর থেকে সে একের পর এক ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে। সাক্ষিদের ভয়-ভীতি দেখানো থেকে শুরু করে আমার সাথে অমন বেপরোয়া আচরণ–তারচেয়েও বড় কথা, রামজিয়ার বাড়ির সামনে ঘুর ঘুর করছে আজকাল। তার মতলবটা কি?

ইমতিয়াজের কথাগুলো কানে বাজতে লাগলো। অপমানের চাবুক যেন আমাকে ক্ষত-বিক্ষত করে তুললো ভেতরে ভেতরে।

আমি জিডি করার পর পরই হায়দারভাই একটা টিম নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন, আমাকে সঙ্গে নিলেন না। কোথায় যাচ্ছেন–কি করবেন–সে কথা বলার সাহসও দেখাতে পারলাম না আমি।

ঐদিন আমার নাইট-শিফটের ডিউটি ছিলো। হায়দারভাই চলে যাবার পর থানা থেকে আর বের হইনি। রাত আটটার পর টহল দল নিয়ে বের হতে যাবো অমনি ফিরে এলেন তিনি। সঙ্গে করে নিয়ে এলেন হাতকড়া পরা এক আসামিকে।

ইমতিয়াজ!

থানায় যখন ঢুকলেন তখনও হায়দারভায়ের চেহারায় রাগের কোন

gronthagaar.blogspot.com

কমতি নেই। আমার সাথে চোখাচোখি হলেও কিছুই বললেন না। আসামিকে নিয়ে সোজা চলে গেলেন গারদের পাশে টর্চার রুমে। আমি চুপচাপ দেখে গেলাম সেই দৃশ্য।

যেমনটা ভেবেছিলাম, একটু পরই সেই ঘর থেকে ভেসে আসতে লাগলো ইমতিয়াজের আর্তনাদ আর গালাগালি। হায়দারভায়ের প্রতিটা মারের জবাবে সে হুমকি-ধামকি দিয়ে যেতে লাগলো।

ওসিসাহেব তখন থানায় নেই, ফলে হায়দারভায়ের জন্য দারুণ সুযোগ তৈরি হয়ে গেলো। দশ মিনিট পর ঘেমে-টেমে একাকার হয়ে বের হয়ে এলেন তিনি। হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। যাক, অল্পতেই ক্ষান্ত হয়েছেন এবার।

"ইয়াসিন?" এক কনস্টেবলকে ডাকলেন তিনি। "থানার সবগুলো টেলিফোনের রিসিভার তুলে রাখো।"

হায় আল্লাহ্! মনে মনে প্রমাদ গুণলাম।

"সবগুলো?" ইয়াসিন নিশ্চিত হতে চাইলো।

"বললাম না, সব!" চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। ইয়াসিন আর কোন কথা না বলে কাজে লেগে গেলো।

আমার দিকে তাকালে কিছু বলার জন্য চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম কিন্তু তিনি আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে দ্রুত ফিরে গেলেন সেই ঘরে।

ইমতিয়াজের মার খাওয়ার শব্দ আর শুনতে ইচ্ছে করলো না। থানা থেকে বের হয়ে গেলাম পেট্রল ডিউটি দেবার জন্য।

Gronthagaar.blogspot.com

*

পরদিন ইমতিয়াজের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে তাকে কোর্টে তুললে তার জামিন আবেদন নামঞ্জুর হয়ে যায়, দ্বিতীয়বারের মতো জেলে পাঠানো হয় তাকে।

ঐদিন রাতে থানায় ফিরে ওসি আলী ইকরাম অবশ্য ইমতিয়াজের পক্ষ নিয়ে কিছু বলেনি। তার নিজের অধীনে থাকা একজন অফিসারের সাথে ইমতিয়াজ যে আচরণ করেছে সেটা জানার পর আমাকে ডেকে জানতে চেয়েছিলো, আসামির বিরুদ্ধে আমি যে অভিযোগ করেছি সেটা সত্যি কি-না। এমন প্রশ্নে জোর দিয়েই বলেছিলাম, সবটাই সত্যি। এরপর ওসিসাহেব আর কিছু বলেনি।

কিন্তু ইমতিয়াজের কারাবাসের মেয়াদ ছিলো মাত্র পনেরো দিনের।

gronthagaar.blogspot.com

এরপরই সে আবারো জামিনে বের হয়ে আসে। যথারীতি হতাশ হয়ে পড়েন হায়দারভাই। এ ব্যাপারে আমাদের কারোর কিছু করার ছিলো না। খুবই অসহায় লেগেছিলো তখন।

যাই হোক, দ্বিতীয়বার জামিনে বের হয়ে এসে ইমতিয়াজ একেবারে ঘাপটি মেরে রইলো। তাকে কোথাও দেখা যেতো না। তার কোন খবরও আমরা পেতাম না। এমনকি রামজিয়ার বাড়ির আশেপাশেও তাকে আর দেখা যায়নি। বিহারিকাশেমের মাধ্যমে হায়দারভাই জানতে পেরেছিলেন, ধানমণ্ডির দখল করা বাড়িতে আর থাকছে না সে। এসব কারণে আমার মনে হয়েছিলো, সে বোধহয় বুঝতে পেরেছে আগের মতো বেপরোয়া আচরণ আর করা যাবে না।

এদিকে সাক্ষির অভাব, থানার ওসির অসহযোগিতা, সব মিলিয়ে মিলির হত্যা-মামলার চার্জশিট দিতে দেরি হচ্ছিলো। হায়দারভায়ের করার কিছুই ছিলো না। তারপরও হাল ছেড়ে না দিয়ে চেষ্টা করে গেলেন তিনি।

এই সময়ের মধ্যে মিলির স্বামি মিনহাজের সাথে আমার দু-বার দেখা হয়েছে। দু-বারই আমি তাকে মিথ্যে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম। তবে সে ঠিকই বুঝে গেছিলো, মিলির কেসটার কোন ভবিষ্যৎ নেই। এ কথা আমার সামনে প্রকাশ করতেও দ্বিধা করেনি।

রামজিয়ার সাথে আমার যোগাযোগ আগের চেয়ে অনেক কমে গেছিলো। এই দীর্ঘ সময়ে মাত্র একবার, ইমতিয়াজ জেলে যাবার পর কথা হয়েছিলো তার সঙ্গে, তা-ও ফোনে। কিন্তু আমাদের আর দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। বই লেন-দেনও বন্ধ ছিলো। তার সঙ্গে দেখা করতে কেমন সঙ্কোচ বোধ হতো আমার। হঠাৎ মনে পড়ে গেলো শেষবার একটা বই ধার দিয়েছিলো আমাকে সেটা আর ফেরত দেয়া হয়নি। বইটা অনেক আগেই পড়ে শেষ করে ফেলেছিলাম যদিও, তারপর নানান ঘটনার কারণে আর মনে ছিলো না। তাকে ফোন করে বই ফেরত দেবার কথা জানালাম তাই। রামজিয়া বললো, বইটা ফেরত দিতে হবে না। ওটা আপনি গিফট হিসেবে রেখে দিন। তার কণ্ঠ কেমন ম্রিয়মান শোনালো। ধরে নিলাম শরীর খারাপ। কিংবা মন!

"মনে করুন, আপনার বার্থ ডে গিফট এটা।" বলেছিলো সে।

"আমার জন্মদিন তো এখনও আসেনি,"

"আপনার বার্থ ডে কবে?"

আমি তাকে আমার জন্ম তারিখের কথাটা বললাম, যে জন্মদিন এ জীবনে আর পালন করা হয়নি।

gronthagaar.blogspot.com

"ও, তাহলে তো বেশ দেরি আছে।" একটু থেমে আবার বলেছিলো, "ধরে নিন এটা অ্যাডভান্স গিফট।"

"আপনার জন্মদিন কবে?" সৌজন্যতার খাতিরেই জানতে চাইলাম।

"অনেক দেরি...অক্টোবরে," আরো বিষন্ন কণ্ঠে বললো সে।

"ও।" আর কোন কথা খুঁজে না পেয়ে জানতে চাইলাম তার মন খারাপ কি-না।

"হুম।"

অকপটেই বলে দিলো। কোন ভনিতা কিংবা সৌজন্যতা দেখালো না। যেমনটা আমরা সচরাচর করি।

"কেন? কি হয়েছে?"

"বাসায় ঝগড়া করেছি।"

আমি আর কিছু জানতে চাইলাম না। এটা একেবারেই তাদের নিজেদের ব্যাপার। এসব জানতে চাওয়ার মতো ঘনিষ্ঠতা আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠেনি।

"বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছে খুব," নিজে থেকেই বললো।

"ও," আমি আবারো টের পেলাম তার বিয়ের কথা শুনে বুকের গহীনে কোথাও মোচড় দিয়ে উঠছে।

"বাদ দিন এসব। আপনার কি খবর? ইমতিয়াজের কোন খবর জানেন? মিলির কেসটার কি হলো?" এক নাগারে প্রশ্নগুলো করে বসলো সে।

আমি চারপাশটা চকিতে দেখে নিলাম। কমপক্ষে তিন জোড়া চোরাচোখ আমার দিকে নিবদ্ধ। না জানি কয় জোড়া কান খাড়া হয়ে আছে আশেপাশে।

"এই তো, চলে যাচ্ছে," খুবই আস্তে করে বললাম, অযাচিত কান পর্যন্ত যেন সেগুলো না পৌছায়। "দু-সপ্তাহ আগে জামিনে বের হয়েছে, আর কোন সাড়া শব্দ নেই।" ইমতিয়াজের নাম উল্লেখ না করেই বললাম। "আর ওটার কোন অগ্রগতি নেই। আগের অবস্থায়ই আছে।"

"হুম," বললো সে।

আর কোন কথা খুঁজে না পেয়ে আমি বলে উঠলাম, "ঠিক আছে, আজ রাখি। ভালো থাকবেন।"

"আপনিও ভালো থাকবেন। বাই।"

Gronthagar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

অধ্যায় ৩১

কালো দিন

এভাবে আরো কিছুদিন অতিবাহিত হলেও মিলির কেসের কোন অগ্রগতি হলো না। আমি হাল ছেড়ে দিলেও হায়দারভাই লেগে ছিলেন তখনও। দিন দিন সরকারের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে বাকশাল হবার পর থেকে তার সমালোচনা আরো তীব্র আকার ধারণ করলো, মদ খাওয়ার পরিমাণও বেড়ে গেলো আগের তুলনায় অনেক বেশি। আমার ধারণা দেশের অবস্থা, মিলির কেসটার বেহাল দশা আর নিজের ব্যক্তিগত সমস্যায় জর্জরিত হয়ে তিনি মদ্যপানের দিকে আরো বেশি করে ঝুঁকে পড়েছিলেন।

সন্তান না হওয়ার জন্য হায়দারভায়ের মধ্যে দুঃখবোধ কতোটা ছিলো সেটা আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব হয়নি। তিনি এ নিয়ে কোন কথা বলতেন না। তাকে দেখে মনে হতো না এসব বিষয় নিয়ে বিরাট কোন আক্ষেপ আছে। তবে ভাবি যে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ছিলেন সেটা বুঝতে পারতাম।

আমার জীবনের সবচাইতে করুণ অধ্যায়ের শুরুটা বেশ স্পষ্টই মনে আছে। ঘটনার আগের দিন রাতে টহলদল নিয়ে ডিউটিতে ছিলাম আমি, ওয়াকিটকিতে আমাকে জানানো হলো হায়দারভাই মতিঝিল পাড়ার একটি ফুটবল ক্লাবে গিয়ে মদ খেয়ে ভীষণ মারামারি করেছেন। স্থানীয় পুলিশ এসে তাকে থানায় নিয়ে গেছে, আমি যেন সেখানে গিয়ে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসি। সাদা পোশাকে ছিলেন বলে নিজেকে পুলিশ পরিচয় দেবার পরও লোকাল থানা তার কথা বিশ্বাস করছিলো না। তারা আমাদের থানার সাথে যোগাযোগ করলে সেখান থেকে বলা হয়, এসএম হায়দার সত্যি সত্যি একজন সিনিয়র এসআই, তিনি আজিমপুর থানায় কর্মরত আছেন। তবে আটককৃত লোকটি সেই লোক কি-না তা খতিয়ে দেখার জন্য আমাকে সেখানে চলে যেতে বলা হয়।

এটা যে হায়দারভাই সে-ব্যাপারে আমার মনে অবশ্য কোন সন্দেহ ছিলো না। দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে টহল দলটি নিয়েই মতিঝিল থানায় চলে যাই আমি।

gronthagaar.blogspot.com

বিধ্বস্ত, মাতাল আর বেসামাল হায়দারভাইকে দেখে খুব রেগে গেছিলাম আমি। ইচ্ছে করছিলো কড়া করে কিছু কথা শুনিয়ে দেই, কিন্তু সেই ইচ্ছে দমিয়ে তাকে থানা থেকে নিজের হেফাজতে নিয়ে নেই। মাতালদের সাথে মারামারি করে মাথা ফেঁটে গেছে তার। লোকাল পুলিশ হাসপাতালের এমার্জেন্সি থেকে ব্যান্ডেজ করিয়ে নিয়ে এসেছে। ডাক্তার বলেছে, গুরুতর কিছু না। মাত্র দুটো সেলাই দিতে হয়েছে।

"আপনি এসব কী শুরু করেছেন, ভাই?" গাড়িতে করে ফেরার সময় খুব হতাশ কণ্ঠেই বললাম তাকে। "আপনার সমস্যা কী!"

হায়দারভাই ছিলেন পুরো মাতাল, আমার কথার জবাবে মুখ সরিয়ে নিয়েছিলেন।

"আগেও তো মদ খেতেন, কখনও তো এরকম মাতলামি করতে দেখিনি," এবার রাগ দেখিয়ে বললাম। "পুলিশ হয়ে মদ খেয়ে মাতলামি করে পুলিশের হাতেই ধরা পড়েছেন। আপনার লজ্জা পাওয়া উচিত।"

"ব্রাদার," টেনে টেনে বলেছিলেন তিনি, "তুমি আমার দুঃখটা বুঝবে না।"

"রাখেন আপনার দুঃখ," চটে গেছিলাম খুব। "ঐ এক কথা আর বলবেন না। মানুষ দুঃখ পেলে কি এসব খেয়ে মাতাল হয়ে পড়ে থাকে নাকি?"

তিনি গালে হাত দিয়ে চিন্তিত হবার ভঙ্গি করলেন। বুঝতে পারলাম আমার কোন কথাই এখন গুরুত্ব দেবার মতো অবস্থায় নেই।

"থামলে কেন, আরেকটু লেকচার দাও...শুনি।"

রাগে-ক্ষোভে আর অক্ষেপে মাথা দোলালাম আমি। "আপনার অবস্থা তো পুরাই বেসামাল। এই অবস্থায় বাড়িতে যাবেন কিভাবে? ভাবি কিন্তু তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দেবে।"

"কিচ্ছু করবে না ও," বাচ্চাদের মতোন বলে উঠলেন তিনি। "কিচ্ছু না।"

"মানে?" বুঝতে পারলাম না তার কথার অর্থ। "আপনি মদ খেয়ে মাতাল হয়ে বাড়িতে যাবেন আর ভাবি কিচ্ছু করবে না?"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন, তারপর অনেকটা ফুপিয়ে কাঁদার মতো করে বললেন, "ও আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, আর ফিরে আসবে না!"

"কি!" অবাক না হয়ে পারলাম না। "কি বলছেন? ভাবি কোথায় গেছে? কি হয়েছে?" উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

"আমার সাথে ঝগড়া করে চলে গেছে।" তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিলেন।

Gronthagar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম আমি। টহল গাড়িতে আরো দু-জন কনস্টেবল আর ড্রাইভার ছিলো, তারা একে অন্যের দিকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো। অফিসারের এমন আচরণে তারা না পারছে হাসতে, না পারছে স্বাভাবিক থাকতে। অভিব্যক্তি লুকিয়ে রাখার মতো কঠিন কাজ করতে হচ্ছে তাদেরকে।

আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। অপেক্ষা করলাম তার বাড়ি যাওয়া পর্যন্ত। আমাদের টহল গাড়িটা তার বাড়ির সামনে থামলে তিনি বাচ্চা ছেলেদের মতো গোঁ ধরে বসলেন বাড়িতে যাবেন না। কারণ ভাবি বাড়িতে নেই!

"যতোক্ষণ না ও বাড়িতে ফিরে আসছে আমি এই বাড়িতে ঢুকবো না।"

মাতালের এক কথা!

কী করবো বুঝে উঠতে না পেরে ড্রাইভারকে বললাম আমার বাড়িতে চলে যাবার জন্য। এরকম মাতাল অবস্থায় হায়দারভাইকে খালি বাড়িতে রেখে যাওয়াটাও সমীচিন বলে মনে করিনি। কি করতে কী করে ফেলবে কে জানে। বিপজ্জনক কাজ-কারবারও যে করবে না সেই ভরসাও পেলাম না। তার মানসিক অবস্থা খুবই নাজুক ছিলো। এমনটা আমি আগে কখনও দেখিনি। বাইরে থেকে হায়দারভাই খুবই কঠিন আর শক্ত প্রকৃতির একজন মানুষ। তবে আমি জানতাম, ভেতরের মানুষটার মন খুব নরম। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেবার আগে তেমনটাই ছিলেন। যুদ্ধ তাকে বদলে দিয়েছিলো। যুদ্ধের সময়কার বিভীষিকা ভোলার জন্য তিনি মদ্যপান শুরু করেন।

রাত শেষ হবার আগেই টহল দল থেকে ছুটি নিয়ে নিজের বাড়িতে চলে এলাম মদ্যপ হায়দারভাইসহ। তখনও তিনি বেসামাল। তাকে আমার সিঙ্গেল খাটে শুইয়ে দিয়ে আমি বিছানা পাতলাম মেঝেতে। কিন্তু বাকি রাতটুকু দু-চোখের পাতা এক করতে পারলাম না মাতালের প্রলাপের কারণে। তার গা গরম হয়ে জ্বর এসে গেছিলো।

"কী নিয়ে ঝগড়া করেছেন ভাবির সাথে?" কথাবার্তার এক পর্যায়ে জানতে চাইলাম আমি।

"ঐ তো, যেটা নিয়ে সব সময় করি," কথাটা বলেই মনমরা হয়ে গেলেন।

"তাই বলে ভাবি আপনাকে রেখে বাপের বাড়ি চলে যাবে?" অবাক না হয়ে পারলাম না। "না, এটা ভাবি ঠিক করেননি।"

"ও খুব কষ্ট পেয়ে চলে গেছে। ওর কোন দোষ নেই, সব দোষ আমার।"

gronthagaar.blogspot.com

কথাটা শুনে অবাক হলাম আমি। জাতে মাতাল তালে ঠিক শুনেছি আজীবন, কিন্তু তালে মাতাল জাতে ঠিক তো শুনিনি কখনো!

"কষ্ট পেয়ে চলে গেছে মানে? কিসের কষ্ট? কী করেছেন আপনি?"

আমার এই প্রশ্ন শুনে হায়দারভাই আবারো ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন।

"আরে, কাঁদছেন কেন? কথা বলেন?" তাড়া দিলাম তাকে। "আপনি কি করেছেন ভাবির সাথে?"

তাকে দেখে মনে হলো খুব লজ্জিত। "আমি...আমি ওকে..." কথা শেষ করতে পারলেন না।

"কি?"

"চড় মেরেছি।"

আমার মুখ হা হয়ে গেলো। ভাবির গায়ে হাত তোলার মতো লোক হায়দারভাই নন। কথাটা বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছিলো। নিশ্চয় হুঁশ-জ্ঞান ছিলো না তার। "মদ খেয়ে মেরেছেন?"

"না। ওকে মেরে মদ খেয়েছি...মনের দুঃখে।"

এবার বুঝতে পারলাম ভাবি কেন বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন।

"বিশ্বাস করো, মাথাটা ঠিক ছিলো না।" আমাকে চুপ থাকতে দেখে তিনি বলে যেতে শুরু করলেন, "ও যদি ওটা না বলতো..."

"কোন্‌টার কথা বলছেন?"

"ওই যে, আমি নাকি ওকে ভালোবাসি না...বাচ্চা-কাচ্চা চাই না।"

এরপর তিনি বলে যেতে লাগলেন তাদের ঝগড়াটা কিভাবে শুরু হয়েছিলো। বেশ কয়েকদিন ধরে এক পীরের কাছে নিয়ে যাবার জন্য ভাবি চাপ দিচ্ছিলেন। নীলুভাবির মা-খালারা সেই পীরের মুরিদ, তাদের ধারণা পীরের বরকতে উনি মা হতে পারবেন। ভাবি তাদের কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করেছেন। কিন্তু এইসব পীর-ফকিরে বিশ্বাস নেই হায়দারভায়ের। তিনি সোজা বলে দিয়েছেন, ঐ পীরের দরবারে গিয়ে ধর্ণা দেবেন না।

"আমি জানি আপনি এসবে বিশ্বাস করেন না, আমিও করি না কিন্তু ভাবির জন্য এটা করলে কী এমন ক্ষতি হতো? একটু গেলেই পারতেন।" এটা জানার পর তাকে বলেছিলাম।

"তুমি কি ভেবেছো আমি পীর-ফকিরে বিশ্বাস করি না বলে যাইনি?"

"তাহলে?"

"ঐ শালার পীর তো একাত্তরে রাজাকার ছিলো, পাকিস্তানিদের দোসর

gronthagaar.blogspot.com

ছিলো হারামজাদা! শূয়োরটাকে তখন হাতের কাছে পেলে পুরো একটা ম্যাগাজিন খালি করে ফেলতাম না!"

এবার আমি বুঝতে পারলাম তার না যাবার কারণ নিছক কোন বিশ্বাস কিংবা গোয়ার্তুমি নয়।

"তুমিই বলো, এমন একজনের কাছে আমি যেতে পারি? তা-ও যদি গেলে সত্যি সত্যি কাজ হতো!"

না, উনি যেতে পারেন না। একজন মুক্তিযোদ্ধা এমন কাজ করতে পারেন না। মনে মনে আমি তার সাথে সায় দিয়েছিলাম সেই রাতে।

ভোরের দিকে ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসছিলো। কথা আর না বাড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। হায়দারভাইও আধো-ঘুম আর আধো-মাতলামির মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেন।

*

সকালে উঠে দেখি আমারও আগে ঘুম থেকে উঠে বিছানার উপর বসে উদাস হয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন।

"তুমি নীলুকে একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিয়ে আসবে?"

আমাকে ঘুম থেকে উঠতে দেখেই সবার আগে এ কথাটা বললেন। আমি হেসে ফেললাম। ভালোবাসার বর্হিপ্রকাশ দেখলেই আমার মন ভালো হয়ে যায়। সব সময়।

"আনবো। যদি আপনি একটা প্রমিজ করেন তো।" ঝোঁপ বুঝে কোপটা মেরে বসলাম আমি।

"কি?" অবাক হয়ে তাকালেন আমার দিকে।

"আমাকে কথা দিতে হবে, আর কখনও মদ খেতে পারবেন না।"

আমার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলেন হায়দারভাই। "কখনো না?" হতাশ শোনালো তার কণ্ঠটা। "মাসে দু-একবারও না?"

"না। কখনো না মানে, কখনো না। যদি আমাকে কথা দিতে পারেন তাহলে আমি নিজে ভাবির বাপের বাড়িতে গিয়ে উনাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিয়ে আসবো।" কথাটা আমি বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে পেরেছিলাম তার কারণ, ভাবি আমাকে খুব পছন্দ করতেন। আমি অনুরোধ করলে যে উনি না করতে পারবেন না সেটা জানতাম।

হায়দারভাই কোন রকম চিন্তা-ভাবনা না করেই রাজি হয়ে গেলেন।

gronthagaar.blogspot.com

"ওকে...নো মদ, নো শারাব।"

মাথা দোলালাম আমি। "হবে না। এভাবে বললে হবে না, ভাই।"

"তাহলে, কিভাবে বলবো?" বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলেন তিনি।

"আমাকে ছুঁয়ে কথা দিতে হবে।"

"আরে মিয়া, তুমি দেখি মেয়েমানুষের মতো কথা বলছো! আশ্চর্য!"

"যদি গা ছুঁয়ে প্রতীজ্ঞা করতে পারেন তো করেন, নইলে দরকার নেই।"

আমিও নাছোরবান্দা। ভালো করেই জানতাম তিনি আমাকে কতোটা ভালোবাসেন। আমার স্থির বিশ্বাস ছিলো, আমার গা ছুঁয়ে প্রতীজ্ঞা করলে তিনি সেই প্রতীজ্ঞা ভাঙতে দশবার চিন্তা করবেন। হায়দারভাইকে দেখেও মনে হলো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধাবেন কি-না সেই সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন বুঝি। খুবই কঠিন কাজ তার পক্ষে।

অবশেষে, অনেক কষ্টে তিনি আমার গা ছুঁয়ে কথা দিলেন এ জীবনে আর মদ স্পর্শ করবেন না।

আমার বাড়িতেই গোসল সেরে নাস্তা করে তাকে তার নির্জন বাড়িতে রেখে থানায় চলে গেলাম আমি। কথা দিলাম, দুপুরের পর ভাবিকে নিয়ে আসবো। শরীর খারাপ বলে হায়দারভাই আর থানায় গেলেন না। আমিও ভেবে দেখলাম, বাড়িতে বিশ্রাম নিলেই ভালো হয়। তখনও জ্বরটা ছিলো।

ডাক্তারের কাছে যাবেন কি-না জিজ্ঞেস করতেই বলে উঠলেন, "তুমি আমার নীলুকে নিয়ে আসো। ও-ই আমার ডাক্তার...আমার ওষুধ, বুঝলে?"

আমি হাসি চেপে রাখতে পারলাম না তার কথা শুনে।

"হাসবা না! যাও, নীলুরে নিয়ে আসো!" উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিসেবে আহ্লাদি হুকুম দিলেন তিনি।

*

দুপুর পর্যন্ত থানায় ডিউটি করে লাঞ্চ-আওয়ারে চলে গেলাম গোপীবাগে ভাবির বাপের বাড়িতে। আমাকে দেখেই তিনি বুঝে গেলেন কেন এসেছি। এর আগে দুয়েকবার ওখানে গেলেও হায়দারভায়ের সাথেই গেছি। একা কখনও যাইনি।

যাই হোক, ভাবিকে খুব বেশি বোঝাতে হলো না। তাদের প্রেমটা আসলে দু-তরফ থেকেই প্রবল ছিলো। নীলুভাবি যখনই শুনতে পেলেন হায়দারভাই মারামারি করে মাথা ফাটিয়েছেন, তার শরীর খারাপ তখন আর

gronthagaar.blogspot.com

দেরি না করে যে সুটকেস নিয়ে বাপের বাড়িতে গেছিলেন সেটা নিয়েই আমার সঙ্গে রওনা দিয়ে দিলেন। ভাবির উদ্বিগ্নতা দেখে আমার খুব ভালো লাগলো। এমন প্রেমই তো আমি মনে মনে কল্পনা করি। মানব-মানবির এমন সম্পর্কই তো আমার কাম্য।

"ভাবি, হায়দারভাইকে আর পীর-ফকিরের কাছে নিয়ে যাবার কথা বলবেন না, উনি এসবে বিশ্বাস করেন না," রিক্সায় করে ফেরার সময় বললাম। "আমিও করি না।"

নীলুভাবি চুপচাপ আমার কথা শুনে গেলেন। কোন প্রতিবাদ করলেন না।

"দেখবেন, আল্লাহর রহমতে আপনাদের এমনিতেই সন্তান হবে, কোন কিছুর দরকার হবে না। আর লোকজনের কথা একদম পাত্তা দেবেন না। বুঝলেন?"

আল্‌তো করে মাথা দোলালেন তিনি।

"যেখানে আপনার স্বামি এসব নিয়ে আপনাকে কিছু বলে না সেখানে লোকজনের কথা কেন এত গুরুত্ব দেন, বুঝি না।"

নীলুভাবি মুখে কিছু না বললেও আমি জানতাম আমার কথাগুলো তিনি গুরুত্বসহকারেই নিচ্ছেন।

"আমি স্বপ্নে দেখেছি, হায়দারভায়ের বাচ্চাকে কোলে নিয়ে আদর করছি।"

আমার দিকে আশীর্বাদি হয়ে তাকালেন ভাবি। "কবে দেখেছেন? কখন দেখেছেন?"

"এই তো, কয়েকদিন আগে...শেষরাতে।" মিথ্যেটা বলতে আমার একটুও খারাপ লাগেনি।

দেখে মনে হলো ভাবি খুব খুশি হয়েছেন। মুখ ফুটে না বললেও তার মনোভাব আমি বুঝতে পেরেছিলাম–ভাই, আপনার কথাই যেন ঠিক হয়।

দুপুর হয়ে গেছে অনেক আগেই, বাড়িতে কোন খাবার-দাবার নেই। ভাবি গিয়ে রান্না করলে অনেক দেরি হয়ে যাবে, তাই পথে রিক্সা থামিয়ে তিন প্যাকেট বিরিয়ানি কিনে নিলাম। পূর্ণর্মিলনি হবে আর ভুড়িভোজ হবে না তা কী করে হয়!

বাড়ির সামনে রিক্সা থামলে ভাড়া মিটিয়ে ভাবিকে নিয়ে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। মেইন গেট খোলা দেখে মোটেও অবাক হইনি। সেই সময় মানুষজন দিনের বেলায় বাসাবাড়ির মেইন দরজা খোলাই রাখতো। আজকের

gronthagaar.blogspot.com

মতো নিরাপত্তা নিয়ে অতোটা শঙ্কিত ছিলো না তারা। নিজের তৈরি জেলাখানায় থাকতো না কেউ।

কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে ভাবলাম, হায়দারভাই বোধহয় জ্বরের ঘোরে ঘুমাচ্ছেন।

"ঘরের এ অবস্থা কেন?" ভাবি আঁতকে উঠে বললেন।

"কি?" এবার আমার নজরে পড়লো ঘরটা। দুটো চেয়ার উল্টে পড়ে আছে। টেবিলটাও জায়গা থেকে সরে আছে। দৈনিক ইত্তেফাকের একটি কপি মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

আমার ভেতরে কিছু একটা বলে উঠলো যেন। একটা আশঙ্কা। এক ধরণের অনুভূতি। আমি জোর দিয়ে বলতে পারবো না সেটা কি ছিলো। নীলুভাবিকে পাশ কাটিয়ে শোবার ঘরের দিকে পা বাড়ালাম। দরজাটা আধ-ভেজানো ছিলো। সেটা আস্তে করে ধাক্কা দিতেই আমার সমস্ত জগত কেঁপে উঠলো।

লণ্ডভণ্ড বিছানায় রক্তের সাগরে মধ্যে হায়দারভায়ের নিথর দেহটা পড়ে আছে!

ঠিক তখনই আমার পেছন থেকে ভাবির চিৎকারটা কাঁপিয়ে দিলো সারা ঘর। অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়লেন তিনি।

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

অধ্যায় ৩২

ঘোর

হায়দারভায়ের মৃত্যু আমার জীবনটাই এলোমেলো করে দিলো।

আমাকে জন্ম দিতে গিয়ে মা মারা যান। বাবাকেও বেশিদিন পাইনি। যতোদিন বেঁচে ছিলেন আমার থেকে দূরে দূরে ছিলেন তিনি। মা মারা যাবার পর আত্মীয়-স্বজনেরা বহু চেষ্টা করেও বাবাকে দ্বিতীয় বার বিয়ে করাতে পারেনি। যখন প্রশ্ন উঠলো, আমাকে মানুষ করার দায়িত্ব কে নেবে তখন তিনি সেই দায়িত্ব তুলে দেন আমার বড় মামার হাতে।

একই জেলায় হলেও দাদার বাড়ি থেকে মামার বাড়ির দূরত্ব ছিলো প্রায় বিশ-পঁচিশ মাইল। যোগাযোগ ব্যবস্থাও ছিলো বেশ খারাপ। ফলে আমার স্কুল শিক্ষক বাবা প্রতি মাসে একবারের বেশি দেখা করতে আসতেন না। সেদিক থেকে দেখলে আমি বাবার স্নেহ থেকেও বঞ্চিত ছিলাম।

পুলিশে ঢোকার পর হায়দারভাই-ই ছিলেন আমার বন্ধু, বড়ভাই এবং পিতৃতুল্য একজন মানুষ। বন্ধুর মতো সম্পর্ক ছিলো আমাদের, আবার বড়ভায়ের মতো আগলে রাখতেন সারাক্ষণ। সব মিলিয়ে আমি তার মধ্যে এমন কিছু খুঁজে পেয়েছিলাম, যেটাকে বলে ফাদার-ফিগার।

হায়দারভায়ের মৃত্যু যেন আমাকে পুরোপুরি এতিম করে দিলো। আমি হয়ে পড়লাম নিঃসঙ্গ আর বিপর্যস্ত একজন মানুষ। এই মৃত্যুটা আমি মেনে নিতে পারিনি।

মুক্তিযোদ্ধা এসএম হায়দারকে উপর্যুপুরি ছুরিকাঘাতে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। কে করেছিলো কেন করেছিলো সেটা নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারেনি কখনও। তবে এ নিয়ে আমার মধ্যে কোন সংশয় ছিলো না। আমি জানতাম এ কাজ একজনের পক্ষেই করা সম্ভব।

ইমতিয়াজ।

আজো আমি বিশ্বাস করি, ইমতিয়াজই হায়দারভাইকে খুন করেছে। কিন্তু কেউ আমার কথা বিশ্বাস করেনি। না করার কারণ, এ ব্যাপারে আমার কাছে কোন প্রমাণ ছিলো না। আগের দিন ফুটবল ক্লাবে মদের আড্ডায়

gronthagaar.blogspot.com

যাদের সাথে হায়দারভায়ের মারামারি হয়েছিলো তাদের দিকেই সন্দেহের আঙুল তোলা হয়েছিলো। বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতারও করেছিলো পুলিশ, কিন্তু দেখা গেলো ওটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। মদের আড্ডায় এরকম ঘটনা হরহামেশাই হয়ে থাকে। ঐদিনের ঘটনাটি ছিলো নিছক তর্কাতর্কি থেকে সৃষ্ট একটি হাতাহাতি! মদের আড্ডায় এক লোকের সাথে বচসায় জড়িয়ে পড়েছিলেন হায়দারভাই। সেই লোক যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি মিলিটারির খাবার সাপ্লাই দেবার কন্ট্রাক্ট পেয়েছিলো। এ কথা তুলতেই তর্কাতর্কিটা হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যায়। লোকটার সাথে ছিলো আরো দু-জন, হায়দারভাই একা ঐ তিনজনের সাথে মারামারি শুরু করে দিয়েছিলেন।

আমিও মনে করি ক্লাবের মারামারিটার সাথে খুনের কোন সম্পর্ক নেই। ইমতিয়াজ আর তার লোকজন আরো আগে থেকে হায়দারভায়ের পিছু নিয়েছিলো। কাকতালিয়ভাবে মারামারির পরদিন খুনটা হয়েছে, এই যা।

খুনটা যে ইমতিয়াজ করেছে সেটা নিছক আমার সন্দেহ ছিলো না। এর পক্ষে জোড়ালো একটা প্রমাণও ছিলো। আততায়ির আক্রমণে নিহত হবার আগে নিজের বিছানার চাদরে একটা কিছু লেখার চেষ্টা করেছিলেন তিনি।

অপূর্ণাঙ্গ একটি অক্ষর! মাত্রাবিহীন 'হ'।

কিন্তু আমি জানতাম, উনি আসলে জীবনের শেষরক্তবিন্দু দিয়ে একজনের নাম লিখে যেতে চেয়েছিলেন।

ইমতিয়াজ।

'ই' লিখতে গিয়েই ঢলে পড়েছিলেন মৃত্যুর কোলে।

আমার এমন কথা থানার ওসি আলী ইকরামসাহেব আমলেই নেয়নি। সে ধরেই নিয়েছিলো, আমার আর হায়দারভায়ের সাথে আগে থেকেই ঝামেলা চলছিলো বলেই ইমতিয়াজকে ফাঁসাতে চাইছি। কিন্তু আমি যখন নাছোরবান্দার মতো চাপাচাপি করতে শুরু করলাম তখন নাম-কা-ওয়াস্তে ইমতিয়াজকে থানায় ডেকে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলো ভদ্রলোক। আমিও তখন উপস্থিত ছিলাম সেখানে। খুবই গোবেচারার মতো মুখ করে ইমতিয়াজ দাবি করেছিলো ঐ দিন সে ঢাকার বাইরে ছিলো তার নেতার সঙ্গে। চাইলে নেতার সাথে কথা বলে দেখতে পারে পুলিশ। শুধু নেতাই নন, আরো অনেকেই সাক্ষি দিতে পারবে এ ব্যাপারে।

ওসি আলী ইকরাম আর বেশি ঘাটায়নি, ইমতিয়াজের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনাও সম্ভব হয়নি। আমার স্পষ্ট মনে আছে, ওসির রুম থেকে বের হয়ে যাবার সময় সবার অলক্ষ্যে অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু

Gronthagar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

চোখ টিপে দিয়েছিলো ঐ খুনি। তার লম্পট ঠোঁটে তখন দুর্বোধ্য হাসিও দেখেছিলাম আমি। সত্যি বলতে, আমার হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেছিলো কয়েক মুহূর্তের জন্য। সব কিছুই পরিষ্কার হয়ে গেছিলো আমার কাছে।

মিলির খুনি-ধর্ষকই হয়াদারভাইকে খুন করেছে!

কিন্তু তাকে ধরার মতো কোন কিছু আমার হাতে ছিলো না। এক অসহায় আর বিপর্যস্ত অবস্থায় নিপতিত হলাম আমি। মানসিকভাবে পুরোপুরি ভেঙে পড়লাম। দিনগুলো কিভাবে কেটে গেছিলো বলতে পারবো না। হায়দারভায়ের মৃত্যুর জন্য নিজেকেও দায়ি মনে করতে শুরু করলাম। বিনা নোটিশে থানায় যাওয়া বন্ধ করে দিলাম, নিজের ঘরে বসে কাটিয়ে দিতাম সারাটা দিন। কিন্তু বাড়িতে বসে বইও পড়তাম না। হায়দারভায়ের মৃত্যু আমার পাঠক সত্তাকে খুন করেছিলো! একটা ঘোরের মধ্যে জীবন-যাপন করছিলাম যেন।

মৃত্যুর আগে হায়দারভাই আমার গা ছুঁয়ে প্রতীজ্ঞা করেছিলেন এ জীবনে আর কখনো মদ স্পর্শ করবেন না। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস, সেই আমিই কি-না ধীরে ধীরে মদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে শুরু করলাম।

প্রচণ্ড দুঃখের সেই সময়টায় নিজের কষ্ট ভুলে থাকার জন্য, আমার চূড়ান্ত অসহায়ত্বকে ভুলে থাকার জন্য, যাবতীয় সব কষ্ট থেকে যোজন যোজন দূরত্বে চলে যাবার জন্য আমি একটা আশ্রয় খুঁজে নিলাম। আমার কী করা উচিত সেটাও বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তবে এটুকু বুঝতে পারছিলাম, একটা দমবন্ধ অবস্থায় নিপতিত হয়েছি আমি। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে হবে।

এমনই এক দিন, বিষন্ন বিকেলে নিজের ঘরে বসে মদ পান করছিলাম, অন্যসব দিনের তুলনায় একটু বেশিই পান করে ফেলেছিলাম সে-দিন। কেমন একটা ঘোরলাগা মুহূর্ত তৈরি হয়েছিলো বোঝাতে পারবো না। বিক্ষিপ্তভাবে অনেক কিছু ভেবে যাচ্ছিলাম। হায়দারভায়ের সাথে আমার নানান স্মৃতি আধিপত্য করলেও রামজিয়ার কথাও মনে পড়ছিলো বার বার। হায়দারভায়ের খুন হবার পর তার সাথে আমার আর কোন ধরণের যোগাযোগ হয়নি, দেখা করা তো দূরের কথা।

এমন সময় ঘোলাটে দৃষ্টিতে আমার ঘরের দরজার সামনে একটা অবয়ব দেখতে পাই। ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে সে। দৃষ্টি পরিষ্কার করে ভালোভাবে দেখার চেষ্টা করলাম।

রামজিয়া!

gronthagaar.blogspot.com

বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো। নির্ঘাত মদের প্রভাবে দৃষ্টিবিভ্রমের শিকার হচ্ছি। আমার যুক্তি-বুদ্ধি এতোটা লোপ পায়নি যে, এটা বিশ্বাস করতে হবে রামজিয়া শেহরিন আমার খোঁজে আমার ঘরে চলে এসেছে! আমি কোথায় থাকি সেটা তো সে জানে না। এসব নিশ্চয় আমার অবচেতন মনের কারসাজি।

অবয়বটা নড়তে শুরু করলো। আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো আমার দিকে। এবার আর ভুল হলো না। চোখের সামনে আমি সত্যি সত্যি রামজিয়াকে দেখতে পাচ্ছি!

"আপনার এই অবস্থা!" বিস্মিত হয়েছিলো সে। "মাই গড! আপনি এসব খাওয়া শুরু করেছেন?!"

রামজিয়ার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম আমি। তার মোহনীয় কণ্ঠের কথাগুলো যেন আমার দু-কানে প্রবল বেগে ধেয়ে আসতে লাগলো। সেই সাথে ভনভন করে একটা শব্দ!

"হায়দারসাহেবের খবরটা শোনার পর পর আমি অনেকবার থানায় যোগাযোগ করেছিলাম কিন্তু আপনাকে পাইনি। ওরা বললো, বেশ কয়েক দিন ধরে নাকি থানায় যাচ্ছেন না।"

আমার বিশ্বাস হলো না এটা সত্যি। মনে হলো স্বপ্ন দেখছি। কিংবা বিভ্রম।

"...থানার একজনের কাছ থেকে আপনার বাসার ঠিকানাটা পেয়েছি..."

রামজিয়া আরো কিছু বলছিলো কিন্তু সেই সব কথা আমার কানে এসে পৌছাচ্ছিলো না। আমার দৃষ্টি ঝাপসা হতে শুরু করলো। টের পেলাম হৃদস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছে। কেমন হাসফাস করছে বুকের ভেতরটা।

তার পর আর কিছু মনে নেই।

Gronthagaar.blogspot.com

অধ্যায় ৩৩

তুমি

জ্ঞান ফিরে এলে দেখি আমার সারা মুখ আর মাথা ভেঁজা। বিছানায় শুয়ে আছি। পাশে একটা চেয়ারে বসে আছে রামজিয়া। তার হাতে পানির গ্লাস।

"থ্যাঙ্কস গড," হাফ ছেড়ে বাঁচলো যেন সে। "আমি তো খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম। এখন কেমন লাগছে?"

তার উদ্বিগ্ন মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েছিলাম আমি।

"আপনি ঠিক আছেন তো?"

"হ্যা," কোনভাবে বলতে পেরেছিলাম। মাথাটা খুব ফাঁকা আর হালকা লাগছিলো।

"আমার মনে হয় আপনার ডাক্তার দেখানো দরকার।"

"না, না...আমি ঠিক আছি।"

"খাওয়া-দাওয়া...কোন কিছুই মনে হয় ঠিক নেই। স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়েছে। ক-দিন ধরে শেভ করেন না?"

মনে পড়ে গেলো, দু-সপ্তাহ আগে শেভ করেছিলাম। আমার গালে চাপদাড়ি আর গোঁফ।

"আপনাকে খুবই বিশ্রি দেখাচ্ছে কিন্তু," বললো সে।

এ কথার কোন জবাব দিলাম না আমি, তার দিকে চেয়ে রইলাম। একটু আগে যে তাকে দেখে দৃষ্টিবিভ্রম বলে মনে হচ্ছিলো সেটা পুরোপুরি কেটে গেছে। ঘোর ঘোর ভাবটাও নেই আমার মধ্যে।

"আপনি আমাকে খুব খারাপ ভাবছেন?"

আমার কথাটা শুনে কয়েক মুহূর্ত স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো সে। "না, তা ভাববো কেন। আপনার মানসিক অবস্থাটা বুঝতে পারছি। যা ঘটেছে সেটা সহ্য করা খুব কঠিন।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

"কিন্তু আপনি যেটা করছেন সেটা ঠিক না। এসব করার কোন মানেই হয় না। আপনাকে এসব ছাড়তে হবে। স্বাভাবিক হতে হবে।"

gronthagaar.blogspot.com

তার কথাগুলো চুপচাপ শুনে গেলাম আমি। হ্যা-না কিছুই বললাম না।

"থানা থেকে বললো আপনি অনেকদিন ধরেই ডিউটিতে যাচ্ছেন না?"

মাথা নেড়ে সায় দিলাম আমি। "ওখানে যেতে ইচ্ছে করে না আর।" থানায় গেলেই যে হায়দারভায়ের কথা আরো বেশি করে মনে পড়ে, তার চেয়ার আর টেবিলে অন্য কাউকে বসে থাকতে দেখলে ভীষণ খারাপ লাগে, নিজেকে মনে হয় বড্ড একা সেটা আর বললাম না।

"এভাবে দিনের পর দিন অ্যাবসেন্ট থাকলে তো চাকরিটা থাকবে না।"

আমি তার উদ্বিগ্ন মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললাম, "আমার মনে হয় না পুলিশের চাকরি আর করতে পারবো।"

"কী বলেন এসব," সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বলে উঠলো রামজিয়া শেহরিন, "কয়েকটা দিন ছুটি নিয়ে একটু বিশ্রাম নিন, সব ঠিক হয়ে যাবে। ইউ নিড রেস্ট।"

তার পর কয়েক মুহূর্ত কোন কথা হলো না আমাদের। যেন কেউ কোন কথা খুঁজে পাচ্ছে না। রামজিয়া হঠাৎ করে তার হাতঘড়িতে তাকালো।

"আজকে আসি," উঠে দাঁড়ালো সে। আমিও উঠে দাঁড়াতে গেলে বলে উঠলো, "আপনার ওঠার দরকার নেই, রেস্ট নিন।"

"না, না। আমি ঠিক আছি।" বিছানা থেকে নেমে উঠে দাঁড়ালাম।

"আপনার কিন্তু ডাক্তার দেখানো দরকার," কথাটা আবারো বললো রামজিয়া। "জ্ঞান হারানোর আগে কেমনজানি অ্যাবনরমাল বিহেইভ ছিলেন।"

তার কথা শুনে আঁতকে উঠলাম। মনে করার চেষ্টা করলাম অজ্ঞান হবার আগে কী করেছিলাম, কিন্তু মাথা কাজ করছিলো না। শুধু মনে পড়ছিলো দরজার সামনে সে দাঁড়িয়ে আছে। আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। কিছু বললো। তারপর?

"আ-আমি কি..." ঢোক গিলে বললাম, "...উল্টাপাল্টা কিছু করেছি?"

নিজের অভিব্যক্তি লুকিয়ে বললো, "তেমন কিছু না। ওতে আমি কিছু মনে করিনি।"

তেমন কিছু না মানে? ভড়কে গেলাম একটু। আমি আসলে কি করেছি?

"এসব নিয়ে টেনশন করার কিছু নেই।" আবারো আশ্বস্ত করলো আমাকে।

"না, মানে...আমি কী করেছি? আসলে, আমার কিচ্ছু মনে পড়ছে না।"

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

"আমাকে তুমি করে বলছিলেন। আপনার বিশ্বাসই হচ্ছিলো না আমি এখানে এসেছি। ভেবেছেন ডিল্যুশন হচ্ছে আপনার।"

হতভম্ব হয়ে গেলাম আমি। নিজের উপরে এতোটা নিয়ন্ত্রণ কিভাবে হারালাম বুঝে এলো না। শুনেছি মদের প্রভাবে নাকি এরকম অনেক কিছু হয়। কিন্তু বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো আমার।

"সরি সরি। বিশ্বাস করেন, আমি এটা–"

"ইটস ওকে," হাত তুলে আমাকে থামিয়ে দিলো রামজিয়া।

"প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। আমি সজ্ঞানে এটা করিনি।"

"আহা," বললো সে। "এটা এমন কোন ব্যাপার না।"

"না, না। কী যে বলেন। আমার এটা করা ঠিক হয়নি।"

"আর অ্যাপোলজি চাইতে হবে না।" আশ্বস্ত করলো সে। "আমরা প্রায় কাছাকাছি বয়সেরই, তুমি করে বলা যেতেই পারে।"

আমি ফ্যাল ফ্যাল চোখে চেয়ে রইলাম।

"এটা নিয়ে এতোটা ওরিড কেন হচ্ছেন বুঝতে পারছি না। আমি তো বাবা-মা থেকে শুরু করে কাকা-কাকি, মামা-মামি সবাইকেই তুমি করে ডাকি। আপনি বলার রেওয়াজ আমাদের ফ্যামিলিতে নেই।"

আমি বোকার মতো চেয়ে রইলাম ওর দিকে।

"ইচ্ছে করলে এখন থেকে আপনি আমাকে তুমি করে বলতে পারেন, কোন সমস্যা নেই। একবার যখন তুমি করে বলেই ফেলেছেন তখন আর আপনি'তে ফিরে যাওয়ার কী দরকার, তাই না?"

আমি হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলাম।

"আমাকে কিন্তু বন্ধু ভাবতে পারেন।"

কথাটা শুনে কী যে ভালো লেগেছিলো বলে বোঝাতে পারবো না।

"ঠিক আছে?"

মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিলাম আমি। "তাহলে আমাকেও তুমি করে ডাকতে হবে।"

হুট করেই মুখ দিয়ে কথাটা বের হয়ে গেছিলো। এমন কথা কিভাবে আমি ঐদিন বলতে পেরেছিলাম সেটা আজো আমার কাছে বিস্ময় ঠেকে। জীবনে এরকম অনেক সময় আসে যখন মানুষ তার স্বভাবের বাইরে গিয়ে কিছু করে ফেলে। আমিও সেদিন তা-ই করেছিলাম।

"ও, এটা।" আমার কথার জবাবে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলেছিলো। "ঠিক আছে।"

gronthagaar.blogspot.com

কথাটা বলেই দরজার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো সে, ফিরে তাকালো আমার দিকে। "পাঁচদিন পর কিন্তু জন্মদিন...মনে আছে তো? "

মনে পড়ে গেলো আমার। জন্মের পর থেকে কখনও জন্মদিন পালন করিনি। গত বছর হায়দারভাই যখন জানতে পারলেন আমার জন্মদিনের কথা তখন সঙ্গে সঙ্গে নিউ মার্কেটে নিয়ে গিয়ে একটা শার্ট গিফট করেছিলেন। রাতে ভাবির হাতে রান্না করা সুস্বাদু পোলাও তো ছিলোই। সেটাই ছিলো আমার জীবনে প্রথম জন্মদিন পালন করা।

"নিউ মার্কেটে বিকেলে আমি আসবো ঐদিন, ঠিক আছে?" বললো সে। "বুক পয়েন্টের সামনে, পাঁচটার দিকে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলাম আমি।

"জন্মদিনের ট্রিট দিতে হবে কিন্তু।" হেসে বললো রামজিয়া। "ভুলে যে-ও না।" কথাটা বলেই ঘুরে চলে গেলো সে।

আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাকিয়ে থাকলাম দরজার দিকে।

*

Gronthagaar.blogspot.com

পরদিন শেভ করে চুল কেটে একদম ফ্রেশ হয়ে গেলাম। একটা দিন বিশ্রাম নিয়ে চলে গেলাম থানায়। আমার কাছে মনে হতে লাগলো এ ক-দিনে কেমন অচেনা হয়ে গেছে সব কিছু। কলিগদের ভাববঙ্গি দেখেও আন্তরিক বলে মনে হলো না। যেন আমি অযাচিত একজন।

নিজের চেয়ার-টেবিলে অন্য একজন অফিসারকে দেখে খুবই অবাক হলাম। পুরনো এক কলিগ জানালো নতুন জয়েন করেছে সে। তাহলে কি আমার চাকরি চলে গেছে?

না। ঐ কলিগই জানালো, গত সপ্তাহে আমার বদলি হয়ে গেছে বরিশালের উজিরপুর নামক এক জায়গায়। এই বদলিটা যে শাস্তি হিসেবে দেয়া হয়েছে সেটা জানাতেও ভুললো না ততোদিনে সাবেক হয়ে যাওয়া আমার সেই কলিগ। ওসিসাহেব থানায় ছিলো না বলে তার সঙ্গে আর দেখা হলো না। আমি কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ বসে রইলাম থানায়। মাথায় নানান চিন্তা ঘুরপাক খেতে শুরু করলো। একদিক থেকে ভালোই হয়েছে–ভাবলাম। এই থানায় নিজেকে মানিয়ে নিতে খুবই বেগ পেতে হচ্ছিলো আমার। হায়দারভায়ের স্মৃতি ছাড়াও ওসি এবং ওসির ঘনিষ্ঠ কলিগদের মনোভাব মোটেও বন্ধুসুলভ ছিলো না আর। এখন উজিরপুরের মতো প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে এসব থেকে দূরত্ব বাড়ানোর একটা সুযোগ এসে গেলো।

gronthagaar.blogspot.com

আমার প্রতি কিছুটা বন্ধুভাবাপন্ন দুয়েকজন কলিগ যে ওখানে ছিলো না তা নয়। তাদেরই একজন সোহরাব মুন্সি এক কাপ চা বাড়িয়ে দিলো আমার দিকে। আমি সেই চায়ে চুমুক দিতে যাবো অমনি তার একটা কথা শুনে থমকে গেলাম।

"ইমতিয়াজের লগে বাড়াবাড়ি না করলে এত খারাপ জায়গায় পোস্টিং হইতো না, বুঝলেন?"

বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেলাম আমি।

"সবাই বলাবলি করতাছে, ও-ই নাকি আপনারে এমন জায়গায় বদলি করছে। ওর নেতা এখন বিরাট ক্ষমতাবান।"

মুহূর্তে চায়ের স্বাদ বিস্বাদ হয়ে গেলো আমার কাছে। কাপটা নামিয়ে রাখলাম।

"ওসিসাহেবের লগে তরা এখন খুব খাতির।"

আমার কানে ভো ভো শব্দ হতে শুরু করলো।

"হায়দারসাহেব্‌রে সে মারুক আর না-ই মারুক, লোকজন কিন্তু মনে করে পুলিশ মারার পরও কিচ্ছু হয় নাই যখন সে নিশ্চয় বিরাট ক্ষমতাবান।" সোহরাব মুন্সি আমার জন্য অপেক্ষা না করে নিজের কাপে চুমুক দিতে দিতে গল্প করে যেতে লাগলো। "এইসব লোকজনের জন্য এইরকম অ্যালিগেশন কিন্তু ক্রেডিট।"

আমি যন্ত্রের মতো উঠে দাঁড়ালাম। খুব দ্রুত আর হুট করে হলেও অবশেষে সিদ্ধান্তটা নিয়েই ফেললাম তখনই।

"আরে, কই যান? ওসিসাহেবের লগে দেখা করবেন না?"

সোহরাব মুন্সি পেছন থেকে কথাটা বললেও আমি ফিরেও তাকাইনি।

gronthagaar.blogspot.com

অধ্যায় ৩৪

নিহত ভোর

থানা থেকে ফিরে এসে পর পর দু-দিন আমি নিজের ঘরে বন্দি হয়ে রইলাম আবারো। চাকরি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলেও আনুষ্ঠানিকভাবে সেটা করার দরকার মনে করিনি। ভালো করেই জানতাম, নতুন পোস্টিংয়ে জয়েন না করলে কিছুদিনের মধ্যেই আমার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

চাকরি ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্তটা নেবার পর থেকে খুব হালকা বোধ করছিলাম আমি, যেন এক ধরণের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়েছি।

কিন্তু আমি করবো কি? জীবনধারণের জন্য তো একটা কিছু করতেই হবে। অবশ্য এই চিন্তাটা আমাকে খুব একটা ব্যতিব্যস্ত করতে পারেনি। একা একজন মানুষ। সংসার বলতে কিছু নেই। কিছু একটা করে জীবন ধারণ করা যে যাবে সেটা নিয়ে খুব একটা উদ্বিগ্ন ছিলাম না। যা হবার হবে। পুলিশের চাকরি আর করছি না। এই চাকরির জন্য আমি একদমই বেমানান। জোর করেও যদি করে যাই তাহলে বড়জোর কয়েক মাস টিকে থাকতে পারবো, এর বেশি নয়। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হয়ে গেছিলাম।

এদিকে পকেট আমার ফুটো। জমানো টাকার প্রায় সবটাই তেতো জলে ভেসে গেছে! ঘরের কোণে কতোগুলো খালি বোতল সেই কথাই বলছিলো।

খুব বেশি বন্ধু আমার কখনওই ছিলো না, বড় মামার বড় ছেলে সামাদ আমারই সমবয়সি, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিলো আমার। কয়েক মাস আগে এক প্রাইভেট ফার্মে চাকরি নিয়ে ঢাকার সোবহানবাগে উঠেছে সে। আমার মতোই ব্যাচেলর ছিলো। জন্মদিনের আগের রাতে কিছু টাকা ধার করার উদ্দেশ্যে তার বাড়িতে যাবার জন্য রওনা দিলাম।

আমি থাকতাম আজিমপুর থানার খুব কাছে, পলাশিতে। ঐ সময় জায়গাটা এখনকার তুলনায় আরো বেশি নিরিবিলি ছিলো। রিক্সার টাকা বাঁচিয়ে সিগারেট খাবো বলে বাস ধরার জন্য শাহবাগের দিকে রওনা হলাম। হাটতে হাটতে চলে এলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুলার রোডে, দেখতে পেলাম পুরো এলাকাটি উৎসবের আমেজে সাজানো। মনে পড়ে গেলো,

gronthagaar.blogspot.com

আগামিকাল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এখানে আসবেন। সমগ্র এলাকা জুড়ে ছড়ানো-ছিটানো বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে সাজানো-গোছানোর আয়োজন। রাস্তার এবড়ো-থেবড়ো গর্তগুলো সুরকি দিয়ে ভরাট করে পিচের আস্তরণ দেয়া হচ্ছে। অনেকদিন অনাদরে মৃত জন্তুর কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে থাকা হতশ্রী দেয়ালগুলোর মুখে যেন চুন-সুরকির প্রসাধন মেখে দেয়া হচ্ছে যত্নসহকারে। গোটা এলাকায় সাজ সাজ রব, তাড়াহুড়ো আর ব্যস্ততা।

রাতের অন্ধকারে আলকাতরা দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে লেখা চিকাগুলো চুনের প্রলেপে ঢেকে ফেলা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের উঁচু দেয়ালে শিল্পীর নিপুণ তুলিতে লেখা সুন্দর সুন্দর কথা শোভা পাচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, বাঙালি জাতির ত্রাণকর্তা, সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের মহানায়ক, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার লৌহমানব, ইত্যাদি। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছেন তাই বিশ্ববিদ্যালয় নানান রঙের লেখায় সেজেগুজে সুন্দর হয়ে উঠেছে। চারদিকে একটা উৎসবের হাওয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের রাস্তাগুলোর মোড়ে মোড়ে অভিনন্দন জানিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নানান রঙের প্ল্যাকার্ড আর তোরণ।

এগুলো দেখে আমার ভেতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। দেশের সত্যিকারের চিত্রটা অবশ্যই এরকম ছিলো না। বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব বাকশাল মানুষকে তেমন আশান্বিত করতে পারছিলো না। বরং পরিস্থিতি আগের তুলনায় আরো বেশি খারাপ হয়ে উঠছিলো।

আমি নিশ্চিত ছিলাম না, তবে যতোটুকু মনে পড়ে রাষ্ট্রপতি হিসেবে বঙ্গবন্ধুর এটা প্রথম আনুষ্ঠানিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন। তিনি শুধু রাষ্ট্রপতি নন, বাঙালি জাতির পিতা, মুক্তিদাতা, বাংলার হাটের মানুষ, ঘাটের মানুষ, মাঠের মানুষের বন্ধু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের ভেতর দিয়ে যাবার সময় সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠনের কিছু ছেলেপেলেকে দেখলাম বেশ ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে। তাদের চোখেমুখে এক ধরণের উদ্বিগ্নতা। এক বাদামওয়ালার কাছ থেকে জানতে পারলাম সন্ধ্যার দিকে কে বা কারা কার্জন হলের কাছে বোমা ফাটিয়েছে–এটা নিয়ে নেতাদের ঘুম হারাম হবার জোগাড়। পুলিশ থাকা সত্ত্বেও সারারাত ক্যাম্পাসে পাহারা দেবে তারা।

হাটতে হাটতে শাহবাগে চলে এলাম আমি কিন্তু বাসের দেখা পেলাম না। অগত্যা পকেটে যা ছিলো তা দিয়ে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে একটা ধরিয়ে আবারো হাটতে শুরু করলাম আমি। একের পর এক সিগারেট ধ্বংস করে আর নানান ভাবনা ভাবতে ভাবতে চলে এলাম বত্রিশ নাম্বারের কাছে–বঙ্গবন্ধু যেখানে

gronthagaar.blogspot.com

তার পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাস করেন। বত্রিশ নম্বর পেরোবার সময় খাকি পোশাক পরা আট-দশজন পুলিশ দেখলাম। কয়েকজন অফিসার, বাকিরা কনস্টেবল। বন্দুক উঁচিয়ে রাষ্ট্রপতির বাসভবনের সামনের সড়কে পাহারা দিচ্ছে।

একা একা হাটছিলাম আর ভয়ানক একা বোধ করছিলাম আমি। চারপাশের কারো সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই, যেন কোনকালে ছিলোও না। আমার ইচ্ছে হচ্ছিলো চিৎকার করে কিছু বলতে। যদি সেই চিৎকার বঙ্গবন্ধুর কানে পৌছায়!

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে দেখে আসছি, যেসব মূল্যবোধগুলো সমীহ করতাম সেগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। লোভির লোভ, প্রবলের অন্যায়কে এমনভাবে জেগে উঠতে আমি কোনোদিন দেখিনি। এত কষ্টের, এতো রক্তে রঞ্জিত স্বাধীনতা যেন আমাদেরকে প্রতিদিন প্রতারিত করছে। কিন্তু সে কথা কার কাছে যেয়ে বলবো? এ কেমন স্বাধীনতা যেখানে আমরা মনের কথা খুলেও বলতে পারছি না! চোখের সামনে সত্য হয়ে যাচ্ছে মিথ্যে! বঙ্গবন্ধু গোটা জাতিকে নিয়ে আসলে কি করতে চান–আমি জানি না। এত অত্যাচার, এত দুঃখ, এত কাপুরুষতা আর সহ্য হচ্ছিলো না।

বত্রিশ নাম্বার অতিক্রম করার সময় আমার অন্তরাত্মা আর্তনাদ করে উঠলো।

বঙ্গবন্ধু! তোমার স্বাধীন দেশে হায়দাররা বেঘোরে মরে পড়ে থাকে। মিলিদের জীবনস্বপ্ন ধর্ষিত হয়। কিন্তু ইমতিয়াজরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়!

বাড়িটা পেরোনোর সময় একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এলো আমার ভেতর থেকে।

সোবহান বাগে মামাতোভায়ের ডেরায় যখন পৌছালাম পা দুটো ব্যথা করতে শুরু করে দিয়েছে। আমাকে দেখে একটু অবাকই হলো সামাদ। কারণ ও ঢাকায় আসার পর মাত্র একবার এসেছিলাম দেখা করতে। খুব একটা যোগাযোগ ছিলো না আমাদের।

যাই হোক, অনেকদিন পর ওর সাথে দেখা হয়ে যাওয়াতে ভালোই লাগলো। গ্রামের খবর জানতে পারলাম। পরিচিত মানুষগুলো কে কোথায় আছে জেনে নিলাম। রাত বেশি হয়ে যাওয়াতে সামাদ থেকে যেতে বললো। আমি খুব একটা আপত্তি করেলাম না। নিজেকে বড্ড অসহায় আর একাকি মনে হচ্ছিলো। সামাদের সাথে রাতটা থেকে গেলে আমার বিশাল একাকিত্ব একটুখানি ঘুচবে।

পুরনো দিনের গল্প করতে করতে অনেক রাতে ঘুমিয়ে পড়লাম আমরা।

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

ভোরের আগেই আমাদের সেই কাঁচা ঘুম ভাঙলো বিকট শব্দে। প্রথমে বুঝতে পারিনি। বুক ধরফর করে উঠে বসি দু-জনে। সামাদই প্রথমে বললো এটা গোলাগুলির শব্দ। কয়েক বছর আগে মুক্তিযুদ্ধের সময় এমন ফায়ারিংয়ের শব্দের সাথে আমাদের সবারই পরিচয় হয়ে গেছিলো। এমনকি শব্দ শুনেও আমরা বুঝতে পারতাম কোনটা কামান আর মেশিনগানের আওয়াজ।

আরেকটা বিকট শব্দে কেঁপে উঠলো সামাদের ছোট্ট ঘরটা। সে-ই প্রথমে বলে উঠলো, এটা ট্যাঙ্কের গোলার শব্দ।

ট্যাঙ্ক?! এই সোবহানবাগে?!

সামাদের ঘরটা ছিলো মেইনরোডের পাশে ছোট্ট একটা গলির মুখে। তার ঘরের জানালা দিয়ে রাস্তাটা দেখা যেতো। জানালা একটু ফাঁক করে সামাদ বাইরে তাকালো।

"ট্যাঙ্ক! মিলিটারি!" অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠেছিলো সে।

"ট্যাঙ্ক? মিলিটারি?" অবিশ্বাস্য বলে মনে হলো আমার কাছে। "কি বলিস? ঘটনা কি?"

"দেখ্ না," বলেই জানালা দিয়ে দেখার ইশারা করলো। আমি যে দৃশ্যটা দেখতে পেলাম সেটা একাত্তরের কোন মিলিটারি অপারেশনের কথাই মনে করিয়ে দিলো। কয়েক মুহূর্তে জন্য আমার মনে হলো, পাকিস্তানিরা আবার হামলে পড়েছে আমাদের উপরে!

"শেখ মুজিবের বাড়িতে হামলা করেছে মনে হয়," সামাদই প্রথমে আন্দাজ করে বলেছিলো।

"কি?!" আমার বিশ্বাসই হলো না কথাটা। "কারা হামলা করবে? কার এত বড় সাহস!"

"কারা আবার করবে, দেখছিস না, মিলিটারি!" একটু থেমে আবার বললো সে, "কয়েক দিন ধরেই শহরে গুজব শোনা যাচ্ছিলো কিছু একটা হবে।"

আমি সামাদের কথা মেনে নিতে পারলাম না। এটা কিভাবে বিশ্বাস করি, যে বঙ্গবন্ধুর জন্য একাত্তরে মানুষ জীবন দিতেও প্রস্তুত ছিলো, পাকিস্তানি কারাগারে বন্দি থাকার সময় যার মুক্তির জন্য এ দেশের মা-বোনেরা রোযা রেখেছে, যাকে জাতির পিতা হিসেবে সবাই মানে, তাকে কি-না হত্যা করবে এ দেশেরই সেনাবাহিনী!

খবরটা জানার জন্য সামাদ দোতলায় চলে গেলো আমাকে রেখে। আমি জানালায় চোখ রেখে দেখে যেতে থাকলাম। রাস্তাটা পুরোপুরি ফাঁকা। মাঝেমধ্যে সেনাবাহিনীর জিপ আর ট্রাক যাতায়াত করছে। কিন্তু এর বেশি দেখা

gronthagaar.blogspot.com

যাচ্ছিলো না। তবে আশেপাশে থেমে থেমে গুলির শব্দ হচ্ছিলো।

"বলেছিলাম না শেখ মুজিবের বাড়িতে হামলা করেছে!" দোতলা থেকে ফিরে এসে বললো সামাদ। "ছাদ থেকে দেখা যাচ্ছে মিলিটারি ঘিরে রেখেছে বত্রিশ নাম্বার।"

আমি প্রচণ্ড হতাশার সাথেই দেখতে পেলাম সামাদের চোখেমুখে খুশির ঝিলিক! তবে আমার মনোভাব বুঝতে পেরে অভিব্যক্তি বদলে ফেললো সে।

ভোরের পর গোলাগুলি থেমে গেলেও রাস্তাঘাট ফাঁকাই রইলো। সামাদ এসে জানালো রেডিওতে নাকি মেজর ডালিম নামের একজন ঘোষণা দিচ্ছে, শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে! সামাদ অবশ্য জানালো, বঙ্গবন্ধুর পরিবারের কেউ বেঁচে নেই। সবাইকে হত্যা করা হয়েছে!

এমন অবিশ্বাস্য ঘটনাও যে কখনও ঘটতে পারে এ দেশে সে কথা আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না তখনও। থম মেরে বসে ছিলাম কতোক্ষণ বলতে পারবো না। আমার সমস্ত জগত দুলে উঠেছিলো।

সকাল দশটার দিকে সামাদের নিষেধ সত্ত্বেও তার বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলাম আমি। বত্রিশ নাম্বারের সামনে দিয়ে যাবার সময় এক ভবঘুরে টাইপের লোককে দেখলাম আরেকজন উৎসুক ব্যক্তিকে বলছে, বাড়ির ভেতরে সিঁড়িতে নাকি বঙ্গবন্ধুর লাশ পড়ে আছে। সে নিজের চোখে দেখে এসেছে।

কথাটা সত্য নাকি মিথ্যা সেটা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামালাম না আমি। শুধু মনে হচ্ছিলো, এ দেশে সবই সম্ভব! অসম্ভব বলে কিছু আর নেই এখন!

জীবনে কখনও জন্মদিন পালন করিনি, ১৯৭৫ সালের পনেরোই আগস্ট জন্মদিন পালন করার কথা ছিলো, কিন্তু সেটা আর করা হয়নি। সত্যি বলতে, আর কখনও জন্মদিন পালন করা হয়ে ওঠেনি আমার। ইচ্ছেও করেনি।

Gronthoguar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

অধ্যায় ৩৫

পলায়ন পর্ব

বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর আবারো নিজের ঘরে দুয়েকদিন বন্দি থেকে অবশেষে কোনো রকম চিন্তাভাবনা না করেই দরকারি কাপড়চোপড় একটা ব্যাগে ভরে ঘরে তালা মেরে নিজের গ্রামে চলে গেলাম। ঢাকা শহরে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিলো। আমি এই গুমোট আর নৃশংস নীরবতাকে মেনে নিতে পারছিলাম না।

বঙ্গবন্ধুর লাশকে ফেলে রেখেই তার দলের অধিকাংশ নেতা খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠন করেছিলো। একাত্তরে যে মানুষটি শারীরিকভাবে অনুপস্থিত থেকেও ছিলেন মহানায়ক তিনিই কি-না হয়ে উঠলেন কারো কাছে ফেরাউন, কারো কাছে জালেম!

এসব দেখে রীতিমতো ঘেন্না জন্মে গেলো আমার। পালাতে চাইলাম আমি। কিন্তু যাবার মতো খুব বেশি জায়গা ছিলো না। তাই পৈতৃক বাড়িতেই আশ্রয় নিলাম।

মাথা গোজার জন্য একটা ভিটে আর বাড়ি ছিলো। অল্পবিস্তর ধানী জমিও রেখে গেছিলেন আমার বাবা, সেগুলো বর্গা দিয়ে রাখলেও খুব কমই খোঁজ খবর রাখতাম। দূর সম্পর্কে এক অভাবী আত্মীয় দেখভাল করতো সে-সব। প্রথমে ভেবেছিলাম কিছুদিনের জন্য গ্রামে থেকে ফিরে আসবো আবার, ঢাকা শহরে কোন চাকরি জুটিয়ে নেবো। কিন্তু কিভাবে যেন সেই কিছুদিন দীর্ঘ হতে হতে মাসখানেক সময় হয়ে গেলো।

বাবা যে স্কুলে আমৃত্যু শিক্ষকতা করেছেন সেই স্কুলে কিছু শিক্ষকের দরকার ছিলো। বিশেষ করে ভালো ইংরেজি শিক্ষকের খুব অভাব ছিলো তখন। একদিন সেই স্কুলের হেডমাস্টার আমাকে বললেন যতোদিন গ্রামে আছি বাচ্চাগুলোকে একটু ইংরেজি পড়াচ্ছি না কেন–শিক্ষকের অভাবে বাচ্চাগুলো ক্লাস করতে পারছে না। আমি এক কথায় রাজি হয়ে গেছিলাম। গ্রামে আমার সারাটা দিন অলস সময়ই কাটতো, সুতরাং সকালের দিকে স্কুলে গিয়ে ঘণ্টাখানেক পড়িয়ে আসলে মন্দ কি।

gronthagaar.blogspot.com

কিন্তু বাচ্চাগুলোকে পড়াতে গিয়ে কী মজা পেলাম জানি না, খুব সিরিয়াস হয়ে উঠলাম। মাসখানেক পর হেডস্যার ডেকে জানতে চাইলেন, আমি পুলিশের চাকরি ছেড়ে দিয়েছি কি-না। তাকে সত্যিটাই বললাম। তখনই তিনি প্রস্তাব দিলেন, যদি আপত্তি না থাকে স্কুলে জয়েন করতে পারি। অনেক খুঁজেও ইংরেজি শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না।

সত্যি বলতে, সেই সময় আমি নিজেকে নিয়তির হাতে সপে দিয়েছিলাম। ঘটনা প্রবাহের স্রোত আমাকে যে-দিকে নিয়ে যাবে সে-দিকেই যাবো। এক ধরণের বৈরাগ্য পেয়ে বসেছিলো। তাই কোন কিছু না ভেবেই স্কুলে পড়ানোর কাজটা নিয়ে নিলাম।

শিক্ষকতা শুরু করার তিন মাস পরই জেগে উঠলো আমার ঘুমন্ত পাঠকসত্তা। মনে পড়ে গেলো ঢাকায় যে বাড়িতে ছিলাম সেটা ছেড়ে আসিনি। বাড়িওয়ালাকেও কিছু বলিনি। পলাশীর ঐ বাড়িতে কিছু আসবাব আর কাগজপত্রের সাথে আছে আমার সমস্ত বইপত্রগুলো। এতদিনে আছে কি নেই কে জানে। তাছাড়া বাড়িওয়ালা আমার কাছ থেকে তার প্রাপ্য ভাড়াও পায়।

স্কুল থেকে দু-তিন দিনের ছুটি নিয়ে আমি নভেম্বর মাসের ১ তারিখে ঢাকায় ফিরে আসি, উঠি মামাতোভাই সামাদের বাসায়। দেশ তখনও টালমাটাল। চারদিকে নানা গুজব। সামাদই আমাকে জানালো, যেকোন সময় আবারো নাকি কিছু একটা হবে। তবে সেটা কি, কেন আর কবে হবে–সে-সব নিয়ে আমার কোন আগ্রহ ছিলো না। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর সাথে সাথে আমার রাজনৈতিক আগ্রহেরও সমাধি ঘটে গেছিলো।

পরদিন পলাশীতে গিয়ে দেখি আমার ঘরটা অন্য কেউ ভাড়া নিয়ে নিয়েছে। সম্ভবত বাড়িওয়ালা আমার সমস্ত জিনিসপত্র বিক্রি করে তার পাওনা টাকার কিছুটা আদায় করারও ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। তবে আসবাব আর বাকি জিনিসগুলো নিয়ে আমার কোন আক্ষেপ ছিলো না, আমার আক্ষেপ ছিলো তিল তিল করে জমানো প্রিয় বইগুলোর জন্য।

বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক আমাকে দেখে বেশ অবাক হয়েছিলেন। তিনি ধরেই নিয়েছিলেন আমি আর ঢাকায় ফিরে আসবো না।

"আপনি তো পুলিশ আছিলেন...আ'মিলীগ করতেন না...পলাইলেন ক্যান?"

তাকে জানালাম ব্যক্তিগত কারণে হুট করে গ্রামের বাড়িতে চলে যেতে হয়েছিলো। যাক, তিনি অবশ্য আমার উধাও হবার ঘটনা নিয়ে বেশি আগ্রহ দেখালেন না। আমাকে জানালেন, আমি এসে নাকি ভালোই করেছি। আর ক-দিন পর এলে আমার জিনিসপত্রগুলো ফিরে পেতাম কি-না সন্দেহ। ওগুলো তিনি পানির দরে বিক্রি করে ভাড়া টাকা তোলার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিলেন।

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

আমি যারপরনাই খুশি হয়েছিলাম কথাটা শুনে। তাহলে আমার বইগুলো সব আছে!

বাড়িওয়ালা আমার সব মালপত্র আর বইগুলো চিলেকোঠার একটা ঘরে বস্তাবন্দি করে তালা মেরে রেখে দিয়েছিলেন এই আশায়, আমি হয়তো কোনদিন ওগুলো নিতে আসবো।

বাড়ি ভাড়ার পাওনা টাকা পরিশোধ করে তাকে জানালাম শুধুমাত্র দরকারি কাগজপত্র আর বইগুলো আমি নেবো। আমকাঠের সিঙ্গেল খাট, একটা আলনা আর ছোট্ট আলমিরাটা বাড়িওয়লার কাছেই থাকুক। ওগুলো গ্রামে বয়ে নিয়ে যাবার কোন ইচ্ছে আমার নেই। চাইলে তিনি বিক্রি করে দিতে পারেন। আমার কোন দাবি থাকবে না।

গ্রামে ফিরে যাবার আগে আমি চলে গেলাম হায়দারভায়ের বাসায়। ভাবির কোন খোঁজ নিতে পারিনি দীর্ঘদিন। বেচারি কেমন আছে কে জানে। খুবই সঙ্কোচ হচ্ছিলো তার মুখোমুখি হতে। কিন্তু ওখানে কী বিস্ময় আমার জন্য অপেক্ষা করছে সেটা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি।

নীলুভাবি অন্তঃস্বত্ত্বা!

হায়দারভায়ের মৃত্যুর পর পরই তিনি জানতে পারেন তার পেটে অনাগত সন্তান আসছে। এটা জানতে পেরে আমার চোখদুটো ছল ছল করে উঠেছিলো। আমি মিথ্যে সান্ত্বনা দেবার জন্য ভাবিকে বলেছিলাম তাদের যে সন্তান হবে সেটা আমি স্বপ্নে দেখেছি, কিন্তু আমার এমন মিথ্যে প্রবোধ শেষ পর্যন্ত সত্যি হয়ে গেলো!

পরক্ষণেই মনে পড়ে গেলো হায়দারভায়ের কথা। বেঁচে থাকলে কী করতেন তিনি? অবশ্যই খুশি হতেন। হয়তো আমার কাছে করা প্রতীজ্ঞাটা হাসতে হাসতেই ভেঙে ফেলতেন, আর আমিও সানন্দে যোগ দিতাম তার সঙ্গে!

অবশেষে বিষাদের মধ্যেও সান্ত্বনা খুঁজে পেলাম–এসএম হায়দার পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেও তার বীজ রেখে গেছেন।

*

নীলুভাবির সাথে দেখা করে বেশ উৎফুল্ল হয়ে আমি পলাশীতে ফিরে যাবার সময় কী মনে করে যেন মিনহাজের বাসায় চলে গেলাম। কিন্তু ওখানে গিয়ে জানতে পারলাম, কিছুদিন আগে বাড়িটা ছেড়ে দিয়েছে মিলির স্বামি। ততোক্ষণে ব্যাঙ্ক ছুটি হয়ে গেছে, নইলে ওর ব্যাঙ্কেই চলে যেতাম।

gronthagaar.blogspot.com

মিনহাজকে না পেয়ে বই আর দরকারি জিনিসগুলো নেবার জন্য পলাশীতে ফিরে গেলাম এরপর। চলে আসার সময় বাড়িওয়ালা আমার কাছে এসে জানালেন, একটা কথা বলতে ভুলে গেছিলেন তিনি। আমি উধাও হয়ে যাবার পর দু-তিনবার এক মেয়ে এসে আমার খোঁজ করেছিলো। নামটা তিনি মনে করতে না পারলেও আমার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিলো না কে এসেছিলো।

রামজিয়া শেহরিন।

এই তিনমাসে তার কথা মনে পড়লেও আমি যেন নিজের তৈরি একটা ঘোরের মধ্যে ডুবে ছিলাম। সেই ঘোর থেকে বের হবার কোন ইচ্ছে আমার ছিলো না।

বাড়িওয়ালা আরো জানালেন রামজিয়া শেষবার যখন এসেছিলো তখন একটা চিরকুট দিয়ে গেছিলো তার কাছে, আমি এলে যেন তিনি সেটা দিয়ে দেন। ভদ্রলোক জানালেন, আমার দরকারি কাগজ-পত্রের সাথে ওই চিঠিটা রেখে দিয়েছেন। খুঁজলেই পেয়ে যাবো।

প্রচণ্ড আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও গাট্টি-বোচকা খুলে চিঠি খোঁজাটা সমীচিন বলে মনে করিনি, তার বদলে বাড়িওয়ালার কাছে গাট্টি-বোচকাটা আবারো কিছুক্ষণের জন্য রেখে চলে যাই কাছের একটা টেলিফোন-বুথে। রামজিয়ার ফোন নাম্বারটা আমার মুখস্তই ছিলো। কয়েন ফেলে ওর বাসার নাম্বারে ডায়াল করি। ফোনটা ধরলো অল্পবয়সি এক মেয়ে। আমি রামজিয়াকে চাইলে সে হোল্ড করতে বলে চলে গেলো।

কয়েক মুহূর্ত পর তার কণ্ঠটা শুনতে পেলাম দীর্ঘদিন পর।

"হ্যালো?"

নিজের পরিচয় দিলাম আমি, সঙ্গে সঙ্গে ফোনের ওপাশে নেমে এলো নীরবতা।

"তুমি! এতদিন পর?" কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললো সে।

"দেশের বাড়িতে চলে গেছিলাম...কাল ঢাকায় এসেছি।" শুধু এটুকুই বলতে পারলাম।

আলতো করে একটা দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেলাম আমি। তারপরই সে বলে উঠলো, "তুমি আমার চিঠি পাওনি?"

"না, মানে..." কী বলবো বুঝতে পারছিলাম না। তার চিরকুটটা জরুরি কাগজের মধ্যে আছে। আমি সেটা পড়ে দেখিনি তখনও।

"আ-আজ আমার...গায়েহলুদ।" আস্তে করে বললো সে। "কাল বিয়ে।"

বজ্রাহত হলাম আমি। কিছু বলতে পারলাম না। কয়েক মুহূর্ত নীরবতার

Gronthagar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

পর আমার হাত থেকে রিসিভারটা আস্তে করে পড়ে গেলো। একটা ঘোরের মধ্যে হাটতে শুরু করলাম।

কথাটা শোনার পর আবারো বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠেছিলো আমার। বুঝতে পারলাম, এই শহরের সাথে আমার সব ধরণের লেনদেন চুকে গেছে।

গ্রামের পথে রওনা দেবার আগে আরো একটা জায়গায় যাবার তাড়না বোধ করেছিলাম আমি, কিন্তু নতুন করে প্রচণ্ড দুঃবোধে আক্রান্ত হবার ঝুঁকিটা আর নিতে পারিনি।

গ্রামে পৌছাতেই খবর পেলাম জেলখানায় পৈশাচিক একটি ঘটনা ঘটে গেছে। হত্যা করা হয়েছে জাতীয় চার নেতাকে। দেশের অবস্থা টালমাটাল। কে ক্ষমতায় আছে সেটাও পরিস্কার নয়। কখন কী হয়ে যায় বলা যায় না। লোকজন বলাবলি করছে, বঙ্গবন্ধুকে যারা সপরিবারে হত্যা করেছিলো তারাই নাকি এই জঘন্য ঘটনা ঘটিয়েছে।

গ্রামে ফিরে বইপত্র আর কাগজপত্র ঘেঁটে রামজিয়ার চিরকুটটা উদ্ধার করতে পেরেছিলাম আমি। ছোট্ট একটা কাগজ। তাতে সম্বোধন ছাড়া কয়েক লাইনের হাতের লেখা :

আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। বুঝতে পারছি না কী করবো। তোমার সাথে দেখা করতে কেন এসেছিলাম তা-ও জানি না।
শেষ পর্যন্ত পরিবারের কথা মেনে নিতে হলো। ছেলে আমেরিকায় সেটেল্‌ড। বিয়ের পর পরই ওখানে চলে যাবো। হয়তো তোমার সাথে আর দেখা হবে না। তুমি যে কোথায় হারিয়ে গেলে জানি না।
ভালো থেকো।

রামজিয়া

এই ছোট্ট চিরকুটটা আজো আমার কাছে রয়ে গেছে। মাঝেমধ্যেই ওটা আমি দেখি। কেন দেখি জানি না। দেখে যে খুব ভালো লাগে তা-ও নয়। তার পরও দেখি। দীর্ঘ দুই যুগ ধরেই দেখে আসছি।

gronthagaar.blogspot.com

অধ্যায় ৩৬

সময় সব কিছু বদলে দেয়। দুই যুগ মহাকালের গর্ভে তুচ্ছ হলেও একজন মানুষের জীবনে বিরাট একটি অংশ। এই সময়ের মধ্যে কতো উত্থান-পতন ঘটে যায়, কতো কিছুর আগমণ ঘটে। আবার অনেক কিছুই যায় হারিয়ে।

আমি মিনহাজের মুখটা কল্পনা করলাম। অমায়িক আর সজ্জন একজন মানুষ। চেহারার মধ্যে নিরীহ একটি ভাব আছে। অন্তত দুই যুগ আগে তা-ই ছিলো। কিন্তু এখন, আজ এতগুলো বছর পর তার চেহারায় নিশ্চয় অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সেই বিষন্ন চোখজোড়া, রেগে গেলে নীচের ঠোঁটের মৃদু কাঁপন, কপালের উপর হামলে পড়া চুলের গোছা, মার্জিত ভঙ্গি–সব কি অটুট আছে? নাকি সময়ের চাবুক পড়ে বদলে গেছে!

দীর্ঘ বাসযাত্রায় এসব ভাবছিলাম আমি। বিরাশি সালের দিকে একবার কী একটা কাজে ঢাকায় এসেছিলাম। তখন মিনহাজের ব্যাঙ্কে গেছিলাম দেখা করার জন্য। তার পুরনো কলিগদের কেউই সেখানে ছিলো না। নতুন যারা ছিলো তারা আমাকে বলতে পারেনি মিনহাজ কোথায় বদলি হয়ে গেছে, কিংবা আদৌ চাকরি করে কি-না। ব্যাঙ্কের এক পুরনো পিয়ন শুধু বলতে পারলো, পঁচাত্তরের শেষের দিকেই মিনহাজ ঢাকার বাইরে বদলি হয়ে গেছিলো। এরপর তার কোন খোঁজ সে জানে না। নব্বইর আগে দিয়ে লেখালেখির কারণে আবারো ঢাকায় ফিরে আসার পর থেকে আজ পর্যন্ত মিনহাজের কোন খবর আমি জানতে পারিনি। যেন দুনিয়ার বুক থেকে উধাও হয়ে গেছে সে। ঠিক ইমতিয়াজের মতোই!

আজ দুই যুগ পর নিভৃত এক গ্রামে বসবাস করা মিনহাজের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি।

গতকাল সকালে আমার ঘুম ভেঙেছিলো রামজিয়ার ফোনকলে। রাত জেগে একটু লেখার চেষ্টা করেছিলাম, তাই সকাল নটা পর্যন্ত ঘুমিয়েছিলাম আমি। সে-ই আমাকে জানালো মিনহাজের ঠিকানা জোগাড় করা গেছে। ও কোনো ফোন ব্যবহার করে না। আত্মীয়-স্বজনদের সাথেও খুব একটা যোগাযোগ রাখে না। নিজগ্রামের কাছাকাছি একটি মফস্বল শহরে তার ব্যাঙ্কের একটি শাখায় বদলি হয়ে চলে গেছিলো। বাপ-দাদার বিশাল ভিটেয় থাকে এখন।

gronthagaar.blogspot.com

লেখাটা দ্রুত শেষ করার তাগিদ অনুভব করছিলাম আমি, সেই সাথে মিনহাজের সঙ্গে দেখা করার জন্যও মুখিয়ে ছিলাম, তাই দেরি না করে পরদিন সকাল সকাল রওনা হয়ে যাই অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপিটার একটি কপি নিয়ে।

বাসের জানালা দিয়ে দূরের ধানক্ষেত আর গুচ্ছ-গুচ্ছ গ্রামগুলোর দিকে উদাস হয়ে চেয়ে থেকে ভাবলাম, আজ এতদিন পর আমাকে দেখে মিনহাজ চিনতে পারবে তো? আমার ধারণা, পারবে না। তবে পরিচয় দিলে অবশ্যই মনে পড়ে যাবে, দুই যুগ আগে আমার মতো এক অক্ষম পুলিশ অফিসারের সাথে তার অল্প-বিস্তর পরিচয় ছিলো।

কয়েক ঘণ্টার ক্লান্তিকর বাসযাত্রার অবসান হলো দুপুরের পর পরই। চামড়ার ব্যাগটা নিয়ে পা বাড়ালাম মিনহাজের পৈতৃক ভিটার দিকে। বাসস্টেশনেই এক লোককে ঠিকানাটা দেখালে সে বলে দিলো কিভাবে যেতে হবে ওখানে। রিক্সায় করে গেলে পনেরো মিনিটের মতো পথ।

আমি একটা রিক্সা নিয়ে রওনা হয়ে গেলাম। সাপের মতো এঁকেবেঁকে কাঁচা-পাকা রাস্তা মাড়িয়ে ঢুকে পড়লাম বিশুদ্ধ এক গ্রামে। বিশাল একটি কাঠবাদাম গাছের সামনে এসে রিক্সাওয়ালা হাত তুলে দেখিয়ে দিলো উঁচু বেড়া আর কাঠের গেটের একটি বাড়ির দিকে। স্থানীয়রা একে খামারবাড়ি বলেই ডাকে।

বাড়ির সামনে বিশাল একটি পুকুর। দেখেই বোঝা যায় মাছচাষ করা হয়। পুকুরের চারপাশে বড় বড় গাছ আর আগাছায় পরিপূর্ণ একটি জায়গা। দু-পাশে ছোটোবড় ডোবায় কচুরিপানায় ভরে উঠেছে। প্রায় জঙ্গলের মতো রুপ নিয়েছে যেন পুরো জায়গাটি। সেই জঙ্গলময় জায়গার ভেতর দিয়ে সরু একটা রাস্তা চলে গেছে। একদম নিরিবিলি আর সুনসান। দেখে মনে হয় না কোন মানুষ থাকে এখানে। আমি সেই সরুপথ দিয়ে এগিয়ে যেতেই দেখতে পেলাম পুরনো দিনের তৈরি ছোটোখাটো একটি একতলা বাড়ি। এমন বাড়ি গ্রামে প্রায়ই দেখা যায়। তিন-চারটা ঘর হবে। সামনে টানা বারান্দা। একটা পুরনো চেয়ার আর আরামকেদারা আছে সেখানে। আরো আছে আগাছা সাফ করার কাস্তে, নিড়ানি, কোদাল আর দড়ি। বামদিকের ঝোঁপের সামনে বিভিন্ন সাইজের কিছু বাঁশ স্তুপ করে রাখা।

বাড়ির সামনে এক চিলতে ফাঁকা জায়গা আগাছায় পরিপূর্ণ। বোঝা গেলো খুব বেশি মানুষজন এখানে যাতায়াত করে না। বাড়ির ডানদিকে একটি মেঠোপথ চলে গেছে। আর বামদিকটা ঝোঁপঝাঁড়ে পরিপূর্ণ। নাকে টের পেলাম অতিপরিচিত সেই গন্ধটা।

gronthagaar.blogspot.com

গরু। গোবর।

দূর থেকে একটা হাম্বা ডাক ভেসে এলে বুঝতে পারলাম বাড়ির পেছনে গো-খামার আছে। সেজন্যেই এলাকার লোকজন এটাকে খামারবাড়ি বলে ডাকে।

বাড়ির সামনে গিয়ে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। ঘরের দরজাগুলো খোলা থাকলেও ভেতরে কাউকে দেখতে পাচ্ছিলাম না।

"কেউ কি আছেন?" কিছুক্ষণ পর ডেকে উঠলাম আমি। কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে আবারো ডাকলাম। "কেউ আছেন?"

একটু পর শুকনো ঘাসে পা মাড়ানোর শব্দ শুনতে পেলাম। বাড়িটার ডানদিকে যে মেঠোপথ চলে গেছে সেখানে দেখলাম ভারি কাঁচের চমশা চোখে এক লোক দাঁড়িয়ে আছে খাবারের ট্রে হাতে নিয়ে। মাথার চুল পাতলা আর সাদা। একটু কুঁজোও মনে হলো। পাজামা আর ফতুয়া গায়ে। বেশ পরিপাটি।

আমার দিকে ভুরু কুচকে তাকালো ভদ্রলোক। আমি দুয়েক পা এগিয়ে গেলাম তার দিকে।

"মিনহাজসাহেব...?"

"আ-আপনি...কে?" আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বেশ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো সে।

চশমার আড়ালে থাকা চোখদুটো চিনতে আমার বেগ পেতে হলো না।

"কোত্থেকে এসেছেন?" তার কণ্ঠ আগের তুলনায় ভারি। তাতে মিশে আছে উদ্বেগ।

"অনেক দিন আগের কথা...চিনতে না পারটাই স্বাভাবিক," মুচকি হেসে বললাম, "মিনহাজসাহেব...আমি আজিমপুর থানার এএসআই–"

"ও," আমার কথা শেষ হবার আগেই বিস্ময়ে বলে উঠলো সে, "আপনি?!" যেন আকাশ থেকে পড়লো। চোখেমুখে বিস্ময় তার। "আমি আপনাকে দেখে চিনতেই পারিনি।"

"সেটাই স্বাভাবিক," হেসে বললাম আমি, "কতো দিন পর দেখা হলো।"

প্রসন্নভাবে হেসে মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

দুই যুগ পর আমার মতো স্বল্পপরিচিত একজন মানুষ বলা নেই কওয়া নেই হুট করে তার বাড়িতে হাজির হয়েছি–সুতরাং তার দিক থেকে অবাক হবার যথেষ্ট কারণ আছে।

হাতের ট্রে-টা বারান্দায় রাখা একটা চেয়ারের উপর রেখে আমার দিকে এগিয়ে এলো। জোর করে সৌজন্যমূলক হাসি দেবার চেষ্টা করলো একটু।

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

তাতে অবশ্য আমার আগমণে যে পুরোপুরি খুশি হতে পারেনি সেটা ঢাকা পড়ে গেলো না।

"এতদিন পর..." বললো মিনহাজ, "কি মনে করে?" তারপর আমি কিছু বলার আগেই হাতটা বাড়িয়ে দিলো।

করমর্দন করলাম তার সাথে। "কেমন আছেন?"

হাসিটা মিইয়ে গেলো তার, স্থিরচোখে চেয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে। "এই তো, চলে যাচ্ছে।" একটু থেমে আবার বললো, "আপনার কি খবর? রিটায়ার করেছেন?"

মাথা দোলালাম আমি। "অনেকদিন আগেই পুলিশের চাকরি ছেড়ে দিয়েছি।"

"তাই নাকি?"

"আপনি ঢাকা ছাড়ার আগে," একটু থেমে আবার বললাম, "পঁচাত্তর সালেই।"

মিনহাজের কপালে ভাঁজ পড়লো। "তখনই? মানে, আপনার ঐ কলিগ...কী যেন নাম?"

"এসএম হায়দার।"

"হ্যা, হ্যা। ঐ ভদ্রলোক মারা যাবার পর?"

মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

"আমার এখানে?...কী মনে করে?" উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইলো মিনহাজ।

"একটা দরকারে এসেছি," বললাম তাকে।

সৌজন্যতার খাতিরেই যেন আমাকে ঘরে আসতে বললো সে। আমি তার পেছন পেছন ঢুকে পড়লাম। ঘরে ঢুকেই মিনহাজ একটা বড় জানালার পর্দা টেনে দিলো। ওটা দিয়ে বাড়ির পেছনে থাকা বিশাল খামারটা দেখা যায়। তারপর আমাকে বসার ইশারা করলো সে। আমি সোফায় বসে পড়লে মিনহাজ আমার বিপরীতে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লো।

এক সেট পুরনো আমলের সোফা, ময়লা আর তেল চিটচিটে হয়ে গেছে, পড়ার টেবিল, দুটো চেয়ার, একটা বুকসেল্‌ফ আর আলমিরা ছাড়া ঘরটা বলতে গেলে ফাঁকা। বুকশেল্‌ফে অনেক বই। বেশিরভাগই মেডিকেলের। আমি জানতাম, মিনহাজ এখানে হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস করে। তাছাড়া, খামার করে সে–গবাদিপশুর রোগ-বালাই সম্পর্কেও তাকে সচেতন থাকতে হয়। তবে বইগুলোর দিকে মনোযোগ দেবার আগেই আমার চোখ আটকে গেলো একটা ছবিতে।

gronthagaar.blogspot.com

সেই চোখ! সেই মায়াভরা মুখ!

দুই যুগ আগে মিনহাজের ঘরে মিলির এই ছবিটাই আমি দেখেছিলাম।

"দুপুরের খাবার খেয়েছেন?"

মিনহাজের কথায় সম্বিত ফিরে পেয়ে তাকালাম। "হ্যা," মিথ্যেটা অবলীলায় বলে দিলাম তাকে।

"তাহলে চা বানাই?"

"আরে না, তার কোন দরকার নেই," বললাম তাকে। সত্যি হলো চা সিগারেট দুটোই খাওয়ার তেষ্টা পেয়ে বসেছে।

"সিগারেটের অভ্যাস এখনও আছে?"

মুচকি হেসে মাথা দোলালাম।

"আমি অবশ্য ছেড়ে দিয়েছি...শরীরে আর কুলোয় না।" একটু থেমে আবার বললো, "আপনি কিন্তু সিগারেট খেতে পারেন, কোন সমস্যা নেই।"

"এখন খেতে ইচ্ছে করছে না," আবারো মিথ্যে বললাম। ঘরের চারপাশটা দেখে জিজ্ঞেস করলাম, "মনে হচ্ছে একাই থাকেন?"

মলিন হাসি দিলো সে। "সঙ্গি পাবো কোথায়?"

"কেন, আর বিয়ে করেন নি?"

মাথা দুলিয়ে জবাব দিলো। "সংসার করার ইচ্ছে আর হয়নি।"

কথাটা শুনে একটু অবাকই হলাম। যারা বিয়ে করে সুখি হয় তারা স্ত্রী বিয়োগ হবার পর খুব বেশি দিন একা থাকতে পারে না। আবার বিয়ে করে বসে। কারণ, দ্বৈতজীবনে যে সুখি হওয়া যায় সে অভিজ্ঞতা তার আছে। আর যে মানুষটি বৈবাহিক জীবনে অসুখি, সে স্ত্রী বিয়োগের পর আর ও পথে পা বাড়ায় না। দ্বিতীয়বার অসুখি হবার ঝুঁকি নিতে চায় না সে।

তাহলে কি মিনহাজও সে-রকম অসুখি ছিলো?

অসম্ভব। এটা আমার বিশ্বাস করতেও কষ্ট হলো। মিলির প্রতি ওর যে প্রেম আর ভালোবাসা আমি দেখেছি সেটা অতুলনীয়। ঈর্ষনীয়। অসুখি হলে এত ভালোবাসা জন্মালো কী করে?

"আপনার কি খবর? বাচ্চা-কাচ্চা ক-জন?"

বিব্রতকর হাসি দিয়ে মাথা দোলালাম আমি। দীর্ঘদিন পর দেখা হলে আমার পরিচিত সবাই এই প্রশ্নটা করে। "বিয়ে করিনি।"

অবাক হলো মিনহাজ। "বলেন কি!"

আমি কিছু না বলে নিঃশব্দে হাসি দিলাম শুধু।

কয়েক মুহূর্ত পর মিনহাজ বললো, "আমি যে এখানে থাকি সেটা কিভাবে জানলেন?"

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

মিনহাজের অভিব্যক্তি দেখে মনে হলো, তার গোপন আস্তানার খবরটা চাউর হওয়ায় একটু হতাশ হয়েছে সে।

"রামজিয়ার কাছ থেকে।" ছোট্ট করে বললাম।

তার কপালে ভাঁজ পড়লো। "ও কি দেশে...?"

"হ্যা। তিন-চারমাস হয় এসেছে, আর বোধহয় ফিরে যাবে না।"

"কিন্তু ও তো আমার এখানকার ঠিকানা জানে না।" আবারো সন্দিগ্ধ দেখালো মিনহাজকে।

"আমি যখন বললাম আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই তখন আপনার কোন এক রিলেটিভের সাথে যোগাযোগ করে এখানকার ঠিকানাটা জোগাড় করে দিয়েছে।"

আমি দেখতে পেলাম মিনহাজের চেহারায় অজ্ঞাত এক ভয় জেঁকে বসেছে। কেমন চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে। ভেবে পেলাম না, তার এমন আচরণের কারণ কি।

"আ-আপনি আমার সাথে দেখা করতে চাইছেন কেন?"

"একটা কাজে..." কথাটা বলেই চামড়ার ব্যাগের ভেতর থেকে পাণ্ডুলিপিটা বের করে আনলাম।

"কি এটা?" তার চোখেমুখে যতো না কৌতুহল তার চেয়ে বেশি উদ্বেগ।

"আমার লেখা," বলেই পাণ্ডুলিপিটা তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। "পুলিশের চাকরি ছাড়ার পর আমি লেখালেখি করতে শুরু করি।"

"তাই নাকি?"

ভালো করেই জানি অবাক হয়েছে। পুলিশ থেকে লেখক–এর চেয়ে বেমানান আর কী হয় এ দেশে!

"তেমন সিরিয়াস কিছু না, গল্প-উপন্যাস লিখি...গাল-গল্প বলতে পারেন," বলেই হেসে ফেললাম।

"কি ধরণের গল্প, রোমান্টিক?" আমার পাণ্ডুলিপিটা হাতে নিয়ে বললো সে।

মুচকি হেসে মাথা দোলালাম। সম্ভবত শিরোনামটা দেখে তার এমন ধারণা করেছে : কেউ কথা রাখেনি।

"না। মার্ডার মিস্ট্রি। ক্রাইম-ফিকশন...খুন-খারাবির গল্প।" কথাটা বলার পরই বুঝতে পারলাম খুন-খারাবি শব্দটা ব্যবহার না করলেই ভালো হতো। অন্তত যে মানুষটার জীবন একটা খুনের কারণে এলোমেলো হয়ে গেছে তার সামনে এটার ব্যবহার সব সময়ই অপ্রীতিকর স্মৃতি জাগিয়ে তুলবে নিশ্চয়।

gronthagaar.blogspot.com

মিনহাজের চেহারা দেখে মনে হলো না আমার লেখালেখি নিয়ে তার কোন আগ্রহ আছে। "আপনি বলছিলেন, একটা কাজে এসেছেন আমার কাছে?" মনে করিয়ে দিলো সে।

মাথা নেড়ে সায় দিলাম। "হ্যা। এই বইটার ব্যাপারে আর কি।" একটু থেমে কথাগুলো গুছিয়ে নিলাম। "এটা মিলির ঘটনাটা নিয়ে।"

মিনহাজ আমার দিকে ফ্যালফ্যাল চোখে চেয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত।

"আমার মনে হলো, যেহেতু এটা মিলিকে নিয়ে, আপনিও আছেন এখানে, তাই আপনার কাছ থেকে মৌখিকভাবে অনুমতি নেয়া উচিত। অন্তত প্রকাশ করার আগে জানা দরকার কোন বিষয়ে আপনার আপত্তি আছে কি-না।"

সন্দেহের সুরে বললো মিনহাজ, "শুধু এজন্যে আমাকে খুঁজে বের করে এখানে চলে এসেছেন?"

গভীর করে নিঃশ্বাস নিয়ে নিলাম আমি। মিথ্যে বলে প্রশ্নটা এড়িয়ে যাওয়ার চিন্তা বাদ দিলাম। "না। আরেকটা কারণও আছে।"

"কি?" মিনহাজকে আবারো সন্দিগ্ধ দেখালো।

"আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে, আপনি আসলে কেন ঢাকা ছাড়লেন।"

"আপনার কি মনে হয়?" মিনহাজ পাল্টা জানতে চাইলো।

সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে বলেই ফেললাম, "ইমতিয়াজের কারণে।"

আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসি দিলো সে। হাসিটার অর্থ আমি বুঝতে পারলাম না।

"সে হয়তো আপনার কোন ক্ষতি করতে পারে এই ভয়ে ঢাকা ছেড়েছেন। হায়দারভায়ের খুন হবার খবরটা শোনার পর সম্ভবত আপনি এমন ভয় পেতে শুরু করেন।"

মাথা দোলালো মিনহাজ। "আমি ইমতিয়াজকে মোটেও ভয় পেতাম না। একটুও না।"

"তাহলে?"

কাঁধ তুললো সে। "আপনি তো সাহিত্যিক, আপনার মতো গুছিয়ে বলতে পারবো না। সত্যি বলতে, ঢাকা শহরে থাকতে ইচ্ছে করছিলো না। শহরটার উপরেই আমার অভিমান জন্মে গেছিলো। কেন, সেটা নিশ্চয় আপনি আন্দাজ করে নিতে পারছেন।"

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

"একটু নিরিবিলি থাকতে চেয়েছিলাম। এরকম শান্ত আর নিরিবিলি গ্রামিন

Gronthagar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

পরিবেশে।" আমাকে চুপ থাকতে দেখে আবারো বলতে শুরু করলো, "এটা আমার পৈতৃক বাড়ি। থাকার মতো কেউ ছিলো না বলে খালিই পড়ে ছিলো। ঐ ঘটনার পর ভাবলাম, বাকি জীবনটা এখানেই কাটিয়ে দেই।"

আমি চুপ মেরে রইলাম।

"তাছাড়া এখান থেকে খুব কাছেই, টাউনে আমার ব্যাঙ্কের একটি ব্র্যাঞ্চ আছে। কোন ভালো অফিসার বদলি হয়ে এখানে আসতে চাইতো না। প্রমোশনের লোভ দেখালেও না। তো, আমি সুযোগটা নিয়ে নিলাম। এক ঢিলে দুই পাখি মারলাম আর কি।" একটু থেমে আবার বললো সে, "প্রমোশনও পেলাম, সেইসাথে যেটা চাচ্ছিলাম সেটাও পেয়ে গেলাম।" কথাটা শেষ করে মুখে হাসি ধরে রাখলো মিনহাজ। সেই হাসি একদম কৃত্রিম।

আমি তার এরকম হাসির কারণটা ধরতে না পারলেও এটা বুঝতে পারছিলাম, আমার মতোনই ঢাকা শহরে দম বন্ধ হয়ে পড়ছিলো মিনহাজ। তাকে আর সে-কথা বললাম না আমিও তার মতোই ঢাকা ছেড়েছিলাম।

"আপনি কি জানেন, ইমতিয়াজের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি?"

আমার মনে হলো কথাটা শুনে একটু চমকে উঠলো সে। "তাই নাকি?"

"হুম।"

বাঁকাহাসি দিলো এবার। "এরকম জঘন্য লোকজন সব সময়ই পার পেয়ে যায়। হয়তো বিদেশে চলে গেছে। বিয়েশাদি করে সংসারি হয়েছে।"

"আমারও সে-রকম মনে হয় মাঝেমাঝে," একমত পোষণ করে বললাম। "বছরখানেক ধরে ওকে আমি খুঁজে বেরিয়েছি...আশ্চর্যের ব্যাপার কি জানেন, কেউ তার খোঁজ জানে না। এমন কি সে বিদেশে গেছে কি-না তা-ও জানে না।"

মিনহাজ কৌতুহলভরে চেয়ে রইলো আমার দিকে।

"অনেক খোঁজাখুঁজি করে ওর এক বোনকে খুঁজে পেয়েছিলাম...ওই মহিলাও ইমতিয়াজের কোন খবর জানে না।"

"কে জানে, হয়তো মারা গেছে।"

মিনহাজের কথার সাথে আবারো সায় দিলাম আমি। "তা হতে পারে। কিন্তু কিভাবে মারা গেলো, কবে মারা গেলো সেটাও কেউ জানবে না, ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত না?"

"অদ্ভুত কেন হবে," বললো মিনহাজ, "ওর মতো লোকজন যেকোন সময় বেঘোরে মরতেই পারে।"

gronthagaar.blogspot.com

কথাটায় যুক্তি আছে। পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের পর পর ইমতিয়াজ নিশ্চয় ঢাকা ছেড়েছিলো কিংবা আত্মগোপনে চলে গেছিলো। সেই সম্ভাবনাই বেশি। তখনই হয়তো কোনভাবে মারা পড়েছে সে।

"দুই যুগ পার হয়ে গেছে, অনেক কিছুই বদলে গেছে। এখন এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী লাভ।"

মিনহাজের কথায় স্থিরচেখে চেয়ে রইলাম আমি। "কিন্তু আপনি নিশ্চয় ভুলতে পারেন নি?"

আবারো মুচকি হাসলো সে। "আমি আমার কথা বলছি না।"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম তার দিকে।

"আপনার কথা বলছি।" আক্ষেপে মাথা দোলালো মিনহাজ। "আমি নিজেই ইমতিয়াজের কী হলো না হলো সে-সব নিয়ে মাথা ঘামানো বাদ দিয়ে দিয়েছি, আপনারও সেটা করা উচিত। এত বছর পর এসব জেনে আপনি কী করবেন? ইমতিয়াজ যদি বেঁচে থাকে তাহলেই বা কি করবেন, বলেন?"

"আপনি রাজি থাকলে কেসটা আবার রি-ওপেন করা কিন্তু সম্ভব।"

আমার দিকে বিস্ময়ে চেয়ে রইলো মিনহাজ। "আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে? এত বছর পর এরকম কোন কেস নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে?" আক্ষেপে মাথা দোলালো। "আসামিরই তো কোন খবর নেই।"

"কেসটা রি-ওপেন করা হলে পুলিশ খুঁজে বের করতে পারবে ইমতিয়াজ বেঁচে আছে নাকি মরে গেছে। বেঁচে থাকলে কোথায়–"

হাত তুলে আমাকে থামিয়ে দিলো মিনহাজ। "প্লিজ। এসব কথা আমাকে বলবেন না। এত বছর পর আমি এসব নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে চাই না। যা হবার তা হয়ে গেছে।"

কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বললাম, "আমি চাই মিলির স্মৃতিটা বেঁচে থাক। ওর সাথে যা হয়েছে–"

"মিলির স্মৃতি একান্তই আমার ব্যক্তিগত একটি বিষয়।" আমার কথার মাঝখানে আবারো বাধা দিয়ে বলে উঠলো মিনহাজ। "ওটা আমৃত্যু আমার সাথে থাকবে।"

"আপনি চান না আমি বইটা প্রকাশ করি?" উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইলাম।

"আমার মনে হয়, এর কোন দরকার নেই," দৃঢ়ভাবে বললো সে। "দুই যুগ আগের ক্ষত এতদিনে মুছে না গেলেও শুকিয়ে গেছে। আপনি সেটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আবার জাগাতে চাইছেন কেন?"

হতাশ হয়ে চেয়ে রইলাম আমি। কী বলবো বুঝতে পারলাম না।

Gronthagar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

"এসব বাদ দিন, অন্য কোন গল্প লিখুন। সেটাই ভালো হয়।" একটু থেমে আবার বললো তবে অনেকটা বিড়বিড় করে, "আমাদের দু-জনের জন্যই।"

আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বের হলো না। যদিও এরকম পরিস্থিতির জন্য আমি মনে মনে প্রস্তুত ছিলাম, ভেবে রেখেছিলাম, মিনহাজ রাজি না হলে গল্পটার চরিত্রগুলোর নাম পাল্টে দেবো।

" 'কেউ কথা রাখেনি' মানে কি?" জানতে চাইলো আমার কাছে। "কে কথা রাখেনি?" তার কণ্ঠে অসন্তোষ।

মিনহাজের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে বইয়ের শিরোনামটি যেন সরাসরি তাকে উদ্দেশ্য করেই দিয়েছি!

আমি ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলাম, "আপাতত একটা নাম দেবার দরকার তাই দিয়েছি। এটাই যে শেষ পর্যন্ত থাকবে তা কিন্তু নয়।"

মনে হলো বইয়ের শিরোনাম নিয়েও তার খুব একটা আগ্রহ নেই আর। পাণ্ডুলিপিটা ফিরিয়ে দিলো আমাকে। "এসব পড়ার কোন ইচ্ছে নেই। আমি যেটা ভুলে যেতে চাই, আপনি সেটা মনে করিয়ে দিতে চাচ্ছেন।"

আমি লেখক মানুষ, প্রত্যাখান আমার কাছে অভিনব কিছু নয়। প্রকাশকের কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়াটা নতুন লেখকের জন্য স্বাভাবিক ব্যাপার। আর প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে যে প্রত্যাখ্যান পর্বের সমাপ্তি ঘটে তা-ও নয়। তখন আবার পাঠকের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হবার সম্ভাবনা তৈরি হয় প্রতিটি লেখা প্রকাশের পর পর। কিন্তু মিনহাজের কাছ থেকে বিমুখ হয়ে মুষড়ে পড়লাম। আমি চেয়েছিলাম মিলির ঘটনাটা যেহেতু সত্যি, তাই সেটা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে হলেও বেঁচে থাকুক।

আমি আমার পাণ্ডুলিপিটা ব্যাগে ভরে উঠে দাঁড়ালাম।

"সরি," মিনহাজও উঠে দাঁড়ালো। "আশা করি কিছু মনে করেননি।"

"না, ঠিক আছে," ভদ্রতা দেখিয়ে বললাম তাকে। দরজা দিয়ে বের হতেই আমার মনে হলো একটা কথা মিনহাজকে না বললে অনুচিত হবে। ঘুরে দাঁড়ালাম আমি। "আপনার নাম, মিলির নাম...সব নাম বদলে দিয়ে যদি বইটা প্রকাশ করি তাহলে নিশ্চয় কোন আপত্তি থাকবে না?"

আমার এ কথা শুনে মিনহাজ একটু ভেবে নিলো। নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো সে।

"আসলে মিলির খুনটা আমি ভুলতে পারিনি আজো। এত বছর পরও আমি এসব নিয়ে ভাবি। এই একটা ঘটনা আপনার, আমার অনেকের জীবনই পাল্টে দিয়েছে। এটা আপনার একান্ত নিজস্ব ব্যাপার নয়, মিনহাজসাহেব। এই ঘটনায়

gronthagaar.blogspot.com

হায়দারভায়ের মতো মানুষও খুন হয়েছেন। এরকম একটি ঘটনা না লিখে আমি থাকতে পারিনি," একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অবশেষে বলে ফেললাম, "এই বই আমি প্রকাশ করবোই। ইমতিয়াজকেও খুঁজে বের করবো। যতোক্ষণ না জানতে পারছি সে মারা গেছে। পারলে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েন।"

কথাটা বলেই পা বাড়ালাম সামনের দিকে।

"দাঁড়ান।"

আমাকে চমকে দিয়ে মিনহাজ বলে উঠলো পেছন থেকে। ঘুরে তাকালাম আমি। ঘরে ঢোকার জন্য ইশারা করলো সে।

"ভেতরে আসুন। আপনাকে একটা কথা বলার আছে আমার।"

সত্যি বলতে, কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হয়েছিলো মিনহাজের ভাবভঙ্গি কেমনজানি রহস্যময়। একটা অজানা আশঙ্কাও জেঁকে বসলো আমার মধ্যে, তবে সেটা মাথা থেকে ঝেড়ে আমি আবার ঘরে ঢুকে পড়লাম। একটু আগে যেখানে বসেছিলাম সেখানেই বসলাম আমরা দু-জন।

মিনহাজ কপালের বামপাশটা ঘষলো হাত দিয়ে। "আপনার এবং হায়দারসাহেবের কাছে আমি আজীবন কৃতজ্ঞ। আপনারা মিলির হত্যাকারীকে ধরেছিলেন, অনেক বাধা-বিপত্তি ডিঙিয়ে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেবার চেষ্টা করেছিলেন। এ কাজ করতে গিয়ে হায়দারসাহেব অকালে প্রাণ হারিয়েছেন। আপনার দুঃখটা আমি বুঝি। কিন্তু তার পরও আমি বলবো, এসব বাদ দিতে। ইমতিয়াজকে খুঁজে কোন লাভ নেই।"

আমি হতাশ আর বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকলাম। এ কথা বলার জন্য আবারো আমাকে ঘরে ডেকে এনেছে মিনহাজ?!

"কেন বলছি জানেন?"

আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম তার দিকে।

"কারণ ইমতিয়াজ বেঁচে নেই!"

Gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

অধ্যায় ৩৭

খুনের গল্প

১৯৭৫ সালের পনেরোই আগস্টের পর অন্য অনেকের মতোই ইমতিয়াজ আত্মগোপনে চলে গিয়েছিলো। অক্টোবরের শুরুর দিকে একদিন কি একটা দরকারে মিরপুরে তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে গেছিলো মিনহাজ। ওখান থেকে ফেরার সময়ই সে ইমতিয়াজকে দেখতে পায় এক বাড়িতে ঢুকছে। বুঝে যায়, এই বাড়িতেই ইমতিয়াজ আত্মগোপন করে আছে।

পর পর কয়েক দিন মিরপুরে গিয়ে ঐ বাড়ি থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ইমতিয়াজের গতিবিধি লক্ষ্য করে সে। জানতে পারে খুনি কখন বের হয়, কোথায় যায়, আবার কখন ফিরে আসে।

এরপর মিনহাজ দ্রুত একটি পরিকল্পনা করে ফেলে, সেই অনুযায়ি প্রস্তুতি নিতেও শুরু করে দেয়। এক ডাক্তার বন্ধুর কাছ থেকে কড়া ডোজের ক্লোরোফর্ম সংগ্রহ করে সে। টাকা দিয়ে একটা পিস্তল কিনে নেয়। তারপর এক সন্ধ্যায় একটা প্রাইভেট কার জোগাড় করে চলে যায় মিরপুরে। গাড়িটা ঐ বাড়ির সামনে পার্ক করে অপেক্ষায় থাকে। সে জানতো, অন্য কোথাও আড্ডা দিয়ে রাত আটটা-ন'টার দিকে ইমতিয়াজ ঐ বাড়িতে ফিরে আসবে রাতে থাকার জন্য।

ঐদিন সে বাড়িতে ঢোকার আগেই মিনহাজ পেছন থেকে ক্লোরোফর্মে ভেঁজানো রুমাল দিয়ে তার নাক-মুখ চেপে ধরে। মুহূর্তেই অজ্ঞান করে ফেলে তাকে। তারপর পাঁজাকোলা করে গাড়ির পেছনে ট্রাঙ্কে রেখে তালা মেরে দেয়। গাড়ি নিয়ে দ্রুত চলে যায় সেখান থেকে।

আগে থেকে ঠিক করে রাখা নির্জন এক রেললাইনের পাশে গাড়িটা রেখে অপেক্ষা করতে থাকে ট্রেন চলে যাবার জন্য। সেই রেললাইন দিয়ে ট্রেন চলে যাবার সময় গাড়ির পেছনের ট্রাঙ্ক খুলে ইমতিয়াজকে পর পর তিনটি গুলি করে খুন করে ফেলে মিনহাজ। ট্রেনের বিকট শব্দের কারণে তার গুলির আওয়াজ ধামাচাপা পড়ে যায়।

এরপর ইমতিয়াজের লাশটা পচা কোন খালে ফেলে দেয়া হয়। ঢাকা শহরে

gronthagaar.blogspot.com

তখন খালের অভাব ছিলো না, সুতরাং কাজটা করতে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি।

ইমতিয়াজকে খুন করার পরই মিনহাজ ঢাকা ত্যাগ করে।

*

"ইমতিয়াজকে খোঁজ করার চিন্তা বাদ দিন," গল্পটা বলার পর মিনহাজ বললো আমাকে। "ভুলে যান তার কথা। সে বেঁচে নেই। বহু আগেই আমি তাকে খুন করে স্ত্রি হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে নিয়েছি।"

গল্পটা শোনার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমি কোন কথা বলতে পারিনি। যেন আমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবশ হয়ে গেছিলো।

যাই হোক, ইমতিয়াজের উধাও হবার রহস্যটা অবশেষে জানতে পারলাম। কেন তার ব্যাপারে কেউ কিছু জানে না–সেটা এখন বোধগম্য। মিলি আর হায়দারভায়ের খুনি বেঘোরে মারা পড়েনি, সবার অলক্ষ্যে তাকে খুন করে লাশ ফেলে দিয়েছে মিনহাজ।

হয়তো ক-দিন পর পানি থেকে ভেসে উঠেছিলো ইমতিয়াজের মৃতদেহ, কিন্তু ততোদিনে তাকে চেনার কোন উপায় ছিলো না। আবার এমনও হতে পারে, খুনির লাশ কখনও ঐ পচা খালের পানিতে ভেসেই ওঠেনি। ময়লা-আবর্জনার ভিড়ে চিরতরের জন্য ঠাই করে নিয়েছে।

আমি টের পেলাম দীর্ঘদিন ধরে বুকের ভেতর চেপে বসা একটি কষ্ট যেন বাষ্প হয়ে উড়ে চলে গেলো! এক ধরণের নিষ্কৃতি। পরিত্রাণ। দুই যুগ ধরে জমে থাকা কৌতুহল আর নানান প্রশ্নের চির অবসান।

"কেমন লেগেছিলো আপনার?" দীর্ঘ সময় চুপ থাকার পর জিজ্ঞেস করলাম আমি।

মিনহাজ আমার দিকে তাকিয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। "অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছিলাম বলতে পারেন।"

মাথা নেড়ে সায় দিলাম। "আপনি কি আশঙ্কা করেছিলেন, ইমতিয়াজের লোকজন আপনাকে সন্দেহ করতে পারে? তারা আপনার পেছনে লাগতে পারে?" একটু থেমে আবার বললাম, "তবে কি সেজন্যেই এখানে চলে এসেছিলেন?"

মুচকি হাসলো মিলির স্বামি। "হয়তো এটাও একটা কারণ ছিলো। তবে সত্যি কথা হলো, ঢাকায় আর থাকতে ইচ্ছে করলো না। অসহ্য লাগছিলো

gronthagaar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

শহরটা, তাই এখানে চলে এলাম।" কাঁধ তুললো সে। "এই তো..." তারপর আমার কাঁধে এক হাত রেখে নরম কণ্ঠে বললো, "এসব ভুলে যান, ভাই। দুই যুগ আগের ঘটনা...আমার মিলি বেঁচে নেই, আপনার হায়দারসাহেব বেঁচে নেই, ইমতিয়াজও বেঁচে নেই। এখন এসব নিয়ে লেখালেখি করে কী লাভ? ইমতিয়াজকে আমি যে শাস্তি দিতে চেয়েছিলাম সেটা দিয়ে দিয়েছি। এই ঘটনা ওই দিনই শেষ হয়ে গেছে। সব চুকেবুকে গেছে।"

তার দিকে চেয়ে রইলাম। আমার মুখ দিয়ে কোন শব্দ বের হলো না। পুরোপুরি নির্ভার আমি।

"আপনি না থাকলে মিলির খুনি কে সেটা হয়তো কোনদিন জানা সম্ভব হতো না, তাই আপনার কাছে আমি আজীবন ঋণী। সেজন্যেই ইমতিয়াজের পরিণতির কথাটা আপনাকে বললাম, নইলে এ কথা আমি কখনও কাউকে বলবো না বলে প্রতীজ্ঞা করেছিলাম। বলার কথাও নয়। এখন আপনি সবটা জানতে পারলেন, আশা করি বুঝতে পেরেছেন।"

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম। এরকম নির্ভার মুহূর্তেও ছোট্ট একটা দুঃখবোধ পিছু নিলো আমার। মিলির গল্পটা প্রকাশ করা ঠিক হবে না।

"আমাকে সত্যিটা বলার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, মিনহাজসাহেব," হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম আমি।

"মনে করুন, আপনার কাছে আমার যে ঋণ ছিলো সেটা শোধ করে দিলাম এই সত্যিটা জানিয়ে," প্রসন্নভাবে হেসে আমার হাতটা ধরে আন্তরিকভাবে বললো সে।

"ভালো থাকবেন, শরীরের প্রতি যত্ন নেবেন।"

"আপনিও ভালো থাকবেন।"

আমি মিনহাজের খামার বাড়ি থেকে বের হলাম অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা নিয়ে।

gronthagaar.blogspot.com

অধ্যায় ৩৮

খুনির সন্ধান

টিকেট কেটে বাসের জন্য অপেক্ষা করছি আর ভাবছি শেক্সপিয়ার ঠিকই বলেছেন, বাস্তব কল্পনার চেয়েও বেশি রোমাঞ্চকর!

মনের কোণে একটা আক্ষেপেরও উদয় হলো। ইমতিয়াজের মতো এক অমানুষকে যে শাস্তি দিয়েছে মিনহাজ সেটা দেবার কথা ছিলো আমার। সে কেবল মিলিরই নয়, হায়দারভাইয়েরও খুনি। আমি কি এরকম উদ্যোগ নিতে পারতাম না? মিনহাজের মতো? খুঁজে খুঁজে ইমতিয়াজকে বের করে ওকে ওর প্রাপ্য শাস্তি দিয়ে হায়দারভায়ের খুনের প্রতিশোধ নিতে পারতাম না?

কিন্তু আমি ভালো করেই জানি এরকম কাজ কখনওই আমার পক্ষে করা সম্ভব হতো না। চিরটাকালই আমি ভীতু আর কাপুরুষ একজন। আমার পক্ষে যুদ্ধে যাওয়া সম্ভব হয়নি। হায়দারভায়ের হত্যার বদলাও নিতে পারিনি। কিছুই করতে পারিনি। আমি কেবল পালাতে পারি, নিভৃতে বসে বসে গল্প লিখতে পারি। এর বেশি কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

ব্যাগের ভেতর থেকে পাণ্ডুলিপিটা বের করে আশেপাশে কোন ডোবা-নালায় ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করলো। কিন্তু ওই পর্যন্তই, এটা করতেও ব্যর্থ হলাম আমি। ব্যাগটা বুকে আগলে ধরে উদাস হয়ে চেয়ে রইলাম মহাসড়কের দিকে। এই আক্ষেপ না করে পারলাম না, যে গল্পটা আমি জানলাম, যে গল্পটা আমার জীবন আমূল পাল্টে দিয়েছিলো সেটার পরিসমাপ্তি যতো রোমাঞ্চকরই হোক না কেন, হয়তো প্রকাশ করতে পারবো না। অন্তত মিনহাজ বেঁচে থাকতে তো নয়-ই।

বাসটা আসতে বেশ দেরি করলো। অপেক্ষায় থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে গেলাম আমি। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যার দিকে হামাগুঁড়ি দিচ্ছে দিনের আলো। ক্ষিদেয় পেট আর্তনাদ করতে শুরু করে দিলেও উঠে গিয়ে আশেপাশের কোন খাবারের দোকান থেকে যে কিছু কিনে খাবো সে ইচ্ছেও করলো না।

এ সময় হঠাৎ করেই কিছু দৃশ্য আর স্মৃতি আমার মাথায় ভর করলো। এটা আমি গুছিয়ে বলতে পারবো না। দৃশ্যগুলো বর্ণনা দেয়াও সম্ভব নয়। কেমন এলোমেলো আর দ্রুত। কিন্তু স্পষ্ট একটা ইঙ্গিত আছে তাতে।

gronthagaar.blogspot.com

মিনহাজ নিজের হাতে ইমতিয়াজকে গুলি করে হত্যা করেছে–এটা মেনে নিতে কষ্ট হলো আমার। কেন এমনটা মনে হলো সেটা নিশ্চিত করে বলতে পারবো না, তবে মনের ভেতর একটা খচখচানির জন্ম হলো আচমকাই। অতীত আর বর্তমানের কতোগুলো দৃশ্য, কথা, ঘটনা আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললো। আপাতত বিচ্ছিন্ন এসব দৃশ্য, ঘটনা আর কথাগুলো জোড়া লাগতে লাগতে একটা আকার তৈরি করে ফেললো।

কিছু একটা ভুল হয়ে গেছে!

মিনহাজ যা বলেছে তাতে কিছু অসঙ্গতি আছে!

পুরোটা সত্যি বলেনি!

আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম এক ধরণের তাড়নায়। ঢাকায় যাবার নির্দিষ্ট বাসটা চলে এলো এ সময়। কিন্তু আমি সেটাতে না উঠে একটা রিক্সা ডাকলাম।

*

মিনহাজের খামারবাড়ি থেকে একটু দূরেই রিক্সাটা ছেড়ে দিলাম আমি। সন্ধ্যা নেমে পড়েছে। চারপাশ অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। বাড়ির সামনের গেট দিয়ে না ঢুকে আমি অনেকটা পথ হেটে পেছন দিকে চলে এলাম। জায়গাটা ডোবা-নালা আর ঝোপঝাঁড়ে পরিপূর্ণ। কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে বাড়ির সীমানা দেয়া থাকলেও সেটা অনায়াসে টপকে যেতে পারলাম, কারণ বেশ কিছু জায়গায় কাঁটাতার ঝুলে নীচু হয়ে গেছিলো।

খুবই সতর্ক পদক্ষেপে, একটু নীচু হয়ে আমি ঢুকে পড়লাম মিনহাজের বাড়ির পেছনে থাকা গোয়াল-ঘরের পাশ দিয়ে। বড় বড় গাছ আর ঝোঁপের কারণে লুকিয়ে প্রবেশ করাটা সহজ হলো আমার জন্য। দূর থেকে মিনহাজের একতলা বাড়িটার দিকে তাকালাম। একটা ঘর আর বারান্দায় বাতি জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। জানালা দিয়ে ভেতরে মিনহাজকে দেখতে পেলাম না অবশ্য।

অপেক্ষা করার জন্য একটা বড় গাছের নীচে ঘাপটি মেরে বসে পড়লাম। আমার মাথার মধ্যে দৃশ্য আর স্মৃতি প্রবল বেগে এসে আছড়ে পড়ছে। অসঙ্গতিটা খুব যে বড় তা নয়, কিন্তু আমার মন বলছে, এখানে এসে ভুল করিনি। সত্যটা আমাকে জানতে হবে। পুরো সত্যটা। মিনহাজের বলা অর্ধ-সত্য নয়!

আমি জানি না কতোক্ষণ এভাবে গাছের নীচে বসে ছিলাম, তবে চারপাশ

gronthagaar.blogspot.com

গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে যাবার পর এক সময় দেখতে পেলাম মিনহাজ বাড়ির ভেতর থেকে বের হয়ে আসছে। সতর্ক হয়ে উঠলাম আমি, যদিও জানি অমন অন্ধকারে এত দূর থেকে আমাকে সে দেখতে পাবে না।

মিনহাজ গোয়াল ঘরের দিকে না এসে তার ডানপাশে একটি ঘন ঝোঁপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তার হাতে খাবারের ট্রে! তবে তাতে খাবার নাকি অন্য কিছু আছে সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারলাম না।

চামড়ার ব্যাগটা রেখে গাছের নীচ থেকে উঠে পা টিপে টিপে চলে গেলাম সেই ঝোঁপের কাছে। ঘন ঝোঁপের মাঝখান দিয়ে সরু একটা গলির মতো চলে গেছে, অন্ধকারের জন্য দেখতে বেশ বেগ পেতে হলো। ঝোঁপের ভেতর দিয়ে ঢুকে পড়তেই দেখতে পেলাম আরেকটা ঘর আছে সেখানে। সম্ভবত গুদামঘর, কিংবা এরকম কিছু।

সেই ঘরের কাঠের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একহাতে ট্রে-টা ধরে অন্য হাত পকেটে ঢুকিয়ে চাবি খুঁজছে মিনহাজ। আমি থমকে দাঁড়ালাম। আস্তে করে কয়েক পা পিছিয়ে গেলাম, পাছে টের পেয়ে যায় সে। তালা খুলে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো মিলি স্বামি। ভয় পাচ্ছিলাম, ভেতরে ঢুকে হয়তো দরজাটা আবার লাগিয়ে দেবে, কিন্তু সেটা না করেই ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়লো মিনহাজ।

একটু অপেক্ষা করে আমিও ঢুকে পড়লাম সেই ঘরে। ঘুট ঘুটে অন্ধকার। চোখে কিছুই দেখতে না পেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কয়েক মুহূর্ত। মিনহাজের কোন চিহ্ন নেই সেখানে!

অন্ধকারে চোখ সয়ে আসার পর দেখতে পেলাম ঘরের ডানদিকে, এককোণে একটা দরজা। আধ-ভেজানো। ভেতর থেকে মৃদু আলো আসছে!

দরজাটার দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। নিজের হৃদস্পন্দন শুনতে পাচ্ছিলাম এ সময়। আস্তে করে দরজা খুলে যা দেখতে পেলাম সেটা অভাবনীয়।

দরজাটা পাশের কোন ঘরে যাবার জন্য নয়! ওটার ওপর পাশে মাটির নীচে একটা সিঁড়ি চলে গেছে

একটি ভূ-গর্ভস্থ কক্ষ!

সেই ঘরটায় মৃদু লালচে আলোর একটি বাল্ব জ্বলছে। সেই আলো এসে পড়েছে সিঁড়ির উপরে, আলমিরার দরজা পর্যন্ত।

বুক ভরে দম নিয়ে সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রাখলাম আমি। আস্তে আস্তে নীচে নামতে শুরু করলাম। নীচের ঘর থেকে একটা শব্দ ভেসে এলো। সম্ভবত খাবারের ট্রে-টা মেঝেতে রাখার শব্দ।

gronthagaar.blogspot.com

মাটির নীচে ঘরটার আয়তন হবে বড়জোর পনেরো বাই পনেরো ফুটের মতো। বেশ নীচু ছাদ। আমার ধারণা, উচ্চতা আট ফুটের বেশি হবে না। অন্ধকার আর স্যাঁতসেঁতে একটি জায়গা। তীব্র বোটকা গন্ধ সেখানে। বামদিকের দেয়ালে একটা লালচে বাতি জ্বলছে। সেই আলোতে দেখতে পেলাম ঘরের এককোণে একটা খাঁচা! সেই খাঁচার ভেতরে শেকলে বাধা একটি পশু জবুথবু হয়ে বসে আছে!

মিনহাজ চেয়ে আছে সেই খাঁচা থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে থেকে। খাবারের ট্রে-টা খাঁচার সামনে রাখা, পশুটার নাগালের মধ্যে।

চোখ কুচকে ভালো করে তাকালাম আমি। পশুটা মুখ তুলে তাকালো মিনহাজের দিকে!

আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো।

পশু নয়! এক আদম সন্তান! ময়লা গেঞ্জি, ছেঁড়া প্যান্ট আর খালি পা। মাথার চুলগুলো আগাছার মতো বেড়ে কাঁধ পর্যন্ত আছড়ে পড়েছে। মুখের সাদা দাড়ি-গোঁফও সেই মতো বাড়ন্ত। অনেকটা বন-মানুষের মতো দেখাচ্ছে তাকে!

মানুষটা টের পেয়ে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আমার দিকে তাকালো। তার দু-চোখে বিস্ময়, অবিশ্বাস।

আমাদের মধ্যে চোখেচোখি হলো। মিনহাজও চমকে দেখতে পেলো আমাকে। অবিশ্বাস্য চোখে তাকিয়ে রইলো সে। কিন্তু আমার সমস্ত মনোযোগ বন্দির দিকে।

কয়েক মুহূর্ত, তারপরই বুঝতে পারলাম, বন্দি মানুষটাকে আমি চিনি।

ইমতিয়াজ!

Gronthagaar.blogspot.com

অধ্যায় ৩৯

যাবজ্জীবন

বাসস্টেশনে বসে বসে যখন নানান কথা ভাবছিলাম তখন কিছু স্মৃতি, কিছু ঘটনা, দৃশ্য এলোমেলোভাবে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে শুরু করে। আমি জানি না কেন, কিসের জন্য–কিন্তু এটা এমনভাবে ঘটতে শুরু করে যা আমাকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছিলো।

মিনহাজ খুন করেছে ইমতিয়াজকে। তার প্রাপ্য শাস্তি দিয়েছে। কি সেই শাস্তি? মৃত্যুদণ্ড? কিন্তু দুই যুগ আগে মিনহাজ কি চেয়েছিলো? সে চেয়েছিলো ইমতিয়াজের যেন ফাঁসি না হয়। সে যেন সারাটা জীবন জেলে পচে মরে।

ফাঁসি দিলে তো ঐ শূয়োরেরবাচ্চাটা কোন কিছুই টের পাবে না! দড়িতে ঝুলতেই সব শেষ হয়ে যাবে! আমি চাই শূয়োরেরবাচ্চাটা জেলে পচে মরুক। আস্তে আস্তে...ধীরে ধীরে! সারাটা জীবন জেলে কাটাক। জীবনে যেন জেলের বাইরে পা রাখতে না পারে। মরে যাবার পর ওর লাশ জেলে বাইরে নেয়া হবে, তার আগে নয়!

মিনহাজের কথাগুলো আমার কানে বাজতে শুরু করে। কথাগুলো বলার সময় তার অভিব্যক্তি আর দৃঢ়তা আমার স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল।

তারপর মনে পড়ে যায়, একটু আগে খামারবাড়িতে মিনহাজের সাথে দেখা করার সময় কিছু মুহূর্ত, কিছু দৃশ্যের কথা।

খাবারের ট্রে হাতে বাড়ির পেছন থেকে আসছিলো সে। অথচ তার বাড়িতে আর কেউ থাকে না। সে একদম একা থাকে বিশাল ঐ বাড়িতে। আর খাবারগুলো গো-বাছুরদের জন্য ছিলো না, ওগুলো মানুষের খাবার ছিলো!

ঘরে ঢোকার পর মিনহাজ সবার আগে একটা বিশাল খোলা জানালার পর্দা টেনে দিয়েছিলো। পর্দা টেনে দেবার আগে আমি দেখেছি, ঐ জানালা দিয়ে বাড়ির পেছন দিকটা দেখা যায়।

তারপর মিনহাজের ঘরে বুকশেল্‌ফে থাকা বইগুলো। স্বাভাবিকভাবেই আমার নজর গিয়ে পড়েছিলো সেখানে।

থরে থরে সাজানো মেডিকেলের বই।

gronthagaar.blogspot.com

হোমিওপ্যাথির নয়।

ভেটেনারিও নয়।

এমন কি গবাদিপশুর রোগ-বালাই নিয়ে লেখা ছিলো না ওগুলো।

সাধারণ মেডিকেলের বই।

কিন্তু এই অসঙ্গতিটা বোঝার আগেই আমার মনোযোগ সেই বইগুলো থেকে সরিয়ে দিয়েছিলো মিলি! তার একটা পুরনো ছবির ফ্রেম রাখা ছিলো সেখানে। এই ছবিটা দুই যুগ আগে মিনহাজের ঘরে দেখেছিলাম আমি। সম্ভবত বিয়ের পর তোলা মিলির একটি সিঙ্গেল ছবি। সেই মায়াভরা চোখ। সেই নিষ্পাপ চাহনি। খুন হবার পরও তার চোখজুড়ে ছিলো সুগভীর মায়া। সেই চোখ আমি কোনদিন ভুলতে পারিনি।

বাসস্টেশনে বসে বসে এইসব যখন ভাবছিলাম তখন আমার মন আরো কিছু যুক্তি খুঁজতে শুরু করে।

ইমতিয়াজকে খুন করার পর মিনহাজ কেন ঢাকা ছাড়বে? যে ঢাকায় তার প্রিয়তমা স্ত্রির কবর! মিনহাজ প্রায় প্রতিদিন অফিস থেকে ফেরার পথে মিলির কবরে যেতো। তাহলে ইমতিয়াজকে হত্যার পর কেন সে এমন একটা শহর ছাড়লো? যে মাটিতে মিলি শুয়ে আছে সেই মাটি থেকে কেন দূরে সরে গেলো? বেছে নিলো নিভৃত জীবন?

আমাকে নিজের বাড়িতে দেখে মিনহাজ মোটেও খুশি হতে পারেনি। এটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। অথচ মিলির কেসের জন্য সে আমার কাছে ঋণী।

আমি একটা ঘোরের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। আমার মন বলছিলো, কিছু একটা অসঙ্গতি আছে। আমার যুক্তিবাদি অংশটাও সায় দিয়েছিলো এর সাথে। মিনহাজ যা বলেছে, যা করেছে–তার মধ্যে রয়েছে অসঙ্গতি। অসামঞ্জস্য।

আর এখন, অভাবনীয় এক সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি আমি।

বিগত দুই যুগ ধরে মিনহাজের নিজস্ব জেলখানায় বন্দি হয়ে আছে মিলি আর হায়দারভায়ের খুনি ইমতিয়াজ!

"আ-আপনি?!" অবশেষে মুখ খুললো বন্দি ইমতিয়াজ। তার কণ্ঠটা কেমন জান্তব শোনালো।

আমি তাকালাম মিনহাজের দিকে। নির্বিকার দাঁড়িয়ে আছে সে। মনে হচ্ছে না ধরা পড়ে যাওয়ায় খুব একটা উদ্বিগ্ন। তার মুখ অস্বাভাবিক রকমেরই নির্বিকার।

"আমি মিলির কবর ছুঁয়ে শপথ করেছিলাম, ওকে সারাজীবন জেলে পচিয়ে মারবো," আস্তে করে বললো মিনহাজ, "আমি আমার কথা রেখেছি।"

gronthagaar.blogspot.com

আলতো করে মাথা নেড়ে সায় দিলাম কি দিলাম না বলতে পারবো না। ফিরে তাকালাম দুই যুগ ধরে বন্দি থাকা খুনির দিকে।

"আ-আমাকে..." আর কিছু বলতে পারলো না সে, নিজে থেকেই থেমে গেলো। হয়তো বুঝতে পেরেছে আমার কাছে আবেদন জানানো, কিংবা অনুগ্রহ পাবার আশা সে করতে পারে না।

গভীর করে দম নিয়ে একটু সামনে এগিয়ে গেলাম। "তুমি হায়দারভাইকে খুন করেছো!" এটা প্রশ্ন ছিলো না মোটেও। আমি ভালো করেই জানতাম কাজটা ও-ই করেছে।

অপরাধির মতো মাথা নীচু করে রাখলো ইমতিয়াজ। যেন অনুতপ্ত সে। তারপর চোখ বন্ধ করে আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে সায় দিলো। সম্ভবত কাঁদতে চাইলো কিন্তু তার দু-চোখ সাড়া দিলো না। দুই যুগ ধরে মাটির নীচে বন্দি থাকার সময় হাজারবার অশ্রুপাত করে হয়তো সমস্ত অশ্রু নিঃশেষ করে ফেলেছে। এখন চাইলেও চোখ ভেজাতে পারে না।

ইমতিয়াজ বললো, "আমি জানি আপনি আমাকে উদ্ধার করার জন্য আসেননি..." তারপর তার সমস্ত শরীর কোন এক অজ্ঞাত আবেগে কাঁপতে শুরু করলো। "আ-আমি কিছু চাই না...আ-আমি শুধু চাই..." ফুপিয়ে উঠলো সে, "ওকে বলেন আমাকে যেন মেরে ফেলে! অনেক তো হয়েছে...আমি আমার শাস্তি পেয়ে গেছি। এবার একটু দয়া করেন। আমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কতো চেষ্টাই না সে করে! দয়া করে এবার আমাকে মুক্তি দিতে বলেন।" দু-হাত জোর তরে শুকনো কান্নায় ভেঙে পড়লো মিলি আর হায়দারভায়ের খুনি।

আমি মিনহাজের দিতে তাকালাম। সে দূর্বল শরীরেও দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি এক পা দু-পা করে পিছু হটে গেলাম। মিনহাজের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম সেই চোখে কোন উদ্বেগ নেই। তার ঠোঁটে মৃদু বাঁকাহাসি।

মাটির নীচে তার নিজস্ব জেলখানা থেকে বের হয়ে আসার সময় সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য তার সাথে দৃষ্টি বিনিময় হলো। মনে হলো আমারা আমাদের দু-জনের চোখ দিয়ে কিছু বললাম। আর সেটা নির্ভুলভাবে পড়তেও পারলাম।

Gronthagar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

অধ্যায় ৪০

ঢাকায় ফিরে এসে আমি কয়েকটা দিন কিছুই করতে পারিনি। তবে দুই যুগ ধরে আমার বুকের ভেতর চেপে বসে থাকা পাথরটির অনুপস্থিতি বেশ ভালোমতোই টের পাচ্ছিলাম।

হায়দারভায়ের লাশ দাফন করার পর এই দীর্ঘ দুই যুগে আমি তার কবর দেখতে যাইনি। এবার গেলাম এক গোছা ফুল নিয়ে। কিছুক্ষণ তার কবরের সামনে বসে থাকার সময় অসংখ্য স্মৃতি হুরোহুরি করে এসে আমাকে আবেগতাড়িত করে ফেললো।

আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম মিনহাজের খামারবাড়িতে গিয়ে কি দেখেছি সেটা কাউকে বলবো না। কিন্তু আমার অটল সিদ্ধান্তে ফাঁটল ধরালো রামজিয়া। তাকে কি বলবো? বলা উচিত হবে?

সে-ও তো এই ঘটনার একটি অংশ। মিলির বান্ধবি। আমার মতো তার মনের গহীনেও নিশ্চয় দুই যুগ ধরে একটি কৌতুহল জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে আছে। যে অভাবনীয় ঘটনা আমি জানতে পেরেছি সেটা শোনার অধিকার সে রাখে।

Gronthagaar.blogspot.com

আমার যুক্তি বললো কথাটা না বলার জন্য। কিন্তু আবেগ তাতে সায় দিলো না। যুক্তি আর আবেগের চিরন্তন লড়াই শুরু হয়ে গেলো নিজের ভেতরে। কিন্তু নরম মনের মানুষ আমি, এবং অবশ্যই ভীরু। দৃঢ় বলা যাবে না কোনমতেই। অবশেষে যুক্তি পরাস্ত হলো আবেগের কাছে।

মিনহাজের ওখান থেকে ফিরে আসার তিনদিন পর রামজিয়ার সাথে দেখা করলাম। তাকে কঠিন প্রতীজ্ঞায় আবদ্ধ করে সত্যটা জানালাম অবশেষে। সব শুনে হতভম্ব হয়ে রইলো সে।

"আনবিলেভ্‌ল!" অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলো রামজিয়া। "আমার এখনও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।"

"হুম।" শুধু এটাই বললাম।

"তাহলে এখন কি করবে?"

আমি চেয়ে রইলাম তার দিকে। প্রশ্নটা বুঝতে আমার একটুও কষ্ট হয়নি।

"লেখাটা কি শেষ করবে?"

gronthagaar.blogspot.com

কাঁধ তুললাম। আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না তখন। "জানি না।"

"ইউ শুড ডু ইট।" দৃঢ়ভাবে বললো সে। "এমন একটা গল্প শুধু তোমার-আমার মধ্যে রাখাটা ঠিক হবে না। তোমার আনফিনিশড লেখাটা আমি পড়েছি, ওটার কোন এন্ডিং নেই। এখন তো সেটা পেয়ে গেছো, তাহলে কেন লিখবে না?"

সায় দিলাম তার কথার সাথে। "হুম। হয়তো লেখাটা শেষ করবো আমি কিন্তু..."

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো সে।

"...বইটা প্রকাশ করবো না এখন।"

"আই ডোন্ট গেট ইট?"

"মিনহাজের দিকটাও তো দেখতে হবে।"

"তাহলে তুমি লিখছো কিন্তু পাবলিশ করছো না?"

"হুম।"

তারপর তাকে জানালাম আমার পরিকল্পনার কথা।

সবটা শুনে সে বললো, "আমার মনে হয় তোমাকে একটা জিনিস বদলাতে হবে।"

"কি?"

"নামটা।"

"ওহ্, এটা আমি এরইমধ্যে বদলে ফেলেছি।"

"তাই নাকি?" তার চোখেমুখে বিস্ময়।

"মিনহাজ আর ইমতিয়াজের ঘটনাটা জানার আগে ওরকম শিরোনাম দিয়েছিলাম, এখন আর সেটা প্রসঙ্গিক নয়। লেখার মূল টোনটাই বদলে গেছে। বলতে পারো, একদম উল্টে গেছে।"

মুচকি হাসলো সে। "আই কুডেন্ট মোর এগ্রি উইথ ইউ।" তারপর আমার দিকে একটু ঝুঁকে জানতে চাইলো, "তাহলে টাইটেলটা কি দিলে?"

তার চোখে চোখ রাখলাম আমি। দুই যুগ আগে হলে এক ধরণের অস্বস্তি জেঁকে ধরতো আমাকে।

আস্তে করে বললাম, "কেউ কেউ কথা রাখে।"

gronthagaar.blogspot.com

অবশেষে

কেউ কেউ কথা রাখে

বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের চেয়ে বিরক্তিকর আর অপছন্দের কিছু হয় না–অন্তত আমার নিজের কাছে। এটা করতে আমি রীতিমতো ঘেন্না করি। শুরুর দিকে প্রকাশক আমাকে কখনও এ নিয়ে তাগাদাও দিতো না। সেটা একদিক থেকে ভালোই ছিলো। কিন্তু একটু আধটু জনপ্রিয়তা পাবার পর, লেখক হিসেবে একটা পরিচিতি গড়ে ওঠার পর এ নিয়ে প্রকাশকের চাপ বাড়তে থাকলো। মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের আর্থিক এবং প্রচারণার গুরুত্ব বোঝাতে আরম্ভ করলো সে। সারা দুনিয়ায় এই রীতি আছে। সব লেখকই তাদের বইয়ের প্রচারণার জন্য এটা করে থাকে। এখানে পছন্দ-অপছন্দ বলে কিছু নেই। এটা একটা বিজনেস স্ট্র্যাটেজি। পাবলিসিটি করার সর্বোত্তম পন্থা।

আপনার যে একটা বই বের হলো সেটা সবাইকে জানাতে হবে না?

প্রকাশকের এমন যুক্তির কাছে একটা সময় হার মানতেই হয়েছিলো। কিন্তু সত্যি বলতে, এরকম অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে কখনওই স্বস্তি বোধ করিনি। অনুষ্ঠানে তোলা আমার ছবিগুলোই সেটার সাক্ষ্য দেবে।

Gronthagaar.blogspot.com

তবে বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলাম *কেউ কেউ কথা রাখের* মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের সময় আমার মধ্যে আগের সেই অস্বস্তিটা আর ফিরে এলো না। সেটার কারণ কি আমি জানি না। সম্ভবত আমার পাশে তখন রামজিয়া শেহরিন ছিলো কিংবা গল্পটা প্রকাশের জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা।

মিনহাজের ওখান থেকে ফিরে আসার পর রামজিয়াকে যখন সব জানালাম তখন সে আমাকে বইটা শেষ করার তাগিদ দিয়েছিলো। আমি সেটা খুব দ্রুতই করেছিলাম কারণ অসমাপ্ত বইটার শুধু সমাপ্তি জুড়ে দিতে হয়েছিলো আমাকে। বাকি সব আগের মতোই রেখে দিয়েছিলাম। ওগুলো পরিবর্তন করার কোন দরকারই পড়েনি।

তবে লেখা শেষ করলেও আমি পাণ্ডুলিপিটা প্রকাশককে দেইনি। এ নিয়ে প্রকাশক–যে কি না আমার বন্ধুও বটে–বেশ তাড়া দিচ্ছিলো। তাকে মিথ্যে বলা কিংবা এড়িয়ে যাওয়াটা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এক পর্যায়ে তাকে পুরো

gronthagaar.blogspot.com

ঘটনাটা বলি। অবশ্য বলার আগে রামজিয়ার মতো তাকেও কঠিন প্রতীজ্ঞা করিয়েছিলাম।

সবটা শুনে আমার সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছিলো সে। তাকে অবশ্য বলেছিলাম, মিনহাজের মৃত্যুর পর বইটা যেন প্রকাশ করা হয়। এর আগে নয় কোনভাবেই। এমনকি তার আগে আমার মৃত্যু হলেও না।

"আর যদি আমি নিজেই মরে যাই তোমাদের আগে?" আমার প্রকাশক-বন্ধু বলেছিলো।

মুচকি হেসে কাঁধ তুলে বলেছিলাম, "সেক্ষেত্রে তুমি তোমার উইলে এমন ব্যবস্থা করে যে-ও যেন তোমার উত্তরাধিকারিরা সেটা প্রকাশ করে।"

আমার কথা শুনে সে হেসে ফেলেছিলো। "তাহলে পুরোপুরি প্রকৃতির উপরেই নির্ভর করতে হবে আমাদের!"

শেষ পর্যন্ত তা-ই হয়েছে। গত মাসে জানতে পারি, মিনহাজ মারা গেছে। সত্যি করে বললে, সে নিজের জীবন নিজের হাতেই শেষ করে দিয়েছে। কয়েক বছর আগে তার ক্যান্সার ধরা পড়েছিলো, একেবারে শেষ স্টেজে। বাঁচার কোন আশা ছিলো না। সে-ও কোন রকম চেষ্টা করেনি। ওষুধপত্র-কেমো থেরাপির দ্বারস্থ হয়নি। নিরবে, নিভৃতেই শেষ বিদায় নিয়েছে।

আত্মহত্যা করার পরদিন তার লাশ আবিষ্কার করে খামারের এক কর্মচারি। কী একটা দরকারে বাড়িতে গিয়েও ওকে ডাকাডাকি করে না পেয়ে ঘরের দরজা খুলে আবিষ্কার করে মিনহাজের নিথর দেহটা। পাশেই পড়েছিলো একটি সিরিঞ্জ আর অজ্ঞাত ওষুধের খালি শিশি। সেই সাথে একটা চিরকুট।

পুলিশ এসে তার লাশ নিয়ে যায়। পরে সৎকার করা হয় খামারবাড়ির পেছনে। কিন্তু মাটির নিচে থাকা ঐ বন্দিশালার খোঁজ কেউ পায়নি। হয়তো সময় গড়ালে সেটার খোঁজ কেউ না কেউ ঠিকই পেতো কিন্তু এখানেও প্রকৃতি হস্তক্ষেপ করেছে।

মিনহাজ মারা যাবার পরের সপ্তাহেই প্রবল বন্যা হয়। ডুবে যায় খামারবাড়ি আর তার আশেপাশের সব গ্রাম। আট-নয়দিনের বন্যায় ডুবেছিলো পুরো এলাকাটি।

আমার বুঝতে কষ্ট হয়নি ইমতিয়াজের কি পরিণতি হয়েছিলো। ক-দিন না খেয়ে কষ্ট পেয়ে অবশেষে পানিতে ডুবে তার সমাধি হয়ে গেছে।

এসব খবর আমি জেনেছি মিনহাজের কারণেই!

আত্মহত্যা করার আগে সে আমার জন্য একটা চিরকুট রেখে গেছিলো। পুলিশ যেন আমাকে হয়রানি না করে সে-কথাও বলে গেছিলো চিরকুটে।

Gronthagar.blogspot.com

gronthagaar.blogspot.com

অনুরোধ করে গেছিলো, তার মৃত্যুর খবরটা যেন আমাকে জানানো হয়। কারণ আরো একবার সে আমার কাছে ঋণী!

বুঝতে পারলাম, এই ঋণ হচ্ছে আমার নীরবতা!

মিনহাজের লাশ আবিষ্কার হবার দু-দিন পরই ওখানকার পুলিশ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে ঘটনাটা জানায়। সব শুনে আমি ভীষণ দোটানায় পড়ে গেছিলাম। মিনহাজের খামার বাড়িতে যে ইমতিয়াজ বন্দি হয়ে আছে সে-কথা কি পুলিশকে বলবো?

সারা রাত ভেবে অবশেষে মিনহাজের সিদ্ধান্ত আর স্মৃতিকে সম্মান জানিয়ে নিশ্চুপ থাকার পথটাই বেছে নেই। বুঝতে পারি, দীর্ঘ দিন ধরে পড়ে থাকা পাণ্ডুলিপিটা প্রকাশ করতে আর কোন বাধা নেই।

প্রকাশনা অনুষ্ঠানের শেষদিকে আমি যখন রামজিয়াকে নিয়ে বের হবার জন্য পা বাড়াচ্ছি তখনই অবাক হয়ে দেখতে পেলাম আমার দিকে এগিয়ে আসছে এসএম হায়দার!

তার হাতে আমার সদ্য প্রকাশিত বইটা।

মূর্তির মতো জমে গেলাম আমি। কয়েক মুহূর্তের জন্য বাকরুদ্ধ হয়ে পড়লাম।

হায়দারভাই আমার সদ্য প্রকাশিত বইটা মেলে দিয়ে বলে উঠলো "অটোগ্রাফ, প্লিজ!"

তার পেছনে দেখতে পেলাম নীলুভাবি দাঁড়িয়ে আছে। "আমাদের ছেলে।"

দেখতে একেবারে বাবার মতোই হয়েছে সে। আমি জানতাম, হায়দারভায়ের ছেলে উচ্চশিক্ষার জন্য দেশের বাইরে ছিলো। সে যে দেশে ফিরে এসেছে সেটা আমার জানা ছিলো না। তারা এ অনুষ্ঠানের খবর কিভাবে জানলো সেই প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছিলাম একটু দূর থেকে আমার প্রকাশক-বন্ধুর থাম্ব-আপ আর চওড়া হাসি দেখে।

প্রসন্নভাবে হেসে জীবনের সবচেয়ে সার্থক অটোগ্রাফটা দেবার জন্য বইটির উৎসর্গ পৃষ্ঠাটি বেছে নিলাম। সাধারণত এই পৃষ্ঠায় অটোগ্রাফ দেই না আমি।

gronthagaar.blogspot.com

উৎসর্গ :

এসএম হায়দারকে...

সত্যিকারের একজন যোদ্ধা। একজন সংশপ্তক।
আমৃত্যু যুদ্ধ করে গেছেন।

এবং

প্রয়াত মিনহাজ আহমেদকে...

সে তার কথা রেখেছিলো!

gronthagaar.blogspot.com

মোহাম্মদন নাজিম উদ্দিন-এর মৌলিক থ্রিলার

নেমেসিস : পৃ: ২৭২, মূল্য: ২৪০৳

দেশের জনপ্রিয় লেখক পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থায় মারা গেলেন নিজের অ্যাপার্টমেন্টে। হোমিসাইড ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ বিস্ময়কর দ্রুততায় ধরে ফেললো সম্ভাব্য খুনিকে। সন্দেহের তীর গিয়ে পড়লো লেখকের যুবতী স্ত্রীর ওপর। ওদিকে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে লেখকের আত্মজীবনী মেইল হয়ে গেলো অন্য একজনের কাছে। বেরিয়ে এলো নানান কাহিনী...তারপর ঘটনা মোড় নিতে থাকে ভিন্ন দিকে। শেষপর্যন্ত জেফরি বেগ যা জানতে পারলো তা একেবারেই অপ্রত্যাশিত আর অচিন্তনীয়। মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন-এর আলোচিত এই উপন্যাসটি পাঠক মহলে দারুণ সাড়া ফেলে দিয়েছে।

কন্ট্রাক্ট : পৃ: ৩৫২, মূল্য: ৩০০৳

পাঁচ লক্ষ টাকা দামের একটি টেলিফোন কল। কোটি টাকার ষড়যন্ত্র। পেশাদার খুনি বাস্টার্ডকে ফিরে আসতে হলো দেশে; একটি লাইফটাইম কন্ট্রাক্ট। আত্মবিশ্বাসী বাস্টার্ড তার মিশনে নেমে পড়তেই সব কিছু জট পাকাতে শুরু করে। বিশাল এক ষড়যন্ত্রের অংশ হয়ে যায় সে। এ দিকে দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয় হোমিসাইড ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ। তাদের দু-জনের লক্ষ্য একেবারেই ভিন্ন। ষড়যন্ত্র আর পাল্টা ষড়যন্ত্র–রাজনীতি আর অন্ধকার জগতের উপাখ্যান। নেমেসিস-এর পর মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিনের আরেকটি রেসিংকার গতির অনবদ্য থ্রিলার। ইতিমধ্যেই পাঠক প্রশংসায় ধন্য এই উপন্যাসটি।

নেক্সাস : পৃ: ৪০০, মূল্য: ৩২০৳

অভিজাত স্কুল সেন্ট অগাস্টিনে খুন হলো এক জুনিয়র ক্লার্ক, তদন্তে নামলো হোমিসাইড ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ। বেরিয়ে এলো ভিন্ন একটি ষড়যন্ত্র। আবারো মুখোমুখি দুই ভুবনের দু-জন মানুষ। ভয়ঙ্কর একটি ষড়যন্ত্রের মুখোমুখি তারা। অবিশ্বাস্যভাবেই ঘটনা মোড় নিতে থাকে ভিন্ন দিকে। জেফরি বেগ-বাস্টার্ডের যে দ্বৈরথ শুরু হয়েছিলো *নেমেসিস*-এ, *কন্ট্রাক্ট*-এ এসে সেটা গতি লাভ করে আর *নেক্সাস*-এ পাঠক খুঁজে পাবেন সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি উপাখ্যান।

কনফেশন : পৃ: ৩২০, মূল্য: ২৫০৳

বদলে গেছে পেশাদার খুনি বাস্টার্ড। সে আর টাকার বিনিময়ে খুন করে না কিন্তু তার নিয়তি তাকে ফিরে যেতে বাধ্য করলো পুরনো পরিচয়ে। আবারো মুখোমুখি হোমিসাইডের ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগের। পেশাদার খুনি জড়িয়ে পড়লো এমন একটি ঘটনায় যেখানে তার নিজের জীবনটাই বিপন্ন হয়ে উঠলো অবশেষে।

নেমেসিস থেকে কন্ট্রাক্ট আর নেক্সাস পর্যন্ত বেগ আর বাস্টার্ডের যে দ্বৈরথ চলে এসেছে তারই ধারাবাহিকতায় কনফেশন।

gronthagaar.blogspot.com

করাচি : পৃ: ৩২০, মূল্য: ২৫০৳
তিনযুগ আগের একটি ঘটনার মীমাংসা করতে হবে বাস্টার্ডকে আর সেজন্যে পাড়ি দিতে হবে বারো শ' মাইল, যেতে যেতে হবে এ বিশ্বের সবচেয়ে অরাজক আর বিপজ্জনক শহর করাচিতে। অপ্রত্যাশিত সব ঘটনার মুখোমুখি হতে হলো তাকে। একটা সময় মনে হলো তার টার্গেটের নাগাল পাওয়াটা শুধু কঠিনই নয় অনিশ্চিতও বটে। আত্মবিশ্বাসী বাস্টার্ড হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। চূড়ান্ত আঘাত হানার সময় বুঝতে পারলো দুনিয়া কাঁপানো একটি ঘটনার মধ্যে ঢুকে পড়েছে অযাচিতভাবে!

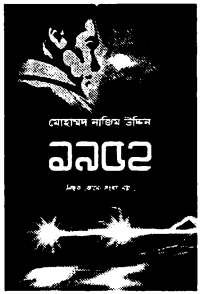

১৯৫২: পৃ:৪১৬, মূল্য: ৩৬০৳
গাড়ি কিনে প্রথমদিন রাস্তায় নেমেই রহস্যজনক দুর্ঘটনার শিকার হলো সাংবাদিক সায়েম মোহাইমেন। নাটকীয়ভাবে মোড় নিলো ঘটনাপ্রবাহ। সমস্ত রহস্যের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠলো ১৯৫২! হত্যা-ষড়যন্ত্র, অপরাজনীতি, সামাজিক অবক্ষয়ের বাস্তবচিত্র বেরিয়ে এলো একে একে। অনেকগুলো ঘটনার জটপাকানো রহস্য আর সেই রহস্যের সমাধান দিতে পারে কেবল ১৯৫২–কারণ এটি নিছক কোনো সংখ্যা নয়!

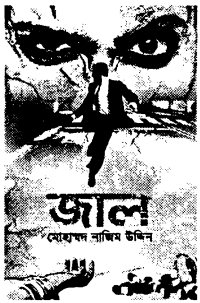

Gronthagaar.blogspot.com

জাল : পৃ: ২৪০, মূল্য: ২৪০৳
এক প্লেবয় ব্যারিস্টার খুনের অভিযোগে গ্রেফতার হলো। তার দাবি খুনটা করেছে মানসিকবিকারগ্রস্ত একজন। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে সাবেক ইনভেস্টিগেটর কেএস খানের দ্বারস্থ হয় সে। অদ্ভুত এই ইনভেস্টিগেটর, তারচেয়েও অদ্ভুত হত্যাকাণ্ডটি। যার ক্যারিয়ারে কোন অমীমাংসিত কেস নেই সে কি পারবে রহস্যের জাল ছিন্ন করতে?
নেমেসিস, কন্ট্রাক্ট, নেক্সাস আর কনফেশন-এর পর মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন সম্পুর্ন ভিন্নধর্মী একটি চরিত্র আর গল্প নিয়ে এসেছেন জাল-এ।

রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও খেতে আসেন নি: পৃ: ২৭২, মূল্য ২৫০৳
মফশ্বল শহর সুন্দরপুর। ছবির মতোই সুন্দর। প্রকৃতির শোভা ছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছু নেই বললেই চলে কিন্তু সবাই জানে *রবীন্দ্র এখানে কখনও খেতে আসেন নি!* কেন আসেন নি তারচেয়েও বড় কথা কেন অনেকেই সেখানে ছুটে আসে! এক আগন্তুক এসে হাজির হলো সেই সুন্দরপুরে। তার গতিবিধি অস্পষ্ট আর রহস্যময়। সে যেটা জানতে চায় সেটা ওখানকার খুব কম লোকেই জানে। আর যখন সেটা জানতে পারলো তখন বেরিয়ে এলো রোমহর্ষক এক কাহিনী! পরিহাসের ব্যাপার, সেই কাহিনী কাউকে বলার সুযোগ সত্যি কঠিন!

gronthagaar.blogspot.com

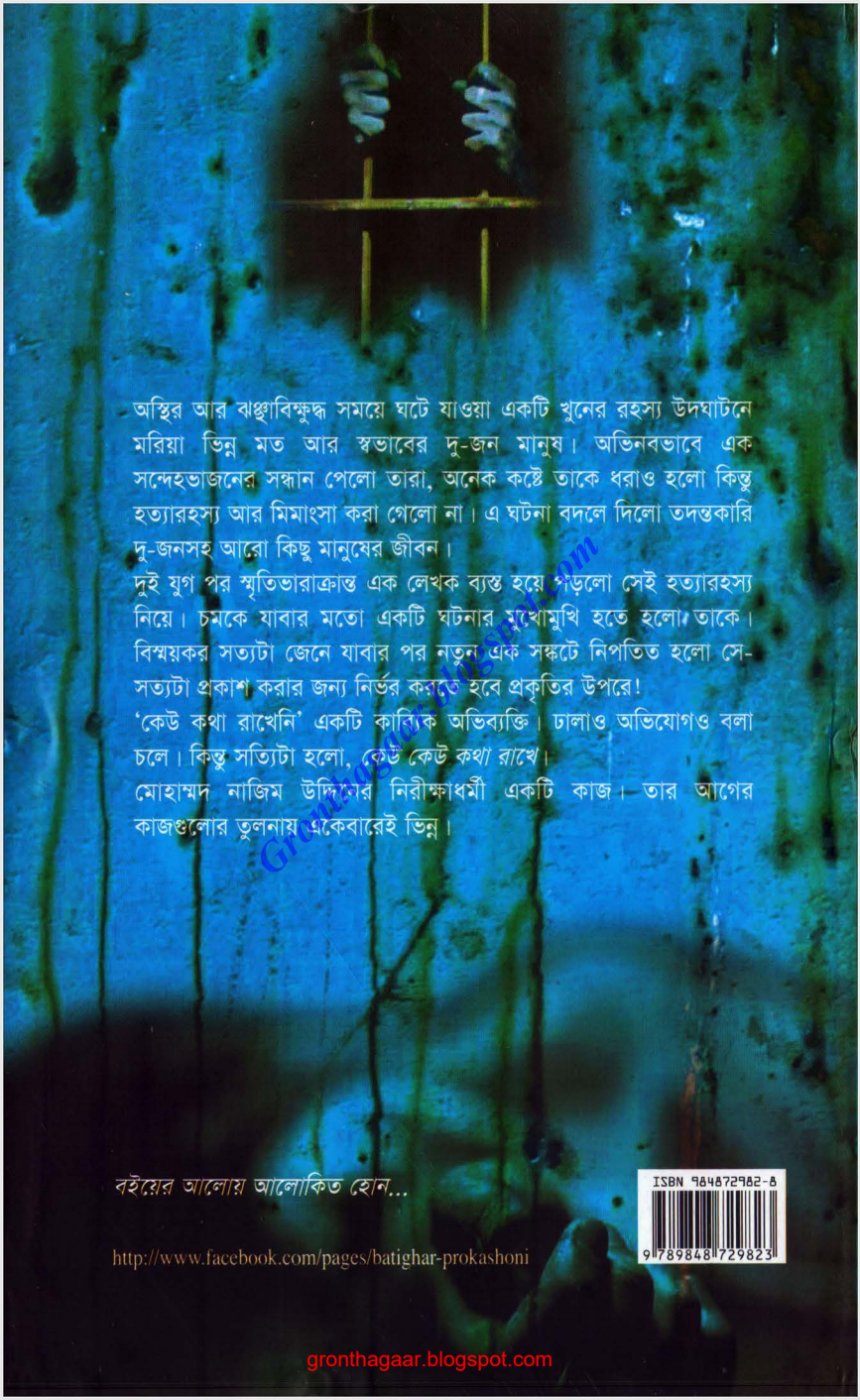

অস্থির আর ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়ে ঘটে যাওয়া একটি খুনের রহস্য উদঘাটনে মরিয়া ভিন্ন মত আর স্বভাবের দু-জন মানুষ। অভিনবভাবে এক সন্দেহভাজনের সন্ধান পেলো তারা, অনেক কষ্টে তাকে ধরাও হলো কিন্তু হত্যারহস্য আর মিমাংসা করা গেলো না। এ ঘটনা বদলে দিলো তদন্তকারি দু-জনসহ আরো কিছু মানুষের জীবন।

দুই যুগ পর স্মৃতিভারাক্রান্ত এক লেখক ব্যস্ত হয়ে পড়লো সেই হত্যারহস্য নিয়ে। চমকে যাবার মতো একটি ঘটনার মুখোমুখি হতে হলো তাকে। বিস্ময়কর সত্যটা জেনে যাবার পর নতুন এক সঙ্কটে নিপতিত হলো সে-সত্যটা প্রকাশ করার জন্য নির্ভর করতে হবে প্রকৃতির উপরে!

‘কেউ কথা রাখেনি’ একটি কাব্যিক অভিব্যক্তি। ঢালাও অভিযোগও বলা চলে। কিন্তু সত্যিটা হলো, *কেউ কেউ কথা রাখে।*

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিনের নিরীক্ষাধর্মী একটি কাজ। তার আগের কাজগুলোর তুলনায় একেবারেই ভিন্ন।

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

http://www.facebook.com/pages/batighar-prokashoni

ISBN 984872982-8
9 789848 729823

Gronthagaar.blogspot.com
gronthagaar.blogspot.com